হায়রোগ্লিফের দেশে

অনির্বাণ ঘোষ

মিশর দেশটা নিয়ে কৌতূহলী নয় এমন বাঙালি খুব কমই আছেন।সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি পুরোনো একটা সভ্যতা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত ফারাও, কত দেবদেবীর নাম। পিরামিড, মমি, স্ফিংস এবং আরও কত কী! কত রোমাঞ্চকর সব আখ্যান জড়িয়ে রয়েছে এর ইতিহাসের সঙ্গে। আবার হুগলী নদীর তীরের কলকাতা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র মিশরীয় মনিমানিক্য। তার খবরই বা ক'জন রাখেন! 'হায়রোগ্লিফের দেশে' নিয়ে এল সেই সব গল্প যার কিছু কিছু জানা, এবং বেশির ভাগই অজানা। শুকনো ইতিহাসের কচকচি না, বরং স্বাদু অথচ সহজপাচ্য গল্পের আকারে বলা এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের কথাই এই বইয়ের মূলধন। তার সঙ্গে আছে ২০০-এর বেশি ছবি, যার বেশ কিছু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। এমন বই বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে।

প্রচ্ছদ

অনিকেত মিত্র

হায়রোগ্লিফের দেশে

হায়রোগ্লিফের দেশে

অনির্বাণ ঘোষ

খাওয়া নাওয়া
প্রান্তজনের কথা

Hieroglyph Er Deshe
(History of Egypt)
by Anirban Ghosh

দ্বিতীয় সংস্করণ: ১০০০ কপি

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০১৮

সম্পাদনা
অরিজিৎ গাঙ্গুলি

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

হরফসজ্জা
রাজা পোদ্দার

প্রচ্ছদ
অনিকেত মিত্র

অলঙ্করণ
সৌমিক পাল

বানান সংশোধন
শুভদীপ সাহা, সলমা মিত্র

আইএসবিএন
978-93-83200-91-7

আইএসবিএন সহযোগী
পাতাবাহার

মুদ্রক ও প্রকাশক
রাজা পোদ্দার
খোয়াবনামা, প্রান্তজনের কথা
৭৪, নীলাচল কমপ্লেক্স ফিফ্থ রো, ফেস-১ নরেন্দ্রপুর,
কলকাতা-৭০০১০৩, ৯৮৭৫৪৫৫৭১৮

মূল্য
৪০০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

তোমার হাত ধরেই প্রথম বইমেলায় এসেছি। তোমার জন্যই
আমার বই পড়ার শুরু।

'বাপি',
তোমাকে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বই প্রকাশের ঠিক বাইশ দিন পরে বসলাম দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে কিছু লিখতে। কখনও ভাবিনি এমনটা হবে। এত মানুষের এত ভালবাসা পেল আমার বই! এই আনন্দ, এই তৃপ্তি আশাতীত।- প্রায় রোজ কেউ না কেউ মেসেজ করে জানাচ্ছেন তাদের ভাল-লাগা গুলো। খুঁত যে নেই তা বলব না। বেশ কিছু বানান ভুল ছিল, একটি তথ্যগত ভুল ছিল। যতটা পারলাম এই সংস্করণে ত্রুটি গুলোকে শুধরে নেওয়ার। আবার আমার পাঠকদের হাতেই তুলে দিলাম এই বই। আশা করি 'হায়রোগ্লিফের দেশে' এবারেও আপনাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না। ২০১৯ এর বইমেলাটা ভোলা যাবে না আর।
ভাল থাকবেন সবাই।

অনির্বাণ ঘোষ
বইমেলা, ২০১৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -

জয়িতা ঘোষ চ্যাটার্জী, ধৃতি দাস, নন্দিনী রায়, সলমা মিত্র, শুভদীপ সাহা, অভিষেক মুখার্জী, বিভাস গুপ্ত, মাধুরী সেনগুপ্ত, অনির্বাণ চৌধুরী, অর্পণ শেঠ, সুশোভন রায়, পল্লব রায়, তানিয়া সিংহ রায়, সপ্তর্ষি বোস, দিব্যেন্দু দাস, দেবায়ন কোলে, নন্দিনী দাস, দেবপ্রিয় মুখার্জী, বিদিশা পাল, কথাকলি মুখার্জী, দিব্যেন্দু গড়াই, স্পন্দন চৌধুরী, ভবেশ দাস, অমৃতা চ্যাটার্জী, প্রদীপ্ত ঘোষ, প্রিয়ম সেনগুপ্ত, কৌশিক মজুমদার, রাগাব আলাজাব, মাগদি ফানুস।
অভীক সরকার'দা আর রাজা ভট্টাচার্য'দা তোমাদের আলাদা করে থ্যাঙ্কিউ জানালাম। যেটুকু লেখালেখি করছি, তা তোমাদের দেখেই।

প্রকাশ প্রসঙ্গে

'হায়রোগ্লিফের দেশে' লেখাটি আমার প্রথম নজরে আসে ফেসবুকে। চিকিৎসক অনির্বাণকে চিনতাম-ই। কিন্তু লেখক অনির্বাণের সঙ্গে পরিচয় এই সূত্র ধরেই। 'হিষ্ট্রির মিষ্ট্রি' এই শিরোনামেও আরও একটা ধারাবাহিক ফেসবুকে সে লিখত। ফেসবুকে সাহিত্য হয় কি হয় না সে বির্তকে না গিয়ে বলতে পারি কয়েকটি এপিসোড পড়ার পরই বুঝতে পারি মিশর নিয়ে দুরন্ত পড়াশোনা করেছে অনির্বাণ। নিছক ভালবাসা থেকে এতটা কেউ পড়ে না, যদি না সেই বিষয়ের ওপর আলাদা করে তাঁর আগ্রহ থাকে। সেই সঙ্গে অনির্বাণের মিশর ঘুরে দেখাটাও কাজ দিচ্ছিল লেখাগুলোতে। পর্বগুলো পড়তে পড়তে সবার মত আগ্রহ আমারও ক্রমশই বাড়তে থাকে। বুঝতে পারছিলাম বাংলায় এই ধরনের লেখা একেবারেই নেই , একই সঙ্গে যদি অনির্বাণের টাইমলাইনেই শুধু এ লেখা থেকে যায় তবে তা একদিন সময়ের নিরিখেই হারিয়ে যাবে। যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ক্রমশই কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে সেখানে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি হারিয়ে যায় তাহলে প্রকাশক হিসাবে সেই হারিয়ে ফেলার দায় খানিক আমার ওপরেও বর্তায় বৈকি। ফেসবুকে কয়েকটা পর্বেই এই লেখাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখনই বুঝতে পারছিলাম পাঠক এখনও সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে চান। তাই গোটা লেখাটাকেই দু'মলাটে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত।

শুধু যে কথাটি বলার, এই বইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এর ছবি। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে ছবিগুলো করেছেন লেখক । বেশ কিছু ফটোগ্রাফ, পেইন্টিং... যার মধ্যে বেশ কিছু পুরনো ছবিও আছে, যেগুলোর রেজোলিউশন পর্যাপ্ত নয়। তবুও চেষ্টা করা হয়েছে, যথাসম্ভব সেগুলো রেস্টোর করে ব্যবহার করার। পাঠক নিজগুণে সেগুলি মার্জনা করে নেবেন। খুব স্বল্প সময় নিয়ে কাজ করার জন্য হয়তো বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি থেকেই গেল। পাঠক তা আমাদের নজরে আনলে পরবর্তী সংস্করণে চেষ্টা করব সেগুলো শুধরে নিতে।

অনির্বাণকে ধন্যবাদ, খোয়াবনামাকে এমন একটি বিষয় নিয়ে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ অনিকেত মিত্রকে এমন একটা অনবদ্য প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য। এই বইয়ের সঙ্গে জড়িত সমস্ত কলাকুশলীদের অজস্র ধন্যবাদ, বইটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ন করার জন্য। পরিশেষে ধন্যবাদ সেই সব পাঠকদের যারা পাশে থেকে খোয়াবনামাকে সাহস জুগিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য ।

রাজা পোদ্দার
খোয়াবনামা, প্রান্তজনের কথা
ডিসেম্বর, ২০১৮

মিশর।
কথাটা শোনামাত্র আপনার চোখের সামনে কী-কী ভেসে উঠল?
বালি, পিরামিড, উট, সাদা পোশাক পরা বেদুইন?
ক্লিওপেট্রা হিসেবে এলিজাবেথ টেইলর? না কি অ্যাসটেরিক্সের কমিক্সে সেই নাক-উঁচু গরবিনী?
টিনটিনের সিগার্স অফ দ্য ফারাও-এর রঙিন সারকোফেগাস?
শেয়াল দেবতা রহস্য?
মহাকাশের দূত?
কোনান ডয়েলের লেখা সিরিয়াসলি ভয়ের গল্প 'দ্য রিং অফ থথ'?
কাকাবাবু আর হানি আল কাদি?
হলিউডি সিনেমার মমি, মাংসখেকো গুবরে পোকার ঝাঁক, আধা মানুষ আর আধা জন্তু প্রাণীরা?
বিশ্বাস করুন, আসল মিশর এসবের চেয়ে অনেক, অনেএএএএক বিশাল, এবং প্রায় অনন্ত কাহিনি ও উপকথার আধার।
কিন্তু ভারী-ভারী বইয়ের পাতায় সেসব পড়ার কথা ভাবলেই আমাদের গায়ে জ্বর আসে, তাই না? জ্বর হলে আমরা কার কাছে যাই? ডাক্তারের কাছে। এখানেও ডাক্তারবাবু আমাদের দুর্গতি দূরীকরণে তৎপর হয়েছেন, এবং মিশরের এই অযুত-নিযুত গল্পের মধ্যে থেকে বাছাই করা ক'টি উপাখ্যান, সর্বোপরি অজানা আর আন্দাজের কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু সত্যিকে তুলে ধরেছেন সরস, সপ্রাণ, এবং একেবারে থ্রিলারের মতোই টানটান ভঙ্গিতে।
তার চেয়েও বড়ো কথা কী জানেন? লেখক কোথাও আমাদের জ্ঞান দেননি। বরং দেদার আড্ডার ফাঁকে, একেবারে বাঘার মতোই গুপি-হেন আমাদের বলেছেন, "চলো হে, একটু ঘুরে-টুরে আসা যাক।"
তাই আর কথা নয়। চলুন, ঘুরে আসি হায়রোগ্লিফের দেশ থেকে।

ঋজু গাঙ্গুলি
নভেম্বর, ২০১৮

প্রাক্‌কথন

সব শুরুর আগে আরো একটা শুরু থাকে।

২০০১ সালের একটা দুপুর বেলার কথা। ষোলো আর পনেরো বছর বয়সী পিঠো-পিঠি দুই ভাই সদ্য সিনেমা দেখে বেরিয়েছে। হাওড়ার শ্যামাশ্রী সিনেমা হলের বাইরে তখন দাঁড়িয়ে দুজনে। হলের গায়ে সিনেমার বিশাল বড় পোস্টার। 'দা মামি রিটার্নস'। দুজনের চোখেই তখন অদ্ভুত বিস্ময়। ছোটভাই বড়ভাইকে বলল, "এ দেশটায় একদিন যেতেই হবে দাদা বুঝলি।" বড় ভাইও মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ যেতেই হবে, মাস্ট।"

আমার এই বইয়ের প্রথম শব্দটি লিখি এক বছর আগে। কিন্তু বইটার জন্ম বোধহয় সতেরো বছর আগের সেই দুপুরেই হয়ে গিয়েছিল। ওই এক সিনেমা দিয়েই প্রথম এক দেশের সাথে পরিচয় হয় আমার আর ভাইয়ের।

মিশর।

তারপরে কৌতুহলের আর অন্ত ছিল না। সেই সময়ে তো আর আন্তর্জালের সুবিধা পাইনি। তাই ভরসা ছিল বইই। আনন্দমেলাতে বেরোনো মিশর নিয়ে ছোট ছোট লেখা বার বার পড়েছি। কাকাবাবু, ফেলুদা, অ্যাস্টেরিক্সে দেশটার কথা পড়ে বার বার শিহরিত হয়েছি। আর দুজনেই নিজেদের মনে একটা স্বপ্নকে লালন করে গেছি,

এই দেশটায় যেতেই হবে, মাস্ট!

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আমি, স্কুলে পড়াকালীন একটাই লক্ষ্য ছিল। জয়েন্টে চান্স পেতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। খেটেখুটে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেলাম। তারপর নিজের ভাললা-গার বিষয়টা নিয়ে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করলাম। সাহেবদের কাছে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ইংল্যান্ডের 'রয়াল কলেজ অফ সার্জেনস' এর মেম্বারও হলাম। তার পরের বছরই বিলেতে পাড়ি দিলাম। কিন্তু কখনও ভাবিনি বই লিখব। একটা গোটা বই!

ছোটবেলা থেকেই আমি মুখচোরা, খুব একটা মিশুকে প্রকৃতির না। আমার নিজের বন্ধুদের সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। বেশির ভাগ অবসর সময়টাই কাটত বই মুখে নিয়ে। যখন যা বই হাতের কাছে পেয়েছি গোগ্রাসে গিলেছি। পাড়ার লাইব্রেরীতে কাটিয়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা। আমার বাবা মাও এই নেশাকে প্রশয় দিয়ে গেছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিচয় হয়েছে আরো নতুন নতুন বইয়ের সাথে। হয়ত এতদিন ধরে পড়া শব্দগুলোই আমার অবচেতনে রয়ে গিয়েছিল। ২০১৫ সালের অগাস্ট মাসের কথা। হঠাৎ মনে হল আমার যা কিছু পরিচিতি তা ওই ডাক্তার বলে। আর কিছু তো নেই। নতুন একটা কিছু করতে হবে, এই ভেবে আমি আর অরিজিত গাঙ্গুলি মিলে বানিয়ে ফেললাম একটা ব্লগ, আনাড়ি মাইন্ডস। অরিজিত আমার হাফপ্যান্ট পরা বয়সের বন্ধু। আমার কৈশোর, যৌবনের সাক্ষী। বন্ধু না বলে ভাই বলাই যায়। আনাড়ি মাইন্ডসে দুজনে মিলে প্রথমে লিখতে শুরু করলাম ইংরাজীতে। মাস তিনেকের মধ্যে বুঝলাম আমাদের ইংরাজীর

হাল বেশ খারাপ। ভাগ্যিস বুঝেছিলাম! তাই মাতৃভাষাতেই লেখালিখি শুরু হল। নিজেদের ছোট বেলার মজার গল্প, আমার ইওরোপ ঘোরার গল্প, এইসব আর কী। দুজনেই দুজনের পিঠ চা-পড়াতাম। ফেসবুকে দিতাম সেই সব লেখা। গোটা তিরিশ লাইক পেলে বুক চওড়া হয়ে যেত। তারপরে এল 'আত্মপ্রকাশ'। একটা নতুন ফেসবুক গ্রুপ যেখানে বেশ কয়েক জন মানুষ গান গায়, গল্প-কবিতা লেখে, ছবি আঁকে। একটা পরিবারের মতো পরিবেশ সেখানে। আত্মপ্রকাশ আমাকে আর অরিজিতকে বুকে টেনে নিল। আমাদের অতি রদ্দি লেখাগুলোতেও বাহবা দিয়ে সাহস জোগালো বুকে। তখন মনে হল তাহলে তো আরো লিখতে হয়! কিন্তু কী লিখি? ইতিহাস আমাকে বরাবর টানে। ইওরোপের রেনেসাঁর সময়ের ইতিহাস নিয়ে একটা সিরিজ লেখা শুরু করলাম, নাম দিলাম 'হিস্ট্রির মিস্ট্রি'। আত্মপ্রকাশে সপ্তাহে একটা করে পর্ব লিখতাম। ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়ল, খেয়াল করলাম কয়েকশো মানুষ আমাদেরকে ভালবাসছেন। আমার পেশাগত পরিচয়ের বাইরেও মানুষ আমাকে চিনছেন।

এরই মধ্যে ২০১৭ র নভেম্বরে ঘুরে এলাম আমার স্বপ্নের দেশে, মিশরে। এত বছর ধরে আমি যেখানে যেখানে মিশরের ইতিহাস নিয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি ততটুকুই শুষে নিয়েছি। কিন্তু বাংলা ভাষায় তেমন কোন বই পাইনি কখনও। ইংল্যান্ডে আসার পরে পিপাসা মেটানোর কাজটা একটু সহজ হয়ে গেলাম। খেয়াল করলাম সাহেবরা মিশর, মিশরের পুরাণ নিয়ে অজস্র বই লিখেছেন। টপাটপ বেশ কয়েকটা কিনে ফেললাম। ডুবে গেলাম তাতে। যত পড়লাম তত অবাক হলাম। বেশি অবাক হলাম এই ভেবে যে এতদিন আমি কত কিছু ভুল জানতাম। কত কম জানতাম। তখনই মনে হল আমি যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেলাম তার হদিশ বাকিদের দেব না?

ইংল্যান্ডে আসার পরেও এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন অরিজিতের সাথে ফোনে কথা হয়নি। এক সন্ধ্যেয় এমনই ফোনে আড্ডা দেওয়ার সময় ওকে বললাম আমার ইচ্ছার কথা। মিশরের ইতিহাস নিয়ে লেখবার কথা ভাবছি। কিন্তু 'হিস্ট্রির মিস্ট্রি' র সাথে রাখব না এই লেখা গুলোকে। অন্য আরেকটা সিরিজ করব। আর ইতিহাসটাও বলব গল্পের মতো করে। অরিজিত বলল তুই কি রকম করে লিখবি ভাবছিস বল। আমি বললাম ধর বইপাড়ার একটা দোকানের একজন মালিক, কোনো গোপন কারণে মিশর নিয়ে তার অগাধ জ্ঞান। সে গল্প বলে মেডিকেল কলেজের দুজন স্টুডেন্টকে। অরিজিতকে বললাম আমি প্রথম দিকটা লিখে তোকে দেখাব। শুরু করলাম লেখা, যেদিন এই লেখায় হাত দিয়েছি সেদিন আত্মপ্রকাশের এক দাদা সারাদিন ধরে খুঁজে খুঁজে আমার একটার পর একটা লেখা পড়ছেন, নাম ভবেশ দাস। তাই আমার গল্প বলা চরিত্রের নাম দিয়ে দিলাম দাদার নামেই। পদবীটা শুধু বদলালাম, কেন জানি না। জন্ম হল ভবেশ সামন্তের। এবারে আসবে সেই দুজন যারা গল্প শুনবে। স্পন্দন ছিল আত্মপ্রকাশ গ্রুপেই, আর জি করের ডাক্তারির ছাত্র, নিয়ে নিলাম ওর নাম। আর নিলাম আমার নিজের কলেজের বন্ধু প্রদীপ্ত ঘোষকে। ওকে কলেজে আমরা পিজি বলে ডাকতাম। লেখাতেও নাম পিজিই থাকল। পিজিকে আমি ছয় বছর খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাই বইয়ের পিজির আদপ কায়দা, কথা বলার ধরণ সব আমার বন্ধু প্রদীপ্তর থেকেই নেওয়া।

যে কোনো নতুন লেখার শুরুটা সবচেয়ে মুশকিলের। সেটাই আকর্ষণীয় না হলে পাঠক বাকিটা পড়তে চাইবেন কেন? এই লেখার শুরুর হাজার দেড়েক শব্দ লিখে অরিজিতকে পড়ালাম। আমার নিজেরই খুব একটা ভাল লাগছিল না। অরিজিত বলল আমাকে একটা দিন সময় দে। তারপরে

ও নিজে শুরুটা লিখে আমায় দিল। পড়েই বুঝলাম আরে! এটাই তো আমি চাইছিলাম। অরিজিতই ভবেশদা, স্পন্দন আর পিজির চরিত্রকে হাঁটতে শিখিয়েছে। আমার এই বইয়ের শুরুর পাঁচশটা শব্দ আমার লেখা না আদৌ, ওর লেখা।

কয়েকদিনের মধ্যেই লিখে ফেললাম প্রথম পর্ব, আত্মপ্রকাশে দেওয়ার আগে আবার ফোন করলাম অরিজিতকে। কি নাম দেওয়া যায় এই নতুন সিরিজের? পাঁচ ছটা নাম নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে একটা নাম দুজনেরই ভাল লাগল। জন্ম হল 'হায়রোগ্লিফের দেশে'-র। কয়েকটা পর্ব আত্মপ্রকাশে বেরোবার পরেই রাজাদার মেসেজ একদিন।

রাজা পোদ্দারদাকে আমি বেশ কয়েক বছর ধরে চিনি ফেসবুকের দৌলতেই। মানুষের কাজেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মানুষটাও তেমনই। সৎ, সরল, পরিশ্রমী, পরোপকারী। এহেন রাজাদা যখন বলল খোয়াবনামা আমার এই সিরিজটাকে নিয়ে বই করতে চায় তখন না বলি কি করে?

মিশরের ইতিহাস লেখাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। এর বিস্তার সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের। বইয়ের দু'মলাটের মধ্যে তাদেরকে আনাটাই একটাই বড় চ্যালেঞ্জ। আবার শুধু শুকনো ইতিহাস লিখলে কারোরই পড়তে ভাল লাগত না। 'হায়রোগ্লিফের দেশে' যাতে ইতিহাসের একঘেয়ে রেফারেন্স বই না হয়ে দাঁড়ায় সে ব্যাপারে সচেতন ভাবে চেষ্টা করেছি। বইটার যে কোনো পর্ব নিজের খুশি মতো পড়তে পারেন। তবে পরপর পড়লে বুঝতে পারবেন একটা অন্য রহস্য ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এই বইয়ের মুখ্য চরিত্ররা। ভূমিকাতেই সব বলে দিলে মুশকিল। আপনারা না হয় নিজেরাই আবিষ্কার করুন।

সবশেষে বলি, এই বই আমার একার নয়। এই বই অরিজিতের, রাজাদার। এ বই অনিকেতের, যে প্রচ্ছদ তৈরি করেছে। সৌমিকের, যে অলঙ্করণ করেছে। সলমাদির আর শুভদীপের, যারা প্রুফ রিড করেছে। আর এই বই আজ থেকে আপনারও। একে নিজের করে নিন। ভুল ত্রুটি কিছু থাকলে সাথে সাথে আমাকে জানান। আমি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আর ভাল লাগলে একটু পিঠ চাপড়ে দেবেন প্লিজ।

অনির্বাণ ঘোষ
লন্ডন
নভেম্বর, ২০১৮

সূচীপত্র

১.	প্রথম পিরামিড	৩৭
২.	মৃতের বই	৪৪
৩.	মমির গল্প- প্রথম পর্ব	৫০
৪.	মমির গল্প- দ্বিতীয় পর্ব	৬০
৫.	গ্রেট পিরামিড	৬৭
৬.	হেতেফেরিসের রহস্য	৭৮
৭.	স্ফিংস	৮৫
৮.	ওবেলিস্ক	৯৩
৯.	খুফুর নৌকা	১০২
১০.	রোসেটার পাথর	১০৯
১১.	ঈশ্বরের লিপির রহস্য- প্রথম পর্ব	১১৭
১২.	ঈশ্বরের লিপির রহস্য- দ্বিতীয় পর্ব, হায়রোগ্লিফে লিখতে শেখা	১২৩
১৩.	পৃথিবীর শুরু	১৩১
১৪.	হোরাসের চোখ	১৩৯
১৫.	ফারাও	১৪৪
১৬.	বেলজোনি	১৫২
১৭.	আবু সিম্বেলের মন্দির	১৫৯
১৮.	সাকারার সেরাপিয়াম	১৬৯
১৯.	রাজাদের উপত্যকা	১৭৮
২০.	তুতানখামেন	১৮৮
২১.	দেইর-এল-বাহরির গুপ্তধন	২০৩
২২.	আখেনাতেন	২১৫
২৩.	হাতসেপসুত	২২৫
২৪.	আলেকজান্দ্রিয়া	২৩২
২৫.	শেষ গল্প- ক্লিওপেট্রা	২৪২

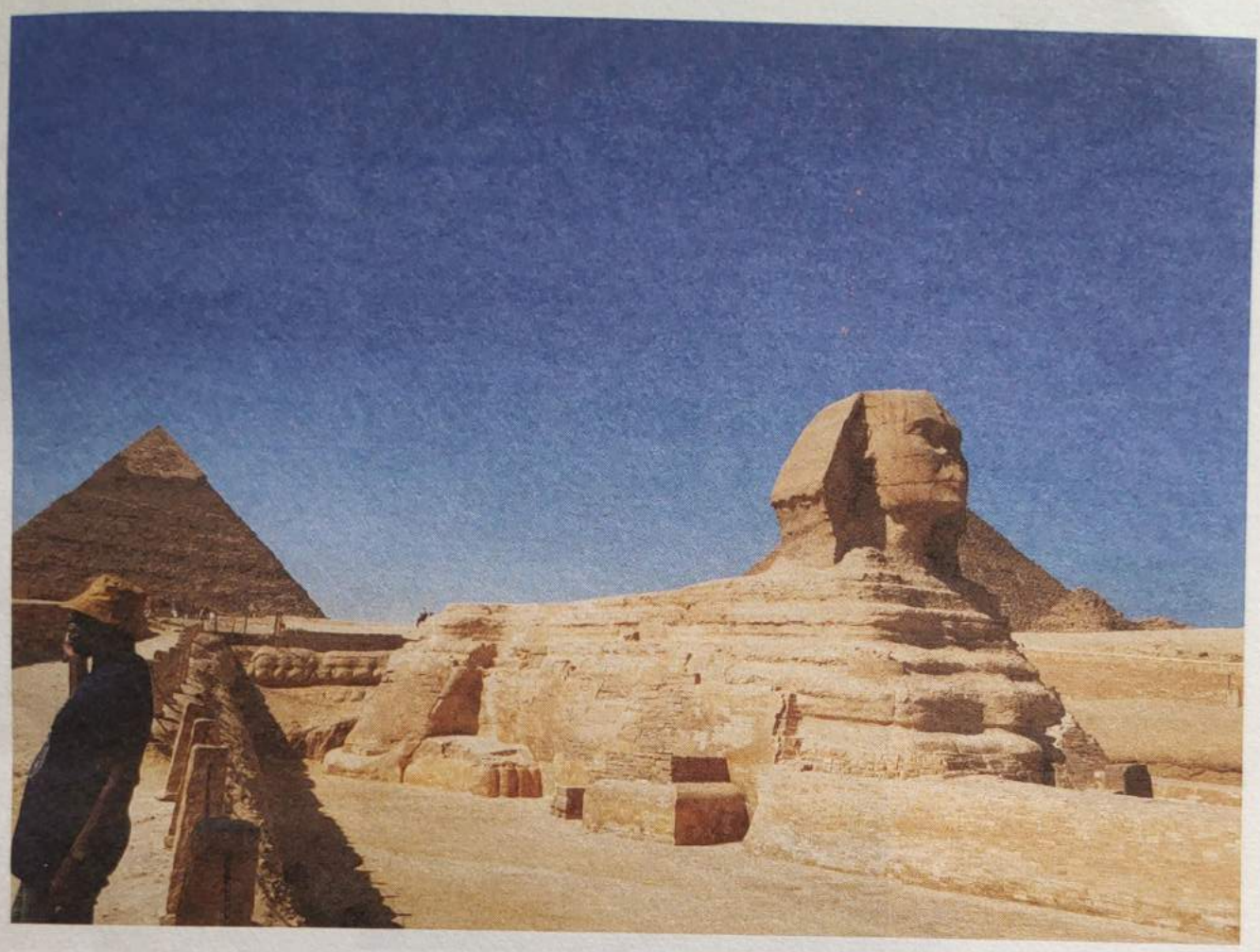

স্ফিংস

কায়রোর মিউজিয়াম

লাক্সরের মন্দিরের সামনের ওবেলিস্ক

'বুক অফ দা ডেড' এর একটি পাতার ছবি

রানী হাতসেপসুতের মমি

তুতানখামেনের মমি, যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল

তুতানখামেনের সমাধিতে থাকা আনুবিসের মূর্তি

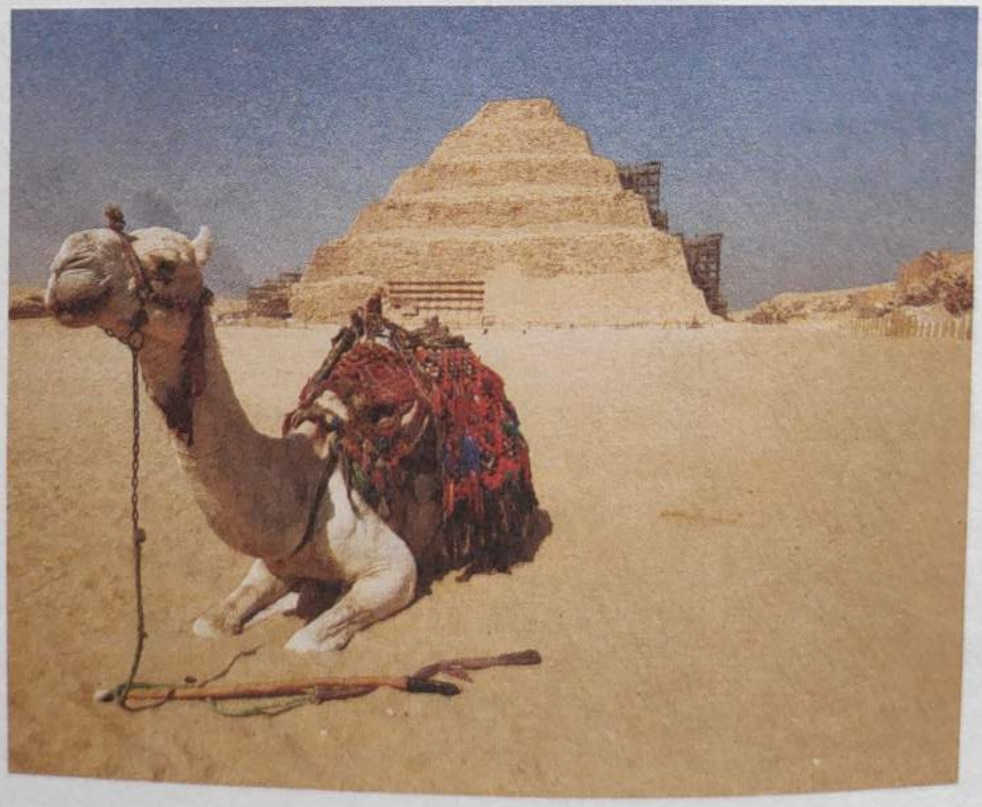

সাকারার স্টেপ পিরামিড

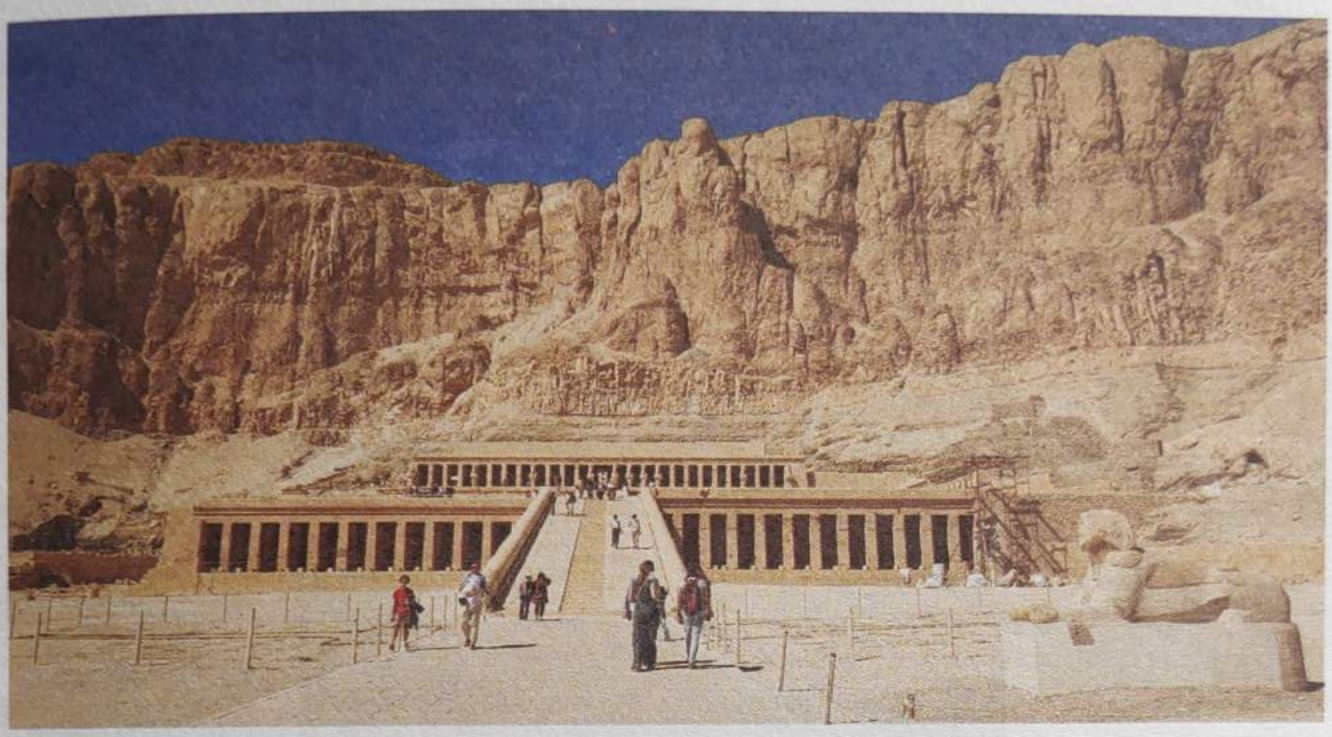

রানী হাতসেপসুতের মন্দির

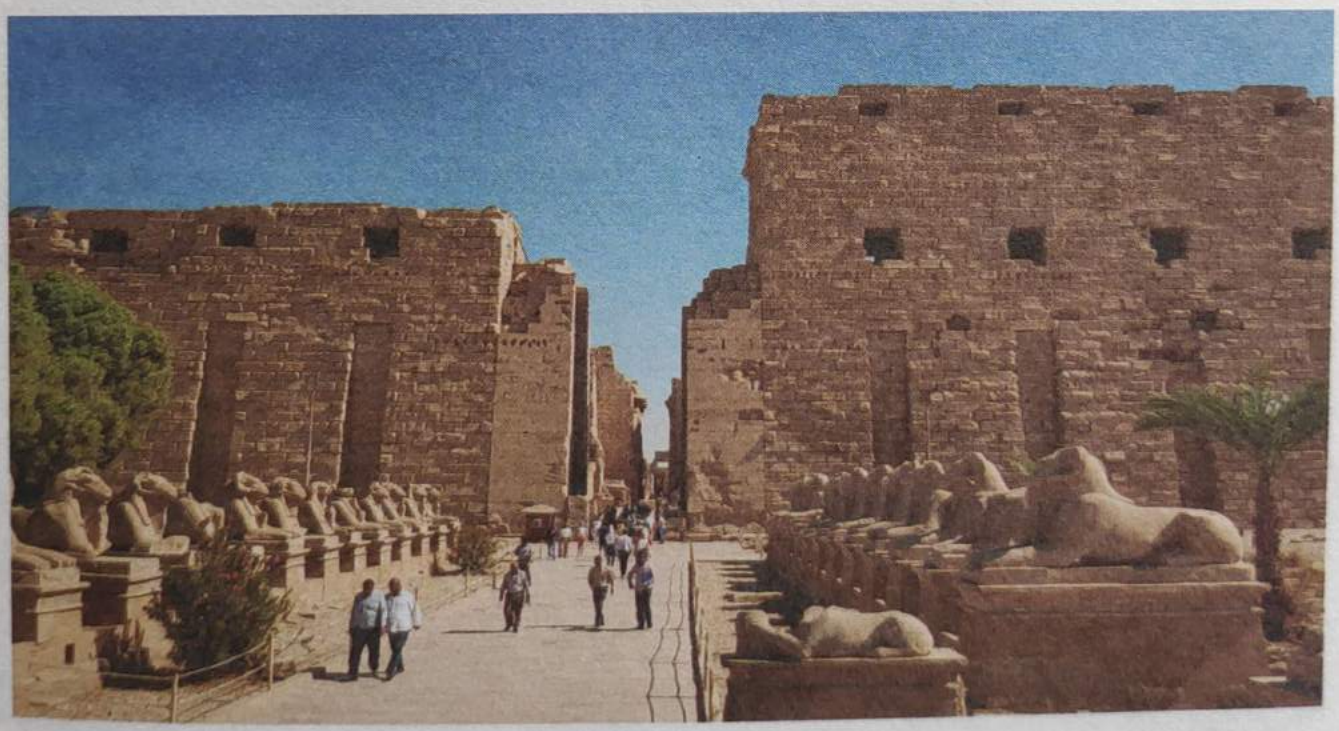

কার্নাকের মন্দির

তুতানখামেনের মুখোশ

মমির সিটি স্ক্যান

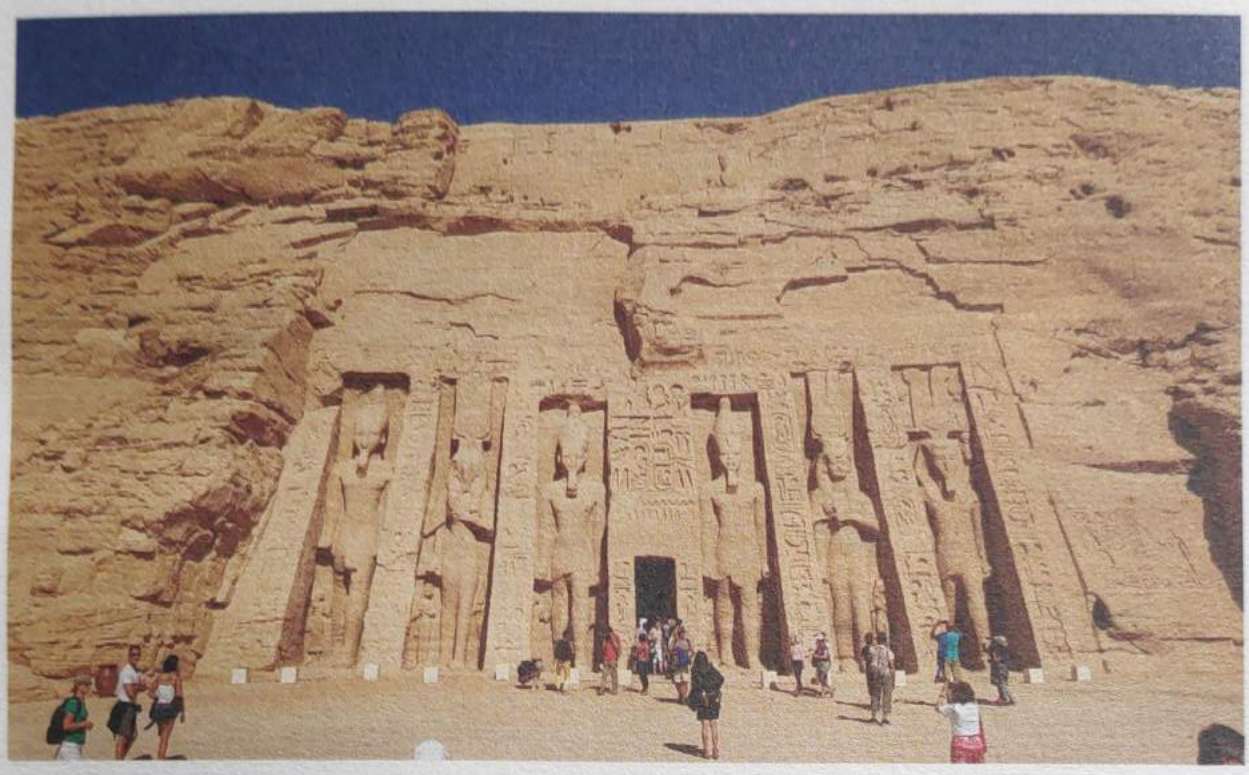

রানী নেফারতারির মন্দির

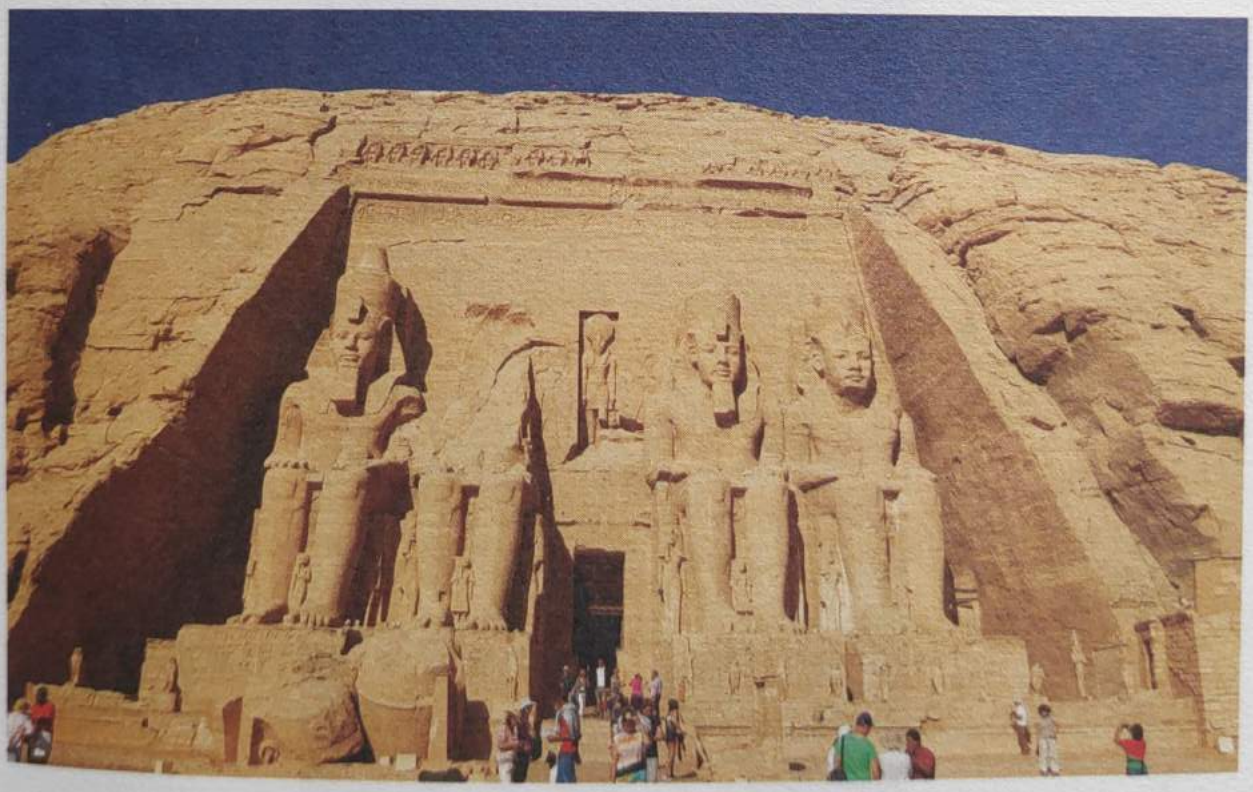

দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দির

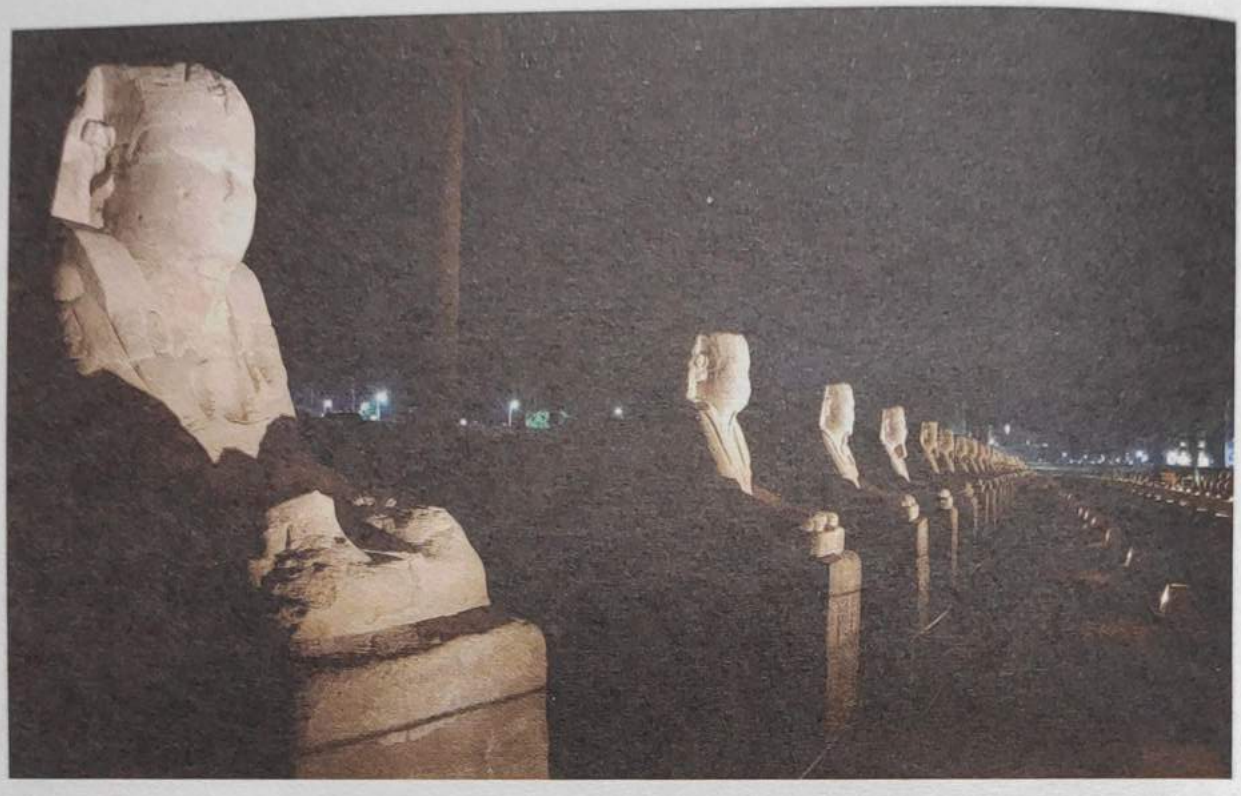

অ্যাভেনিউ অফ স্ফিংস

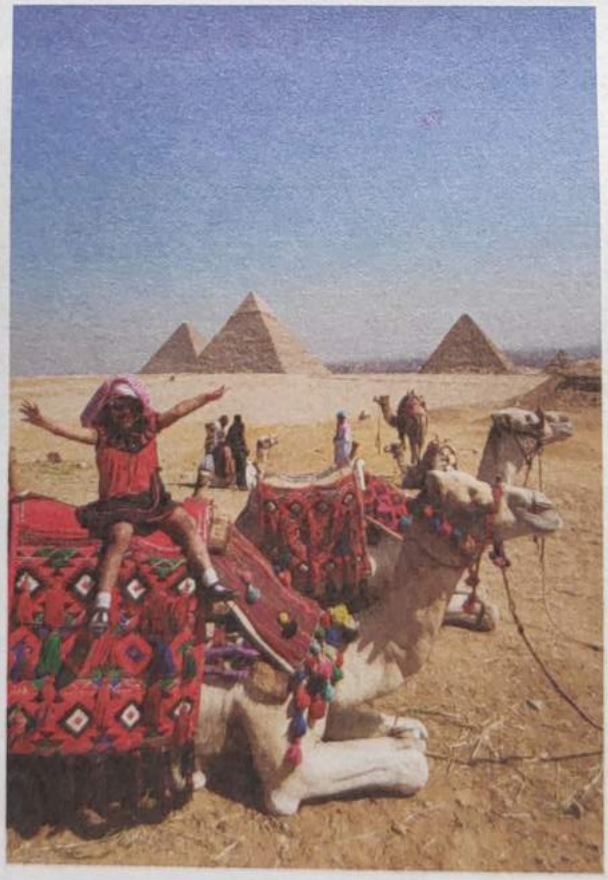

গিজার পিরামিড

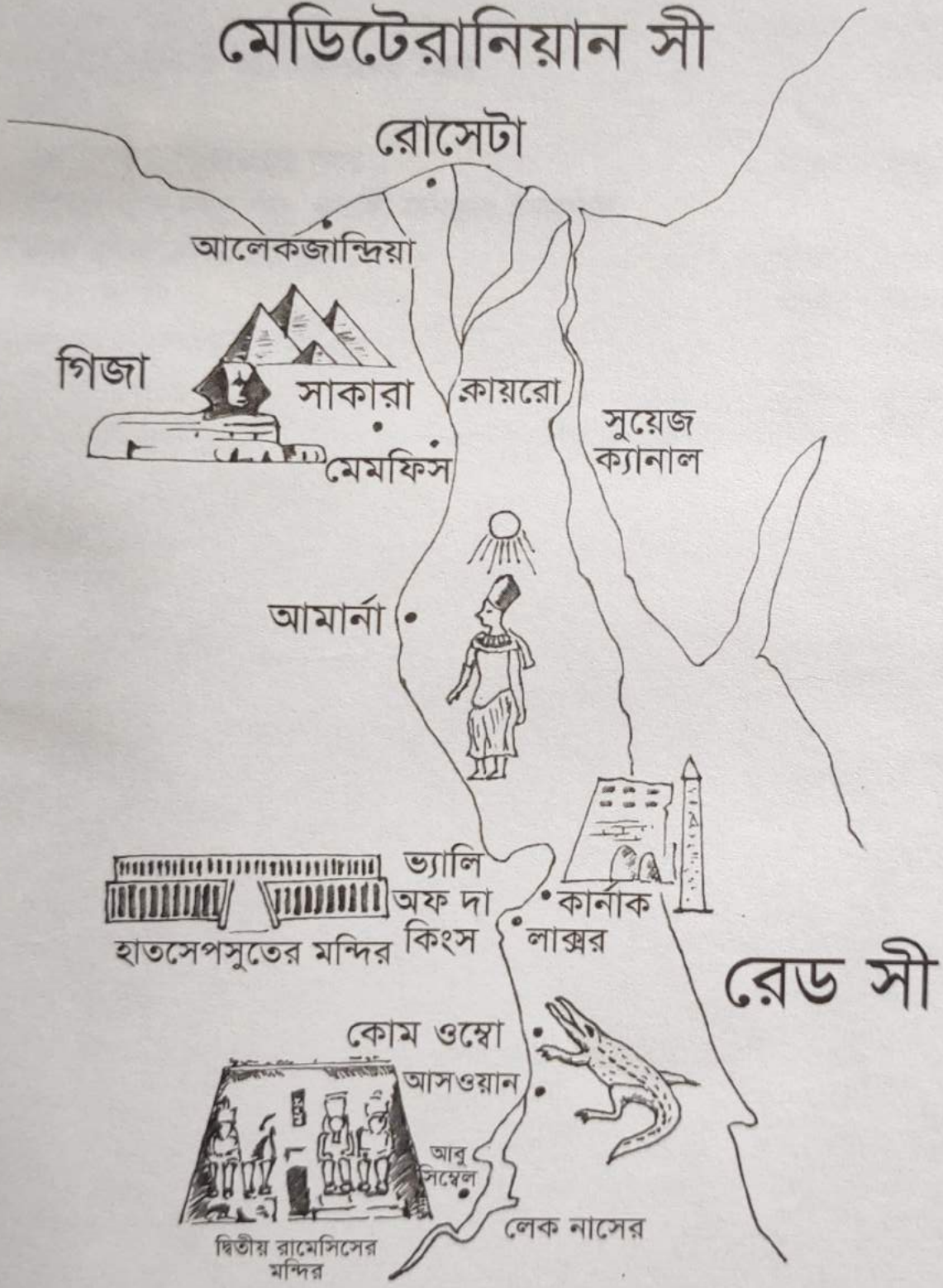
মেডিটেরানিয়ান সী
রোসেটা
আলেকজান্দ্রিয়া
গিজা
সাকারা
কায়রো
মেমফিস
সুয়েজ ক্যানাল
আমার্না
ভ্যালি অফ দা কিংস
কার্নাক
লাক্সর
হাতসেপসুতের মন্দির
রেড সী
কোম ওম্বো
আসওয়ান
আবু সিম্বেল
লেক নাসের
দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দির

মিশরের ইতিহাসের সময়পঞ্জী

১.	প্রি ডাইনেস্টিক যুগ	৫০০০ - ৪০০০ বিসি
২.	আর্লি ডাইনেস্টিক যুগ, ফারাওদের উত্থান	৩২০০বিসি
	নার্মার	
৩.	ওল্ড কিংডম, পিরামিডের সময়	২৭০০ - ২৩০০বিসি
	জোসার, হুনি, নেফ্রু, খুফু, খারফ্রে, মেনকুরে,উসারকাফ	
৪.	ফার্স্ট ইন্টারমিডিয়ট পিরিয়ড	২২০০ - ২০০০বিসি
৫.	মিডল কিংডম	২০০০ - ১৮০০বিসি
৬.	সেকন্ড ইন্টারমিডিয়ট পিরিয়ড	১৮০০ - ১৫৫০বিসি
৭.	নিউ কিংডম	১৫৫০ - ১০৫০বিসি
	প্রথম-চতুর্থ তুতমোসিস, হাতসেপসুত, তুতানখামেন, হোরেমহেব, প্রথম-নবম রামেসিস	
৮.	থার্ড ইন্টারমিডিয়ট পিরিয়ড	১০৫০ - ৭৫০বিসি
	প্রথম, দ্বিতীয় পিনাদজেম	
৯.	লেট পিরিয়ড	৭৫০ - ৩৩০বিসি
	প্রথম- তৃতীয় দারিয়াস, জারসেস	
১০.	গ্রীক-টলেমিক পিরিয়ড	৩৩০ - ৩০বিসি
	আলেকজান্ডার দি গ্রেট, প্রথম- দ্বাদশ টলেমি, ক্লিওপেট্রা	
১১.	রোমান পিরিয়ড	৩০বিসি - ৪০০এডি
১২.	বাইজান্টাইন পিরিয়ড	৪০০ - ৬৪১
১৩.	আরব কিংডম	৬৪১ - ৯৬৮
১৪.	ফাতিমিদ কিংডম (কায়রো শহরের পত্তন)	৯৬৯ - ১১৭০
১৫.	আয়ুবাইদ কিংডম	১১৭০ - ১২৪৮
১৬.	মামলুক কিংডম	১২৬০ - ১৫১৭
১৭.	ওটোমান কিংডম	১৫১৭ - ১৭৯৮
১৮.	মিশরে নেপোলিয়ন	১৭৯৮ - ১৮০১
১৯.	মুহামেদ আলি পাশার কিংডম	১৮০৪ - ১৯৫২
২০.	ব্রিটিশদের রাজত্ব	১৮৮২ - ১৯৫৬
২১.	মিশরের প্রজাতন্ত্রের শুরু	১৯৫৩

মিশরীয় দেবদেবীদের হুজ হু

আতুম- প্রথম দেবতা। যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে।

তেফনুত- আর্দ্রতার দেবী। তেফনুতের শরীর মানবীর হলেও মাথা সিংহীর।

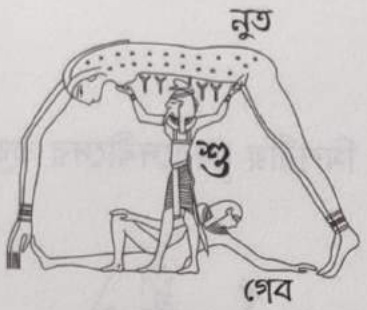

শু- তেফনুতের স্বামী, নুত আর গেবের বাবা। তেফনুত আর শু-ই প্রথম দেবদেবী, যাদের জন্ম দেন আতুম। শু আলো আর বাতাসের দেবতা।

নুত- দেবতা ওসাইরিস, আইসিস, সেথ আর নেফথিসের মা। নুতের লম্বা শরীর আকাশ মতো পৃথিবীকে ঘিরে থাকে। প্রতিদিন সকালে নুত সূর্যের জন্ম দেন, আবার সন্ধ্যেবেলায় গিলে নেন। কফিনে, কবরের ছাদে বা মন্দিরের সিলিংয়ে আঁকা থাকত নুতের ছবি।

গেব- গেব নুতের ভাই, আবার স্বামীও। গেব পৃথিবীর দেবতা। মানুষ মারা গেলে গেব তাকে তার শরীরে স্থান দেন।

আমুন- অন্য আরো নাম- আমেন, আমন। মিশরের থেবস শহরের প্রধান দেবতা। এক সময় এঁর সাথে জুড়ে দেওয়া হয় সূর্যের দেবতা রা-কে। নতুন নাম হয় আমুন-রা। আমুনের দেহ মানুষের হলেও কখনও কখনও পাহাড়ি ভেড়া রাজহাঁসের ও রূপ ধারণ করেন। আতুম কথার মানেই হল যা লুকনো, ছদ্মবেশী। আতুমের কাল্ট পরে ছড়িয়ে পড়ে ইথিওপিয়া, লিবিয়া, নুবিয়া, প্যালেস্তিনে। গ্রীকরা আমুনকে দেবতা জিউসের সাথে তুলনা করত।

রা- সূর্য দেবতা। মাথাটা বাজপাখির, মুকুটে সূর্য আর একটা সাপ থাকে। রাতের বেলায় রা যখন মাটির নিচে যাত্রা করেন তখন তার মাথাটা হয়ে যায় ভেড়ার। রা এর সাথে অনেক দেবতাকে মিশিয়ে দেওয়া হয় পরে। যেমন আমুনের সাথে মিশে আমুন-রা, দেবতা মন্টুর সাথে মিশে মন্টু-রা, আবার দেবতা হোরাসের সাথে মিশে রা-হোরাখতি। মনে করা হত সব ফারাওরাই রা এর সন্তান। হেলিওপলিসের ছিল এনার মন্দির।

আনুবিস- শেয়াল দেবতা। বাবা সেথ, মা নেফথিস। মামিফিকেশনের দেবতা। আনুবিসই প্রথম মমি তৈরি করেন। সেই মমি ছিল দেবতা ওসাইরিসের। মৃতের আত্মার বিচারের সময়ও সেখানে আনুবিস থাকেন।

বাস্তেত- এঁর মাথাটা বিড়ালের। সুখ, আনন্দের দেবী। বাস্তেতের মন্দির ছিল বুবাস্তিস নামের এক শহরে। সেই শহরে বিড়ালের পুজো হত। তারা মারা গেলে তাদের মমি করে রাখার চল ছিল।

বেস- অন্যান্য দেবদেবীর থেকে একদম আলাদা বেস। বেঁটে, অদ্ভুত রকমের দেখতে, জিভ বেরিয়ে আছে বাইরে। ইনি ভাল সময়ের দেবতা। আবার প্রসবের সময় হবু মায়েদের রক্ষা করতেন বেস।

হাপি- নীল নদের বানেতে যে পলি পড়ত তার দেবতা হাপি। উর্বরতার দেবতা। হাপির একটা বড় ভুঁড়ি আছে। পুরুষ হলেও স্তন বড়। হাপির মাথার মুকুট জলজ উদ্ভিদ দিয়ে বানানো। হাপির মন্দির ছিল আসওয়ানে।

আইসিস- ওসাইরিসের স্ত্রী, হোরাসের মা। মৃত ওসাইরিসকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন আইসিস, তাই তিনি ডাক্তারির দেবী। আইসিসের মুকুটে একটা সিংহাসন থাকে। আইসিসের সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল ফিলিতে। লন্ডনেও রোমান সাম্রাজ্যের সময়কার আইসিসের একটা মন্দির পাওয়া গেছে।

ওসাইরিস- প্রথম দেবতা যার মমি তৈরি হয়েছিল। মাটির নিচের জগতের রক্ষাকর্তা ইনি। এঁর শরীরের গঠনও মমির মতো। ইনি চাষবাসেরও দেবতা। ওসাইরিসের সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল অ্যাবিদসে।

সেথ- অন্য নাম- সেত, সেতেখ, সুতি, সুতেখ। দেবতা ওসাইরিসের ভাই। ইনি ওসারিসকে খুন করেন। এঁর সাথেই পরে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে লড়াই হয় হোরাসের। এঁর শরীরটা মানুষের হলেও মাথাটা এক অদ্ভুত দর্শন প্রাণীর। সেথ দেবতা রা এর সাথে থাকেন। বাজে আবহাওয়া আর ঝড়ের জন্য দায়ী ইনি।

নেফথিস- গেব আর নুতের সন্তান, দেবতা সেথের স্ত্রী। মৃত আত্মাকে রক্ষা করেন নেফথিস। তাই মমির কফিনে নেফথিসের ছবি থাকত। যেখানে দুটো হাত পাখির ডানার মতো।

হাথোর- দেবতা রা-এর মেয়ে। দেবতা হোরাসের স্ত্রী। প্রেম, সৌন্দর্য, আনন্দ, সঙ্গীতের দেবী। হাথোরের তিনটে রূপ। গরুর মতো, নারীর শরীর যার কান দুটো গরুর আর নারী যার মুকুটে গরুর শিং আছে। হাথোরের সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল দেনদারাতে।
কূট মানবজাতিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দেবতা রা একবার হাথোরকে পৃথিবীতে পাঠান। হাথোর উন্মত্ত অবস্থায় নির্বিচারে মানুষ মারতে থাকেন। শেষে মদ খাইয়ে নেশাতুর করে তাকে শান্ত করা হয়।

হোরাস- ওসাইরিস এবং আইসিসের সন্তান। এঁর মাথাটা বাজপাখির। ফারাওদের রক্ষাকর্তা হলেন হোরাস। হোরাসের সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল এডফুতে।

খুম- সেই দেবতা যিনি নীল নদ তৈরি করেছিলেন। এঁর শরীরটা মানুষের হলেও মাথাটা মেষের। খরার সময় মিশরীয়রা খুমের পুজো করত।

খনসু- অন্য নাম- খেনসু, খনস, খুনস। চাঁদের দেবতা। এঁর মাথাটা ছিল বাজপাখির, মুকুটে থাকত এক ফালি চাঁদ আর পুর্নিমার চাঁদ। শয়তান আত্মাদের দেবতা খনসু দূর করতেন। রাজা দ্বিতীয় রামেসিস তার বন্ধু এক সিরিয়ান রাজার কাছে খনসুর মুর্তি পাঠান, সেই রাজার অসুস্থ মেয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে। কার্নাকে ছিল এনার মন্দির।

মাত- ন্যায় এবং বিচারের দেবী। জগতের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব ছিল মাতের ওপরে। মৃত্যুর পরে আত্মার বিচারও করতেন মাত।

মন্টু- যুদ্ধের দেবতা। এঁর আশীর্বাদেই নাকি সমগ্র মিশরকে এক রাজত্বের ছাতার তলায় আনতে পেরেছিলেন ফারাওরা ।

মুত- দেবতা 'রা' এর কন্যা, আমুনের স্ত্রী। মায়ের মতো ইনি ফারাওদের রক্ষা করতেন। এঁর মুকুটে একটা শকুন থাকত।

তাহ- কারিগরি বিদ্যার দেবতা। আবার কোন কোন পুরাণে বলা আছে ইনি নাকি পৃথিবীর সৃষ্টিও করেছিলেন। তাহ এর শরীরটা মমির মতো, মাথা মোড়ানো। মেমফিসে তাহ এর মন্দির ছিল।

সোবেক- কুমীরের মাথাওয়ালা দেবতা। মুকুটে একজোড়া শিং এর সাথে থাকত একজোড়া পালক। কোম ওম্বোতে ছিল এর মন্দির। সেখানে কুমীরের মমি বানিয়ে রাখা হত। এখনও সেই মমি দেখতে পাওয়া যায়।

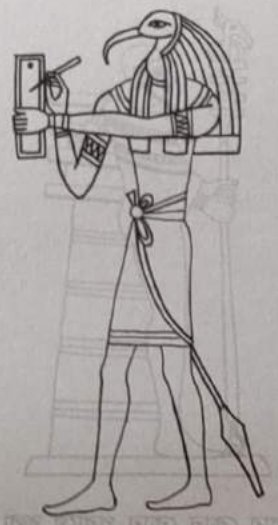

থথ- বিদ্যা আর জ্ঞানের দেবতা। শরীরটা মানুষের হলেও মাথাটা আইবিস পাখির মতো। কখনো আবার বেবুনের রূপও ধারণ করেন। ইনিই নাকি হায়রোগ্লিফিক হরফ সৃষ্টি করেন। গ্রীকরা একে দেবতা হারমিসের সাথে তুলনা করত। মৃতের আত্মার বিচারের সময় থথ পাপ-পুণ্যের হিসাব লিখে রাখেন। এনার মন্দির ছিল হারমোপলিসে।

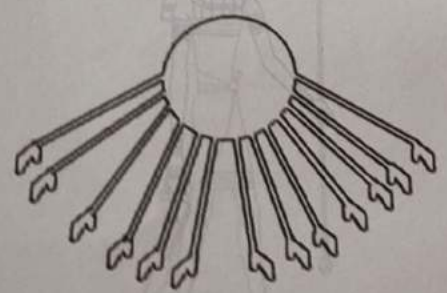

আতেন- এই দেবতার কোন মানুষ বা পশুর রূপ নেই। আতেনের প্রতীক একটা গোল চাকতি, সূর্য। ফারাও চতুর্থ আমেনহোতেপ আতেনের পুজো শুরু করেন। তখন তিনি নিজের নাম বদলে রাখেন আখেনাতেন।

নেইথ- অন্য নাম- নিত, নেত। শিকার আর যুদ্ধের দেবী। মিশরের দক্ষিণে নীল নদের পশ্চিম পাড়ে ছিল এই দেবীর মন্দির।

সেখমেত- অন্য নাম- সাখমেত, সাকমিস, সাখেত। যুদ্ধ আর শুশ্রুষার দেবী। যুদ্ধের সময় ইনি ফারাওদের রক্ষা করতেন। সেখমেতের মাথাটা ছিল সিংহীর। এঁর শ্বাস থেকেই নাকি মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছিল।

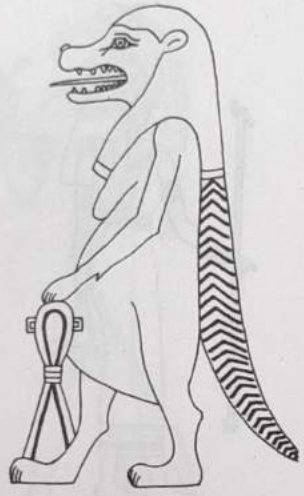

তাওয়ারেত- উর্বরতার দেবী। মেয়েরা সন্তান লাভের আশায় এর পুজো করত। এঁর গোটা শরীরটা জলহস্তীর মতো হলেও পিঠটা কুমীরের।

সেশাত- বুদ্ধি, জ্ঞানের দেবী। ইনি প্যাপিরাসের ওপরে সময়ের ইতিহাস লিখে রাখেন। এঁর পুজো হত মন্দিরে নয়, লাইব্রেরীতে।

১

প্রথম পিরামিড

আচ্ছা, বলো দেখি মিশরের রাজধানী কি ছিল?
-ছিল মানে কি? আছে তো, কায়রো।
-সে তো এখন, কায়রো শহরের বয়স মাত্র ১০০০ বছর।
-মাত্র বলছেন? আমাদের কলকাতার বয়স ৪০০ বছর, এটাকে মাত্র বলা যায়।
-তাহলে শুনে রাখো, ইজিপ্ট দেশটার জন্ম আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে, সেই সময় ভারতের নাম কেউ শোনেনি। তাই কায়রো ওর কাছে শিশু। যাই হোক এবারে বলো, কায়রোর আগে কি ছিল?
এবারে আমাদের মাথা চুলকানোর পালা, কায়রোরও আগের রাজধানী?
ভবেশ সামন্ত এবারে বিড়িতে একটা টান মেরে বলল,
মেমফিস।
আমার নাম স্পন্দন বসু। বয়স একুশ, বাড়ি বর্ধমানে। একদম শহরের মধ্যেই। তবে এখন থাকি কলকাতায়। জয়েন্টে ৪২ র‍্যাঙ্ক করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। এখন সেকেন্ড ইয়ার। থাকি কলেজের হোস্টেলেই।
গেল সপ্তাহে বাড়ি ফিরেই দেখলাম মামা এসেছে। মামারা দশদিন ধরে ইজিপ্ট ঘুরে এল। মোবাইলে তার ছবি দেখাচ্ছিল। পিরামিড,মমি, তুতানখামেন, নীল নদ এসব দেখে মাথা ঘুরে গেল। ইশ, আমিও যদি যেতে পারতাম! কী দারুণ দারুণ গল্প বলছিল মামা। সেইসব শুনে আমার মনে হল আরিব্বাস, এগুলো নিয়ে তো আরও জানতে হবে!
মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে থাকার একটা মস্ত বড় সুবিধা হল দু'পা হাঁটলেই কলেজ স্ট্রিট! এমন কোনও বই আছে নাকি যেটা ওখানে পাওয়া যায় না! গুডরিডসের ওয়েবসাইট থেকে ইজিপ্ট নিয়ে লেখা কয়েকটা বইয়ের নাম দেখে নিয়েছিলাম। সোমবার ক্লাস শেষ হতেই রুমমেট পিজি কে নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম কলেজ স্ট্রিটে। পিজির ভাল নাম প্রদীপ্ত ঘোষ, ওইটাই ছোট হয়ে পিজি হয়ে গেছে। কলেজ স্ট্রিটে নেমে কিন্তু বেশ হতাশ হতে হল। যে বইটা খুঁজছি সেটা পাচ্ছিই না। কিন্তু সবাই একটাই কথা বলল, প্রেসিডেন্সীর গেটের বাইরেই বারো নম্বর দোকান। ভবেশ দার। ওখানে না পেলে নাকি আর কোথাও পাওয়ার চান্স নেই।
দোকান না বলে গুমটি বলাই ভাল। তিন চারটে পিলারের মতো করে বইয়ের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে,

একটু ঠেলা দিলেই হুড়মুড় করে পড়বে সবকটা। কাঠের তাকগুলোতেও গিজগিজ করছে বই। কলেজ স্ট্রিটের আর পাঁচটা গুমটির সাথে কোন তফাৎ নেই। দোকানের সামনে একটা টুলে বসে এক ভদ্রলোক মন দিয়ে বই পড়ছেন।

- দাদা, একটা বই খুঁজছিলাম।

কথাটা যেন ওনার কান অব্দিই পৌঁছল না। আবার ডাকলাম,

- দাদা, শুনতে পাচ্ছেন?

মাথা তুলে চাইলেন।

- চিল্লাও কেন খামোখা, উইলবার স্মিথ এর রিভার গড চাই তো?

- আপনি জানলেন কি করে?!

এবারে ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন। ছোটখাটো ছাপোষা চেহারা। গায়ে নীল স্ট্রাইপের পুরনো সুতির জামা, সাথে বাদামী রঙের সুতির প্যান্ট, উঠে আছে গোড়ালির একটু ওপরে। পায়ে একটা হাওয়াই চটি। মুখটাও মনে রাখার মতো নয়। রোগাটে, লম্বা,গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। চোখে একটা হাই পাওয়ারের চশমা। বয়স মনে হয় পঞ্চাশের আশেপাশে। জিজ্ঞাসা করলেন,

- এই চত্বরে কি নয়া?

- না না, তবে ঘন ঘন আসা হয় না, কিন্তু কেন বলুন তো?

- সেই থেকে দেখছি চষে বেড়াচ্ছ। আমি ওইদিকে চা আনতে গেছিলাম, কানে গেল কথাটা। তখনই জানতুম, তোমাদেরকে এই ভবেশ সামন্তর কাছেই আসতে হবে।

আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দুটো দেখতে দেখতেই ভবেশ বলতে লাগলেন,

- রিভার গড ছাড়াও উইলবার বাবুর সেভেন্থ স্ক্রোল, ওয়ারলক, হালের ডেসার্ট গড, ফারাও সব পাবে। ইজিপ্ট নিয়ে আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ফিকশন পড়ার শখ কেন?

- মানে, ফিকশনই তো ইন্টারেস্টিং লাগে বেশি, ফ্যাক্ট বেসড লেখা অতটা ভাল লাগবে না তো।

- হুঁ, কতটা পড়েছ ইজিপ্ট নিয়ে আগে?

- ওই স্কুলের বইতে যতটুকু থাকে, তারপরে বিশ্বকোষ, কাকাবাবু, শেয়াল দেবতা রহস্য, ফারাও-য়ের চুরুট, অ্যাস্টেরিক্স আর ক্লিওপেট্রা..

- ঠিক ঠিক, ক্লিওপেট্রা! লিজ টেলর! আমি দেখেছি।

পিজি মাড়ি বার করে হাসতে হাসতে বলল।

লোকটা মনে হল চোখ দিয়েই পিজিকে পুড়িয়ে মারবে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

- বাহ, কাকাবাবু, টিনটিন পড়ে ইজিপ্ট চিনছ! এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে? ইজি-প্টের ইতিহাস যে কোনও থ্রিলারকে হার মানাবে, এটা কি জানো?

- তাই নাকি! কিন্তু বাংলায় তো তেমন কিছু নেই।

- হ্যাঁ, বাংলায় নেই সত্যি, দু একটা বই ছাড়া। তবে ব্রিটিশদের লেখা গুচ্ছের বই আছে। তার এক একটা গল্প বললে তোমাদের নেশা চড়ে যাবে বলে রাখলুম।

এবারে আমার চোখ চকচক করে উঠল,

- আপনি মনে হচ্ছে অনেক জানেন ইজিপ্ট নিয়ে!

- বইয়ের দোকান দিয়েছি কি শুধু বেচবার জন্য নাকি! খনির মধ্যে বসি থাকি হে সারাদিন, না জানাটাই আশ্চর্যের নয় কি?

বইয়ের দোকান দিলেই যে বই পড়তে হবে তার কোন মানে নেই, তবে এই লোকটাকে দেখে মনে হল না বাজে বকছে বলে।

- আমার নাম স্পন্দন, আর এ আমার বন্ধু প্রদীপ্ত। আমরা মেডিকেল কলেজে পড়ি, এই উল্টো-দিকের হোস্টেলেই থাকি। আপনার কাছে দারুণ দারুণ গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে যে!

- বিড়ি হবে?

- না মানে আমরা তো বিড়ি খাই না।

- ধুস! যাকগে, সাড়ে সাতটা নাগাদ দোকান বন্ধ করব। একটা বিড়ির প্যাকেট নিয়ে চলে এস। গল্প কাকে বলে আজ বুঝবে।

এই বলে আবার বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজল ভবেশ সামন্ত। গুমটিতে একটাও লোক নেই। তাও কিসের ব্যস্ততা বুঝলাম না। বই পড়াটা লোকটার কাছে এখন বেশি জরুরী। আর কথা না বাড়িয়ে তখনকার মতো ফিরে এলাম হোস্টেলে।

পিজির একদম ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ও বেশ ছোটখাটো মানুষ, তাই ওকে একরকম বগলদাবা করেই পাক্কা সাড়ে সাতটায় হাজির হয়ে গেলাম বারো নম্বর গুমটির সামনে। লোকটা তখন কাঠের পাল্লায় তালা লাগাচ্ছে।

- ভবেশবাবু।

- খবরদার, এসব বাবু টাবু বলবে না, নিজেকে বেশ বুড়ো লাগে, ভবেশদা চলবে।

- ওহ, ওকে, ভবেশদা।

লোকটার হেবি ঘ্যাম। নির্বিকার চিত্তে বাকি কাজ করে নিয়ে বলল,

- বেনুর দোকানে চলো, আদা দিয়ে হেব্বি চা বানায়, খেতে খেতে গল্প জমবে। আমার প্যাকেট কই?

পিজি বাড়িয়ে দিল জীবনে প্রথম কেনা বিড়ির প্যাকেট।

বেনুদার গুমটি সবাই চেনে, পুঁটিরামের দোকানটাকে ডানদিকে রেখে কয়েক পা হাঁটলেই ডানদিকে বেনুদার চা পাঁউরুটির দোকান। যেদিন মেসের খাবার আর মুখে তোলা যায় না সেদিন আমরা এখানে এসে ম্যাগী, ডিম পাঁউরুটি খাই। বেনুদাকে তিনটে চা বানাতে বলে আমরা গুমটির সামনে পেতে রাখা বেঞ্চে বসলাম। ভবেশদা এবারে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল,

শুরুটা তাহলে গোড়া থেকেই করা যাক। তোমাদের বিদ্যে তো ঐ লিজ টেলর লেভেলের দেখলাম।

ভবেশদা পিজির দিকে তাকালো বাঁকা চোখে।

মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বেশ রাগ হল, মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টকে বই পড়া দেখাচ্ছে। একটা অ্যানাটমির বই দিয়ে বসিয়ে দিতে হয় একে। বুঝত পড়া কাকে বলে। কিন্তু এমন একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। লোকটাকে এক্ষুনি চটানো ঠিক হবে না। তাই চুপ করেই রইলাম।

আগে দেখি তোমরা কতদুর কী জানো। আচ্ছা, বলো দেখি মিশরের রাজধানী কী ছিল?

||

মেমফিসের নামটাও শোননি? মানে কাকাবাবুটাও দেখছি ভাল করে পড়া হয়নি। শুধু পড়ার বই গিলেছ বসে বসে।

- না মানে অনেকদিন আগে তো...
একদম ভুলেই গেছিলাম সত্যি মেমফিসের কথা, নিজের মনেই একবার জিভ কাটলাম।
- তো যাই হোক। মেমফিসে কি আছে জানো তো?
- হ্যাঁ এটা মনে আছে, স্টেপ পিরামিড।
- ঠিক। এই স্টেপ পিরামিডকেই বাকি সব পিরামিডের বাবা বা দাদু বলা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আগাগোড়া পাথর দিয়ে বানানো সৌধ। কে বানিয়েছিল জানো?
না, এইটাতো মনে হয় কাকাবাবুতে ছিল না। দুজনেই এবারে মাথা নাড়লাম।
- চলো তাহলে আজকে সেই লোকটার গল্পটাই হয়ে যাক। এই গল্প সাড়ে চার হাজার বছর পুরনো।
ইজিপশিয়ানদের প্রধান দেবতা 'রা'। সুর্যদেব। পৃথিবী যে গোল সেটা ওরা জানত না। তাই সুর্য পশ্চিম দিকে অস্ত গেলে ওরা ভাবত ওদের দেবতা এবারে মাটির নিচের জগতে যাত্রা শুরু করলেন। যেখানে মৃত্যুর পরে আত্মারা যায়। সেই কারণেই মেমফিস শহরের পশ্চিম প্রান্তে তৈরি হয়েছিল একটা নেক্রোপলিস। জায়গাটার নাম সাকারা। সেখানে মৃতদের কবর দেওয়া হত। প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে ছিল এই কবরখানা।
কবরে মৃতদেহ ছাড়াও রাখা থাকত জীবদ্দশায় ভোগ করে যাওয়া সব রকমের জিনিস। খাবার -দাবার, পোষাক, ওয়েপন, ফার্নিচার এমনকি বাজনা পর্যন্ত। যাতে অতিপ্রাকৃত জীবনে মানুষটার কোনো কষ্ট না হয়। কিন্তু প্রথমদিকের কবর গুলো ছিল চ্যাপটা ছিল বুঝলে, একতলা বাড়ির মতো। নীল নদের তীরের কাদামাটি পুড়িয়ে তৈরি করা ইঁট দিয়ে বানানো। ইজিপশিয়ানরা এখন ওকে বলে মাস্তাবা। আরবী ভাষায় যার মানে বেঞ্চ। তবে একজন ফারাও প্রথমবার অন্যরকম কিছু ভাবেন। তার নাম ছিল জোসার।
পিজি নিজের মনে মোবাইল নিয়ে খুটখুট করছিল। টক করে আমার কাছে হোয়াটস্যাপে একটা মেসেজ এল। খুলে দেখলাম পিজি লিখেছে,
জোসার? কেমন জুসার জুসার শুনতে লাগছে।
ভবেশদা বেশ বিরক্ত হল এতে,
- না, আমি উঠি, তোমাদের মন নেই দেখছি। ফালতু সময় নষ্ট করছি।
- না না দাদা, খুব সরি। এই, এই মোবাইল সাইলেন্ট করে দিলাম। আপনি বলুন।
পিজির দিকে কটমট করে তাকাতে সেও মুখটা ব্যাজার করে মোবাইলটা পকেটে পুরলো এবারে।
- তা কোথায় যেন ছিলাম?
- ওই ফারাও জুস..মানে জোসার।
- হুম, তা জোসারের মনে হল ওর সমাধিটা বাকিদের থেকে একদম আলাদা হতে হবে। ওরটা ইঁট দিয়ে নয়, পাথর দিয়ে বানানো হবে। কিন্তু অত ভারী পাথর দিয়ে একটা বাড়ি বানানো যাবে নাকি! আগে তো কেউ কখনও ভাবেনি এমনটা। জোসার তার সভায় সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটাকে কাজটার দায়িত্ব দিলেন। নাম ইমহোটেপ।
- আরে ইমহোটেপকে তো চিনি ! মামি সিনেমার ভিলেন। টাক মাথা ছিল, আনেকসুনেমুকে ভাল বাসত। হাঁ করে মুখ দিয়ে অ্যাত্তো পোকা বার করেছিল..।
পিজি এবারে মুখ হাঁ করে পোকা বার করা দেখাচ্ছিল

তোমার এই বন্ধুটি তো দেখছি হলিউডেই থাকে সারাদিন। সিনেমাটা একটা দারুণ মানুষের নামটাই খারাপ করে দিয়েছে। ইমহোটেপ কীরকম ট্যালেন্টেড লোক ছিল জানো? একই সাথে

ইমহোটেপ

রাজার অ্যাডভাইসার, কবি, আর্কিটেক্ট, অ্যাস্ট্রোলজার..
- বুঝেছি বুঝেছি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো।
ভবেশদা চায়ের কাপে সুরুৎ করে চুমুক দিয়ে বলল,
ধুস, লিওনার্দো তো কালকের ছেলে। ইমহোটেপ ওকে বলে বলে দশটা গোল দিত। তো যাই হোক, রাজা তো ইমহোটেপকে ওর কবর খানা বানাতে বলে খালাস। কিন্তু সেই জিনিস বানানো যায় কি করে! পাথরের ওপরে পাথর বসিয়ে উঁচু কিছু বানাতে গেলেই যে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই ছ'বার সমাধি বানাতে গিয়ে সেটা ভেঙে গেল। তখন ইমহোটেপ একটা বুদ্ধি বার করল। আচ্ছা যদি এমনটা করা যায় যে মাস্তাবার ওপরে আরেকটা মাস্তাবা, তার ওপরে আরেকটা, দেন আরেকটা। প্রতিটা ধাপই তার নিচেরটার থেকে ছোট হবে। সেইভাবে বানিয়েও ফেলা হল কবরখানা। আর এভাবেই তৈরি হল ইজিপ্টের প্রথম পিরামিড। ধাপে ধাপে উঠেছে তাই একে স্টেপ পিরামিড বলে।
- তাহলে এই পিরামিডের মধ্যেই জোসারের মমি ছিল?
- না সেটা ভুল ধারণা, সাকারার স্টেপ পিরামিড কিন্তু একদম নিরেট। পিরামিডের নিচে মাটির তলায় ইমহোটেপ কবরখানা বানিয়েছিল। সেখানে মমি ছাড়াও ছিল অনেক গুলো ঘর, রাজার আসবাব পত্র রাখার জন্য। সেই ঘর গুলো আবার জোড়া ছিল সরু সরু প্যাসেজ দিয়ে।
পিরামিডের চারিদিকে বিশাল বড় পাথরের দেওয়ালও বানিয়ে ছিল ইমহোটেপ। সেই দেওয়ালের

গায়ে চোদ্দখানা দরজা ছিল। যার মাত্র একটা দিয়েই পিরামিডের কাছে পৌঁছনো যেত। বাকি সব কটা অন্ধগলিতে গিয়ে শেষ হত।

স্টেপ পিরামিড

- ভুলভুলাইয়া!
- হ্যাঁ ভুলভুলাইয়াই বটে। তবে এখন সব মাটিতে মিশে গেছে। পিরামিডটাই শুধু বেঁচে আছে এই যা।
- যাই হোক, ভদ্রলোকের এলেম ছিল বলতে হবে। পাঁচহাজার বছর আগে আর্কিটেকচারের এরকম নলেজ তো জাস্ট ভাবা যায় না!
- তবে ইমহোটেপের আরও বড় কাজ ছিল কিন্তু ডাক্তার হিসেবে।
- বলেনকী! ডাক্তারও!
- হ্যাঁ, ইমহোটেপ দুশোর ওপরে রোগ সারিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে আছে গাউট, আর্থারাইটিস, টিবি। কিছু ছোটখাটো অপারেশনও করতেন। মানুষের অ্যানাটমির ব্যাপারে ওর দারুণ জ্ঞান ছিল। উনিই প্রথম বলেন রোগ ভোগ দেবতার অভিশাপ নয়, মানুষের শরীরেরই ফল্ট। তাই চিকিৎসা করলেই সারবে। আর এই সব কিছু ঘটছিল আমাদের সুশ্রুতেরও দেড় হাজার বছর আগে।
পিজি মনে হল এতক্ষণে বেশ আগ্রহ পেয়েছে,এবারে বলল,
একটাই লোক ডাক্তারও আবার আর্কিটেক্টও! অবশ্য হতেই পারে, লোকটা আমার মতন, আমারও জয়েন্টে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে..
ভবেশদা কিন্তু বলে যেতে লাগলেন, যেন পিজির কথাটা কানেই যায়নি,
- ভাবো তাহলে, কী মারাত্মক রকম ট্যালেন্টেড ছিলেন ইমহোটেপ। ইজিপ্টের মানুষেরা ওকে ভগবানের মতো পুজো করত। কিন্তু লোকটা একদিন রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গেল।

- সে কী? হারিয়ে গেল? এত বিখ্যাত একটা মানুষ?
- হ্যাঁ, কেউ আজ পর্যন্ত ইমহোটেপের কবর খুঁজে পায়নি। ওইরকম জনপ্রিয় একজন মানুষের কি হল সেটা কোথাও লেখা নেই। ইতিহাসের পাতা থেকেই লোকটা ভ্যানিশ হয়ে গেল। অনেকে আজও বিশ্বাস করে সাকারার মাটির নিচেই কোথাও ইমহোটেপের কবর লুকিয়ে আছে।
- এটাও তো বেশ মিস্ট্রির মতো। তবে ভবেশদা এই গল্পটা শুনতে শুনতে একটা কথা মাথায় এল।
- বলে ফেলো।
- আচ্ছা এই যে এতগুলো পিরামিড, মাস্তাবা, মমি এইসব তো ইজিপশিয়ানরা বানাতো কারণ ওরা পরলোকে বিশ্বাস করত তাই।
- ঠিক পরলোক না, মৃত্যুর পরের আরেকটা জীবন। সেই জীবনটা যাতে নির্ঝঞ্ঝাট হয় তাই জন্যই বানানো ওগুলো। বুক অফ ডেডের নাম শুনেছো?
শুনব না আবার! পিজি এবারে লাফিয়ে উঠল,
মামি রিটার্নসে ছিল তো, বুক অফ ডেড। দামড়া একটা বই, সোনায় মোড়া। সেইটা পড়লেই দুমদাম মরে যাওয়া মানুষ বেঁচে যায়। ওই করেই তো আনেকসুনেমু কে বাঁচাল। উফফ, আনেক-সুনেমু, ভাবলেই না গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে..
ভবেশদা এতক্ষণ মনে হয় নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছিল। কিন্তু পিজির এই মুহুর্মুহু গোলা বর্ষন আর নিতে পারল না। দুম করে উঠে দাঁড়াল।
-বাঁদর ছেলের দল সব। ভাল কিছু শেখার ইচ্ছা নেই। তোমাদের জন্য টিনটিনই ভাল।
বলেই হনহন করে হাঁটা লাগাল বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটের দিকে। আমরা অনেকবার করে ডাকলেও ফিরে তাকাল না।
হোস্টেলে ফিরেই পিজির নোটের খাতাটা জ্বালিয়ে দেব বলে ঠিক করলাম আমি।

২

মৃতের বই

না, আগের সোমবার পিজির নোটের খাতাটা আর পোড়াইনি। বেচারা কাঁচুমাচু মুখ করে ফিরছিল আমার সাথে। রুমে ঢোকার পরে মুখ খুলল,

- ইশ, আমার জন্যই জমাটি আড্ডাটা নষ্ট হল ভাই। আসলে আমার না আনেকসুনেমুর ওপরে একটা ইয়ে..

মনে হচ্ছিল পায়ের হাওয়াই চটিটা খুলে ওকে পেটাই। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে আটকে বললাম,

- যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। এখন আর কাঁদুনি গেয়ে কী হবে?

- না ভাই, লোকটা অনেক জানে বুঝলি। আমার নিজেরও হেব্বি লাগছিল শুনতে। এমন একটা মানুষকে হাতছাড়া করাটা ঠিক হবে না।

- কী করবি তাহলে?

- একবার গিয়ে স্যরি বলে আসব?

- এখন আর কোথায় পাবি ওকে, পরে একদিন ওর দোকানে যাওয়া যায়। কিন্তু তোর মার খাওয়ার একটা হাই চান্স আছে।

সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাসের খুব একটা চাপ থাকে না। আর ওই বোরিং ফার্মাকোলজি, প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি কাঁহাতক পড়া যায়? তাই আজকে সন্ধ্যেবেলায় পিজিকে নিয়ে আবার এসেছিলাম ভবেশদার দোকানে। আমাদের দেখেই না চেনার ভান করে আবার বই পড়তে লেগেছিল, কিন্তু পিজি হাতে বিড়ির প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে অনেক স্যরি টরি বলে ম্যানেজ করেছে। প্রমিস করেছে আর ভবেশদার গল্প বলার মাঝে ফুট কাটবে না। তবে তাতে আমার বিশ্বাস হয়নি।

আমরা তিনজনে এসে বসলাম বেনুদার দোকানে, আজকে ভবেশদার মুড ভাল করতে বেনুদাকে কফি বানাতে বললাম। আমি এবারে মোবাইলটাকে সাইলেন্ট করে পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললাম,

- ভবেশদা আজকে ওই বুক অফ দি ডেডটা নিয়ে কিছু বলুন না।

- বাহ, তোমার তো নামটা মনে আছে বেশ দেখছি। তবে ওই বই দিয়ে কিন্তু কাউকে বাঁচিয়ে তোলা যায় না। হলিউডি গাঁজাখুরি সব। বলতে পারো বুক অফ দি ডেড হল মৃত্যুর পরের রাজ্যে ঢোকার চাবি।

- মৃত্যুর পরের রাজ্য? মানে আমাদের স্বর্গ আর নরকের মতো?

- কিছুটা সেরকমই। কিন্তু আবার অনেকটা আলাদাও। সেই রাজ্যে পৌঁছনোর রাস্তাটাই ভয়ঙ্কর! ইজিপশিয়ানরা বিশ্বাস করত মানুষ মারা যাওয়ার পরে মাটির নিচে আরেকটা জীবন শুরু হয়। তাই অত যত্ন করে মমি বানানো। অত শত জিনিস মমির সাথে কবর দেওয়া।

- আচ্ছা, কবর দিয়ে দেওয়ার পরে তাহলে মৃতদেহ আবার বেঁচে উঠবে?

- না ঠিক তা নয়, দাঁড়াও বুঝিয়ে বলি।

বলে ভবেশদা পিজির দিকে তাকিয়ে বলল,

- আমরা ধরে নিই প্রদীপ্ত একজন ফারাও। আর আজকেই সকালে বাহ্যবমি করতে করতে ও মারা গেছে।

পিজির এই ব্যাপারটা একদমই ভাল লাগল না,

-আমিই কেন? আমার ঠাকুমা আমার কুষ্টি বিচার করেছিল। নব্বই বছর অব্দি বাঁচব জানেন? তা নয়, এখনই আমাকে মারার তাল করছেন। বুঝেছি, আগের দিন আপনার পেছনে লেগেছিলাম বলে এখন তার শোধ নিচ্ছেন তাই না?

আমি বললাম, আরে বাবা ভবেশদা তো কথার কথা বলছে, এত চটছিস কেন? একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে একটু সুবিধা হয় না কি?

আমার কথাটা পিজির খুব একটা মনপসন্দ না হওয়ায় গোমড়া মুখে চুপ করে বসে থাকল। ভবেশদা ফিচ করে একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে আবার বলা শুরু করল।

-ফারাও প্রদীপ্ত মারা যাওয়ার পরে সত্তর দিন ধরে ওর শরীরটাকে মমি বানানো হল।

-মমি কী করে বানাতো?

ওপেনিং অফ দা মাউথ

- একদিনে সব হজম করতে পারবে না, আজকে যেটা বলছি সেটা শুনে যাও চুপ করে। তো যেটা বলছিলাম, ওর মমিটা বানানো হয়ে গেলে সেটা দিয়ে দেওয়া হল বাড়ির লোকজনের হাতে। তারা এবারে সেটাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করল। সেই কবরে এবারে মমিকে ঢুকিয়ে তার ওপরে মন্ত্র

পড়া শুরু করল পুরোহিত। তার মধ্যে একটার নাম হল ওপেনিং অফ দা মাউথ। এতে মৃতের শরীরে প্রাণ আসবে। এর নাম আখ। আখ এবারে তৈরী হয়ে যাবে মাটির নিচের জার্নির জন্য।
- গতবার বলেছিলেন বটে যে ইজিপশিয়ানরা বিশ্বাস করত সূর্য পশ্চিমে ডুবে যাওয়ার পরে মাটির নিচে যাত্রা করে।
- ঠিক, প্রদীপ্ত এবারে সূর্য দেবতা রা-য়ের পথে চলতে থাকবে। রা সারারাত ধরে মাটির নিচে পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। যাতে পরেরদিন ভোরে আবার আকাশে উঠতে পারে। প্রতি রাতেই এই জার্নির সময় রা-য়ের নৌকোকে আক্রমণ করে আপেপ নামের একটা বিশাল সাপ। প্রতিরাতেই রা তাকে হত্যা করে। যে রাতে আপেপ জিতে যাবে তার পরের দিন সকালে আর সূর্য উঠবে না।

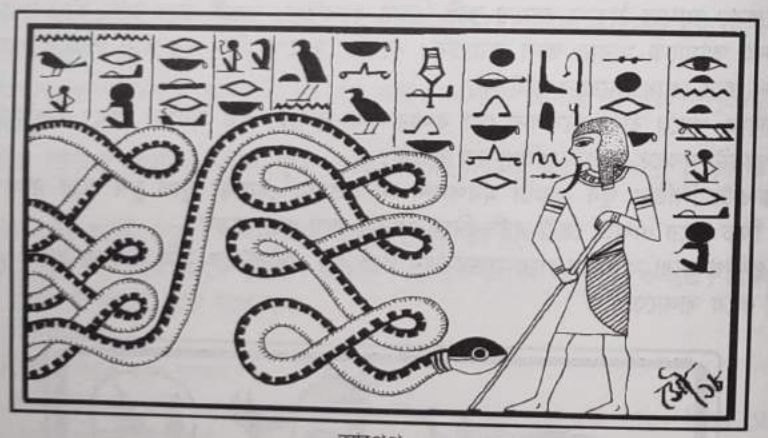

আপেপ

- তাহলে ফারাও পিজি-ও পূর্বে পৌঁছে যাবে?
- না না, তার আগেই ওর সামনে আসবে একটা গোলকধাঁধা। ওসাইরিসের নাম শুনেছ?
- শুনেছি,
গোমরা মুখে বলল পিজি।
-ইজিপ্টের মৃত্যুর পরের দেবতা।
- বাহ এই তো, একটু ইন্টারেস্ট এসেছে দেখছি। ঠিক বলেছ। ইজিপশিয়ানদের মৃত্যুর পরের জগৎটা পুরোটাই মাটির নিচে। সেই জগতের দেবতার নাম ওসাইরিস। অনেকটা আমাদের যম বা গ্রীক দেবতা হেইডিসের মতো। তোমার এই মরে যাওয়ার পরের যে জার্নিটা হবে সেটাতে তোমার নামের আগে ওসাইরিস বসে যাবে। মানে তুমি তখন ওসাইরিস প্রদীপ্ত।
বারবার মরে যাওয়ার কথাটা শুনতে পিজির একদম যে ভাল লাগছে না সেটা বুঝতেই পারছিলাম। কিন্তু এমন একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে ও রাগও দেখাতে পারছিল না। চুপ করে রইল। ভবেশদা বিড়িতে টান দিতে দিতে বলে চলল,

- প্রদীপ্ত এবারে এসে পড়বে একটা গোলকধাঁধার সামনে। তার সাতটা দরজা আছে। প্রতিটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে একজন দারোয়ান। সেখানে গিয়ে একটা স্পেসিফিক মন্ত্র বলতে হবে প্রদীপ্তকে। ঠিকঠাক মন্ত্র বললে তবেই গেট খুলবে।
- বাপরে! এতো হেবি চাপের জিনিস!
- চাপ তো এখনও কিছুই দেখনি ভাই স্পন্দন। এখনো অনেক খেলা বাকি। এই খান থেকেই প্রদীপ্তর দরকার লাগবে বুক ওফ দি ডেড কে। যেটা হয়ত প্যাপিরাসে লিখে ওর কফিনে ওর মমির সাথে রাখা আছে। অথবা কফিনের দেওয়ালে বা মমির গায়ের ব্যান্ডেজে সাঁটা আছে। এই বইয়ের জন্ম কবে হয়েছিল সেটা কেউ জানে না। ইজিপ্টের ইতিহাসের একদম প্রথম দিকে এগুলো পিরামিডের ভিতরের দেওয়ালে লেখা থাকত। সেগুলোকে এখন পিরামিড টেক্সট বলে। পরে ওদের একটু আধটু অদল বদল করে প্যাপিরাসে লিখে বই বানিয়ে মমির দেহর সাথে রাখা হতে থাকল। ১৮৪২ সালে জার্মান ইজিপ্টোলজিস্ট কার্ল লেপলিয়াস এই বইয়ের মানে উদ্ধার করেন। ওনারই দেওয়া নাম বুক অফ দি ডেড। যে বই মৃতকে ঠিকঠাক করে ওসাইরিসের সামনে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবে।
- ওসাইরিসও আবার পরীক্ষা নেবে? পিজি একটু অবাক হয়েছে মনে হল।
- নেবে না আবার? পাপ পূন্যের বিচার করেই তো ঠিক হবে যে তুমি কোনদিকে যাবে, স্বর্গে না নরকে। বুক অফ দি ডেড থেকে ঠিক ঠাক মন্ত্র আউড়ে তুমি তো কোনরকমে গোলকধাঁধা পেরোলে। কিন্তু তখনই তুমি এসে পড়বে স্বয়ং ওসাইরিসের সামনে। আরো বিয়াল্লিশ জন দেব দেবী মিলে তোমার বিচার করবে। এই জায়গাটার নাম হল 'কোর্ট অফ দ্য টু ট্রুথস'। এখানে তুমি ওই বুক অফ দি ডেড থেকেই আওড়াতে থাকবে। নেগেটিভ কনফেশন করবে। মানে যে যে পাপ গুলো জীবদ্দশায় করনি তাদের কথা বলবে। মানুষ পৃথিবীতে কোন না কোনও পাপ করবেই। তাই এই বিচারে ঠিক হবে সে কোন কোন পাপ করেনি। যদি ঠিকঠাক স্বীকার করতে পারো তাহলে তোমার শেষ পরীক্ষা নেবে ওসাইরিস।
- সেটা কিরকম?
- তোমার হৃদপিন্ডটার ওজন করা হবে।
- হৃদপিন্ডের?!
- হ্যাঁ, মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে হৃদপিন্ডই সব। একটা মানুষের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। তাই মমি বানানোর সময় শরীরের ভিতরের সব কিছু বার করে নিলেও হৃদপিন্ডটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হত। ওইটা ছাড়া তো মৃত মানুষটা ওসাইরিসের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।
- আর মমি বানানোর সময় ভুল করে যদি ওটাকে কেউ উপড়ে ফেলে তো?
- এমনটা হয়েছিল তো। দ্বিতীয় রামেসিসের মমি বানানোর সময়েই ভুল করে হৃদপিন্ডটাকে কেটে ফেলেছিল শরীর থেকে। তারপরে সেটা আবার সোনার সুতো দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। যদিও সেখানেও একটা ভুল করে ওরা। রামেসিসের মমিতে হৃদপিন্ডটা ছিল বুকের ডানদিকে লাগানো।
- এবাবা। বাজে কেস তো। যাই হোক, ওই ওজন করার ব্যাপারটা বলুন।
- হ্যাঁ, প্রদীপ্তর হৃদপিন্ডটার ওজন হবে এবারে। আনুবিসের নাম শুনেছ তো?
- শুনব না আবার! শেয়াল দেবতা!

- ঠিক, আনুবিস হলেন মামিফিকেশনের দেবতা। সেই আনুবিস একটা দাঁড়িপাল্লার একদিকে চড়াবেন হৃদপিন্ডটাকে, আরেকদিকে রাখবেন একটা অস্ট্রিচ পাখির পালক। যেটা দেবী মাতের মাথার মুকুট থেকে নেওয়া।
- মাত?
- হ্যাঁ, মাত হল সত্য আর ন্যায়ের দেবী। সেও দাঁড়িয়ে দেখবে দাঁড়িপাল্লার কোন দিকটা ভারী হল। যদি হৃদপিন্ড পালকের থেকে হালকা হয় তাহলে প্রদীপ্ত শেষ পরীক্ষাতেও পাস করে গেল।

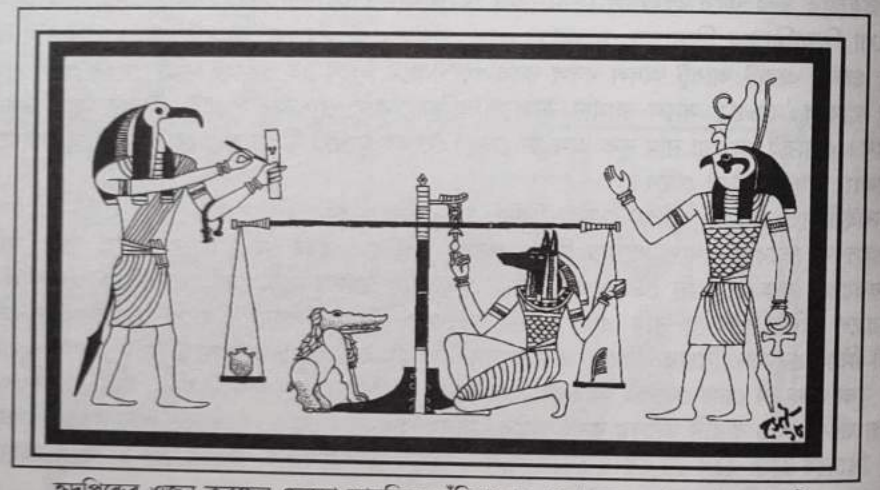

হৃদপিন্ডের ওজন করছেন দেবতা আনুবিস, দাঁড়িপাল্লার পাশে বসে আছে রাক্ষস আমিত

- আমি খুব ভাল মানুষ, আমার হৃদপিন্ডটা ওই পালকের থেকে হালকা হবেই। আমি শিওর। কিন্তু তার পরে কী? স্বর্গ?!
পিজির মুখটা বেশ খুশি খুশি এবারে। কিন্তু ভবেশদা ওর দিকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসল।
- স্বর্গ মানে তুমি কি বোঝো?
- মানে দারুণ সুন্দর একটা জায়গা। হেবি খাওয়া দাওয়া, চারিদিকে অপ্সরারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কাজ কর্ম নেই, সারাদিন শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও।
- তাহলে কিন্তু তুমি বেশ হতাশ হতে। ওসাইরিস পরীক্ষায় খুশি হলে তোমার যে আত্মাটা অন্য জগতে যাবে তার নাম হল দুয়াত। চারিদিকে লোহার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে নদী আছে, পাহাড় আছে, আর আছে বড় বড় ক্ষেত, সেখানে বার্লি চাষ হয়। তুমি সেখানে সুখেই থাকবে, ভাল ভাল খাওয়া দাওয়াও হবে। কিন্তু তোমাকে কাজও করতে হবে ভগবানের জন্য। ক্ষেতে চাষ করতে হবে। নদী থেকে জল তুলতে হবে। গরু চরাতে হবে।
- যাব্বাবা, এত খেটে খুটে শেষে চাষবাস করব?
- তুমি যদি সমাজের নিচের দিকের মানুষ হও তাহলে তো করতেই হবে। কিন্তু তুমি ফারাও

বলে তোমার হয়ে সেই কাজ গুলো তোমার অনুগতরা করে দেবে। ফারাওদের সমাধিতেই তাঁদের কফিনের সাথে রাখা হত মাটি আর কাঠ দিয়ে তৈরি করা পুতুল, এরা হল উশাবতি। মৃত ফারাও মাটির নিচের জগতে জীবন ফিরে পেলে এরাও বেঁচে ওঠে। তখন এরাই ফারাওয়ের কাজ গুলো করে।
- যাক তাহলে বাঁচোয়া। কিন্তু আপনি একটা কথা বললেন না তো?
- কী?
- যদি শেষ পরীক্ষায় হার্টটা পালকের থেকে ভারী হয়ে যায় তাহলে কী হবে?
- তার ফল কিন্তু মারাত্মক খারাপ হবে। এবারে গলার স্বরটা বেশ গাড় করে রহস্যময় ভাবে বলল ভবেশদা। আমি আর পিজি নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।
- মারাত্মক খারাপ মানে? কী হবে?
- আনুবিস যখন ওজন করছেন তখন আনুবিসের পিছনেই বসে থাকে একটা রাক্ষস, নাম আমিত, যার মুখটা কুমীরের, শরীরটা সিংহর আর পিছনের পা দুটো জলহস্তীর। এই পরীক্ষায় ফেল করলেই আমিত গপ করে হৃদপিন্ডটাকে খেয়ে ফেলবে। ব্যাস ওটা ছাড়া তো আত্মা এক পাও চলতে পারবে না। ওই খানেই আটকে রয়ে যেতে হবে অনন্তকালের জন্য।
- তারপর কি হবে?
- তারপর আর কি? সেই অশরীরী আত্মা পৃথিবীর মাটিতে হানা দেবে মাঝে মাঝে। ভয় দেখাতে থাকবে তার উত্তরসুরীদের। তার কোন মুক্তি নেই আর।
ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে দশটা বাজে। চারপাশটা খালি খালি হয়ে গেছে। বেনুদাও কখন দোকান বন্ধ করে চলে গেছে। বেশ একটা কাঁপুনি লাগছে এবারে। সেটা শীতের উত্তুরে হাওয়ার জন্য? নাকি ভয়ে? চারপাশটা আগেরদিনে শোনা জোসারের কবরখানার গোলকধাঁধার মতো লাগছে কেন?
ভবেশদাকে বাই বলে আমরা চুপচাপ হোস্টেলে ফিরলাম। রাতের খাওয়া শেষ করে যখন ঘরে ঢুকছি তখন পিজি বলল,
- ভাই আজ রাতে দুজনে একটা খাটেই শুয়ে পড়ি নাকি?
- হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই ভাল।
আজকে একা শোয়ার সাহসটা নিতে পারব না। স্বপ্নে আসবে ওসাইরিস, শিয়ালদেবতা আনুবিস আর কুমীরের মাথাওয়ালা আমিত।
ঘুমটা ঠিকঠাক এলে হয়।

৩

মমির গল্প (প্রথম পর্ব)

ডাক্তারির প্রথম বছরে অ্যানাটমিটা খুব ভয়ের জিনিস। ভয়টা যত না জীবনে প্রথমবার মৃতদেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য তার চেয়ে বেশি শরীরের প্রতিটা পেশী, শিরা, ধমনী, তাদের উৎস, গতিপথ মুখস্থ রাখাকে। আমার কিন্তু অ্যানাটমি দিব্বি লাগত। গোল্ড মেডেলও পেয়েছিলাম। তাই এখনও মাঝে মাঝে বিকেলে কলেজ ছুটির পরে অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ে ঢুকি। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে মেয়েগুলোকে পড়াই কয়েক ঘন্টা।

আজকেও সেরকমই একটা দিন ছিল। ছুটির পরে এক ঘন্টা মত পড়ালাম, তারপরে হোস্টেল মুখো। ঘরে ঢুকে দেখি পিজি খাটে আধশোয়া হয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে। খাটের পাশে একটা টুলে একটা বড় বাটিতে মুড়ি মাখা। আর তার পাশের চেয়ার টায় বসে আছে,

নান আদার দ্যান..

- আরে ভবেশদা যে! এখানে? কী..

আমার কথাটা শেষ করতে দিল না পিজি। নাক সিঁটকে খাট থেকে উঠে বসে বলল,

- তুই আবার বাচ্চাগুলোকে পড়াতে গেছিলি? ইস, গায়ে সেই ফর্মালিনের গন্ধ। একদম ঘরে ঢুকবি না এখন, যা আগে চান করে আয়।

বলে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি থেকে একটা গামছা টেনে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

অগত্যা।

||

চান করে যখন ঘরে ঢুকছি ততক্ষণে দেখি তিন কাপ চা-ও এসে গেছে। এবারে পিজি নিজেই আমার আগের প্রশ্নের জবাব দিল,

- আরে আজকে ক্লাসের পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি হাসপাতালের মধ্যে ভবেশদা ঘোরাঘুরি করছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল কোন এক ভাইঝিকে দেখতে এসেছিল। আমিও দুম করে ধরে নিয়ে চলে এলুম।

বুঝতেই পারলাম পিজি এখন গল্প শোনার মুডে আছে,

- কিন্তু পিজি কালকে ফার্মার ক্লাস টেস্ট, ভুলে গেলি?

- আরে ধুর নিকুচি করেছে তোর ক্লাস টেস্টের, অমন অনেক আসবে যাবে। তুই চুপ করে বোস তো। নে চা খা।

সত্যি বলতে কী মাসে তিনটে করে ক্লাস টেস্ট দিতে আমারও ভাল লাগে না। তবে একটু বেশি রাত অব্দি পড়লেই ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে। এই ভেবে আমিও এবারে বারমুডার ওপরে একটা গেঞ্জি গলিয়ে পিজির খাটেতেই হাঁটু মুড়ে বেশ জমিয়ে বসলাম।

- তা ভবেশদা, আজকে হাতে সময় আছে তো?

- আমার হাতে তো সময়ই সময়, আগে একটা কথা বলো তো, তোমার গা দিয়ে ফর্মালিনের গন্ধ ছাড়ছিল কেন?

- ওহ, জুনিয়রদের একটু অ্যানাটমি পড়াচ্ছিলাম, ওখানে ডেডবডি গুলোতে ফর্মালিন দেওয়া থাকে তো...

- জানি, যাতে না পচে যায়। একে কী বলে বলত?

- এমবামিং।

বুঝতেই পারছি ভবেশদা কোনদিকে যেতে চাইছে,

- আজকে কি মমি নিয়ে কিছু হবে নাকি?

ভবেশদা এবারে একটু হেসে বলল,

-হতেই পারে, মমির রহস্য নিয়ে তো সবার মনেই প্রশ্ন, কী করে একটা মানুষকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় অবিকৃত রেখে দিত ওরা? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন এত খাটনি খাটার কী দরকার ছিল?

- ঠিক, শরীরটাকে প্রিসার্ভ করে লাভ কী হত?

- হুঁ হুঁ বাবা, কারণ তো আছেই, মিশরের প্রথম মমি কার হয়েছিল জানো?

- নাহ, সেটা ঠিক জানা নেই।

- শুনলে অবাক হয়ে যাবে। প্রথম মমি একজন দেবতা নিজেই, স্বয়ং ওসাইরিস!

- বলেন কী!

ভবেশদা এবারে এক মুঠো মুড়ি গালে ফেলে চেবাতে চেবাতে বলল,

- আগে সেই গল্পটা শুনে নাও তাহলে। ওসাইরিস, সেথ আর আইসিস তিন ভাইবোন। আবার আইসিস ওসাইরিসের স্ত্রীও।

-অ্যাঁ! বোনই স্ত্রী?

- হ্যাঁ মিশরের পুরাণে এরকম উদাহরণ অনেক আছে। অনেক ফারাওরাও তাদের বোনকে বিয়ে করতেন। তো যেটা বলছিলাম, ওসাইরিস তখন মিশরের রাজা। সিংহাসনে বসে আছেন। কিন্তু ওসাইরিসের ভাই সেথের খুব রাগ ওর ওপরে। সেই সেথই একদিন ওসাইরিসকে বুদ্ধি করে খুন করলেন। তারপরে ওসাইরিসের দেহটাকে বিয়াল্লিশটা টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন মিশরের দিকে দিকে। ওসাইরিসের স্ত্রী আইসিস এবারে একটা চিলের রূপ নিয়ে খুঁজতে বেরোলেন স্বামীর শরীরের অংশগুলো। লিঙ্গ বাদে সবকটা টুকরোই পাওয়া গেল। মৃত ওসাইরিসের এক একটা টুকরোকে জোড়া লাগালেন আইসিস। লিঙ্গটা তৈরি হল সোনা দিয়ে। তারপরে সেই ওসাইরিসের দেহের সংরক্ষন করল আনুবিস।

- আনুবিস?!

- হ্যাঁ আনুবিস মানে শেয়াল দেবতাই ওসাইরিসের মমি বানালেন। সেই প্রথম মমি বানানো। তারপরে ওসাইরিসের শরীরে প্রাণ এল। পুনর্জন্মের পরে ওসাইরিস আর আইসিসের একটা সন্তান হল, তার নাম হোরাস। সে'ই পরে সেথকে যুদ্ধে হারিয়ে বাবার হত্যার বদলা নেবে।

- আচ্ছা, সেই জন্যই গতবারে বলেছিলেন আনুবিস মামিফিকেশনের দেবতা।

- একদম ঠিক। অন্যদিকে ওসাইরিস তার পুনর্জন্মের পরে পাতালে চলে যায়। সেই থেকে সে মৃত্যুর পরের জগতের দেবতা, এই জগতের নামই দুয়াত।

ওসাইরিসের মমি বানাচ্ছেন দেবতা আনুবিস

- হ্যাঁ বলেছিলেন তো।
- হ্যাঁ, তাই দেখবে ওসাইরিসের যেকোনও ছবিই মমিরই মতো। হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখা, সোজা মাথা। পা দুটোও জোড়া। যেন গোটা শরীরটাই কিছু দিয়ে মোড়ানো আছে।
এতক্ষণে পিজি মুখ খুলল,
- হুম, ওসাইরিসকে কপি করেই তাহলে মমি বানানোর শুরু।
- না ঠিক কপি করে না। মিথোলজি তো মানুষেরই তৈরি। মানুষের জীবনের গল্পই তাতে থাকে। এই গল্প ছাড়াও মমি বানানোর পিছনে আরেকটা ফিলোসফিকাল কারণ আছে বুঝলে।
- আরেকটা কারণ!
- হ্যাঁ, আর এটাই মুখ্য কারণ। ইজিপশিয়ানরা বিশ্বাস করত একজন মানুষের তিন রকমের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে একজন হল 'আখ'।
- হ্যাঁ, যেটা সেই ওসাইরিসের সামনে পরীক্ষায় পাস করলে স্বর্গের দিকে যেতে পারে।
- ঠিক, আরেকরকমের আত্মা হল 'বা', যে আত্মার ডানা আছে, পাখির রূপ ধরে সে দিনের বেলায় কবর থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে ঘুরতে পারে। রাতের বেলায় আবার কবরে ফিরে আসে।
- আর তিন নম্বর আত্মা?
- তার কথাই এখানে আসল, সেই আত্মার নাম হল 'কা', কা'ই হল শরীরের মুল জীবনীশক্তি।

অন্য দুটো আত্মা মৃত্যুর পরে তৈরি হলেও কা মানুষ জন্মাবার সময়তেই সৃষ্টি হয়। তাই কা কে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল শরীরটাকে টিকিয়ে রাখা।

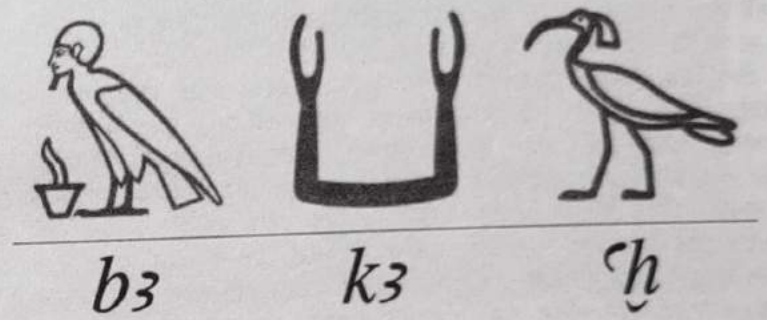

তিনরকমের আত্মা- বা, কা, আখ

আমি বললাম,
- এবারে বুঝলাম, এই কা-কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মৃতদেহের সংরক্ষন করার দরকার পড়ে। তাই থেকেই মমি বানানোর শুরু।
- ঠিক ধরেছ, এই কা-কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মমির সাথে কবরে রাখা হত খাবার দাবার, জল,সাজগোজের জিনিস, এমনকি টয়লেট পর্যন্ত। ইজিপ্ট এমনিতেই খুব শুকনো দেশ। প্রথম দিকে মৃতদেহদের কবর দেওয়া হত বালিতে গর্ত খুঁড়ে। খুব কম আর্দ্রতা থাকার জন্য গরম বালির নিচে সেই দেহগুলো শুকিয়ে গেলেও পচত না একেবারেই। কিন্তু ফারাওরাই প্রথম ভাবতে লাগল যে আমাদের কবর বাকিদের সাথে হবে কেন? আমরা রাজা, আমাদের সমাধি হবে অন্যদের থেকে আলাদা, চোখ ধাঁধানো। কিন্তু তাহলে তো কফিনের মধ্যেই একটা মাইক্রো ক্লাইমেট তৈরি করতে হবে, যেটা হবে বালির কবরের মতোই। শুকনো, আবার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলেও চলবে না। এই চিন্তা থেকেই শুরু হল মমি বানানোর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সময় লেগেছিল কয়েক হাজার বছর। শুধু মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন এই কাজটা জানতো। তাই এদের মূল্য ছিল অপরিসীম। প্রথমদিকে শুধু ফারাওদের মমি তৈরি হলেও পরে ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। তখন পকেট গরম থাকলেই নিজের মমি বানিয়ে নেওয়াটা কোন ব্যাপার না। তাই এখন ফারাওদের মমি ছাড়াও অনেক ধনী পরিবারের লোক কিংবা তাদের স্ত্রী, কন্যাদেরও মমি পাওয়া যায়। আদরের পোষ্যদেরও মমি বানিয়ে রাখার চল ছিল।
পিজি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিল, এবারে বলল, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু মমিটা ওরা বানাতো কী করে?
ভবেশদার চা-টা হাতের কাপেই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে,একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সেটাকে শেষ করে বলল,

মমি তৈরির রেসিপিটা বুঝলে অনেকটা শুক্তো রান্না করার মতো, মোটামুটি উপকরণগুলো সবার চেনা। কিন্তু ভাল রাঁধতে খুব কম লোক পারত।

- কিছু তো একটা রহস্য ছিলই।

- হ্যাঁ, সে তো থাকবেই। কীভাবে মমি বানাতে হবে সেটা শুধু কিছু সংখ্যক লোকেরাই জানতো। তারা সেই সিক্রেট কারোর কাছে বলত না। হেরোডোটাসের নাম শুনেছ তো?

- শুনব না আবার? স্কুলের ইতিহাস বইতে পড়েছিলাম তো।

- ঠিক, গ্রীক ইতিহাসবিদ, ফাদার অফ হিস্ট্রি বলা হয় একে, যীশুর জন্মের দেড় হাজার বছর আগে হেরোডোটাস ইজিপ্ট ঘুরে গেছিলেন। ওঁর লেখাতেই মমি কিভাবে বানানো হত তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। মমি বানানোর ওয়ার্কশপ গুলো ছিল শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, মরুভূমির কাছাকাছি। সেখানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পরে বাড়ির লোকেদের প্রথমে ছোট ছোট কাঠের বানানো মমির রেপ্লিকা দেখানো হত। এক এক রকম মমির এক এক রকম দাম। দাম ঠিক হওয়ার পরে মৃতদেহকে নিয়ে আসা হত একটা ঘরে, তার নাম ইব। সেখানে তাকে তিনদিন ধরে ভাল করে জল দিয়ে ধোয়া হত। ইবের পরে মৃতদেহের গন্তব্য ছিল আরেকটা ঘর, নাম ওয়াবেত। ওয়াবেত মানে পবিত্র স্থান। এখানেই তারপরে শুরু হত মমি বানানো। প্রথমেই একটা তামার তৈরি সরু আঁকশি মৃতের নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত খুলিতে। তাই দিয়ে কুড়ে কুড়ে মস্তিষ্কটাকে বার করে নেওয়া হত।

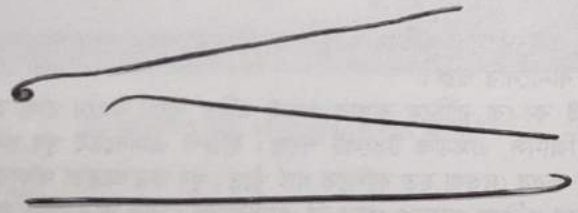

যেরকম তামার আঁকশি দিয়ে মাথার ঘিলু বার করে নেওয়া হত

যেটুকু বেরতো না সেটুকু জলের স্প্রে করে বার করা হত। এরপরের কাজ হল শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলো বার করা। ধারালো ইথিওপিয়ান ব্লেড দিয়ে পেটের বাঁদিকে লম্বালম্বি ভাবে চিরে বার করে নেওয়া হত নাড়িভুঁড়ি, লিভার,কিডনি,স্প্লিন আর ফুসফুস। আগেই বলেছি হৃদপিন্ড ওদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল, তাই ওটিকে ছোঁয়া হত না। এই বার করে নেওয়া অঙ্গগুলোও আবার শুকিয়ে রাখা হত অ্যালবাস্টার পাথরের জারে তে। সেগুলো মমির সাথেই কফিনে যেত। ভিসেরাগুলো বার করে নেওয়ার পরের কাজ হল শরীরটা থেকে জল একদম টেনে বার করে নেওয়া। কারণ জল থাকলেই শরীর পচতে শুরু করবে। এই জন্য ব্যবহার করা হত ন্যাট্রন। এই ন্যাট্রনের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দেওয়া হত ফাঁপা পেটের মধ্যে। তারপর গোটা শরীরটাকে

চুবিয়ে রাখা হত ন্যাট্রন ভর্তি চৌবাচ্চায়, চল্লিশ দিনের জন্য! একটা শরীরকে একদম শুকিয়ে খটখটে করার জন্য লাগত প্রায় আড়াইশো কিলো ন্যাট্রন।

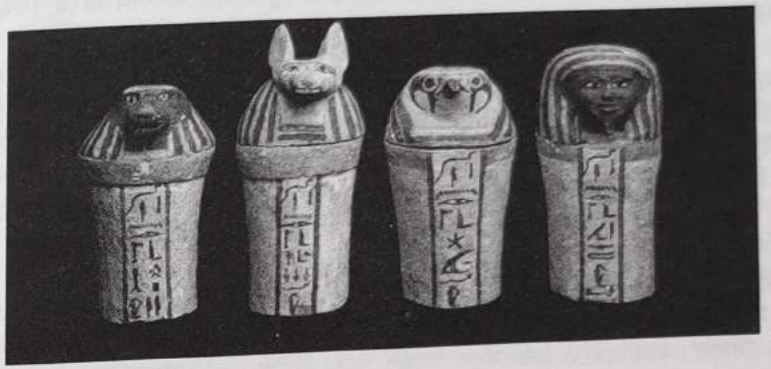

অ্যালাবাস্টারের যে জারগুলোতে শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলো রাখা হত

ন্যাট্রনের চৌবাচ্চায় মৃতের শরীর

- এই ন্যাট্রন কি জিনিস?

- এটা হল বুঝলে একরকমের পাথরের গুঁড়ো, হাইড্রেটেড সোডিয়াম কার্বোনেট। রঙ হত সাদা বা স্বচ্ছ। পাওয়া যেত নুনের লেকগুলোতে। যেটা বলছিলাম, চল্লিশদিন পরে সেই দেহকে তুলে নিয়ে আসা হত। তারপরে তার চামড়ায় লাগানো হত সিডার অয়েল আর তরল রেজিন, তাতে

মেশানো থাকত নানান রকমের মসলা, সেই মশলাগুলোর একটা ছিল দারচিনি। যেটা নিয়ে আসা হত ভারতবর্ষ থেকেই!

- বাপরে! মমি বানানোর জন্য তাহলে আমাদের দেশের একটু হলেও অবদান আছে, কিন্তু মড়ার শরীরে এরকম করে তেল ঘষার কারণটা কী?

- কারণটা দুটো, প্রথমত পোকা মাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, আর দ্বিতীয়ত এর জন্য শরীর থেকে একটা সুগন্ধও বেরোতো। এই তেল লাগানোর পরে মৃতের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত খড়, কাঠের গুঁড়ো, বালির মিশ্রণ। মুখ,নাকের ফুটো বুজিয়ে দেওয়া হত মোম দিয়ে। চোখ দুটোও সরিয়ে নেওয়া হত, তার জায়গার আসত সাদা পাথরের ওপরে আঁকা চোখ। এই সব কাজ কিন্তু করত মূল পুরোহিত, সে পরে থাকতো আনুবিসের মুখোস। এঁকে বলা হত 'হেরি সেশেতা', ইংরাজিতে যার মানে দাঁড়ায় 'লর্ড অফ দি সিক্রেটস'।

- কিন্তু মমির ছবি গুলো যে দেখি কাপড় দিয়ে মোড়ানো।

- হ্যাঁ এখানেই আসছিলাম, এটাই লাস্ট স্টেপ। কিন্তু এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই বিজ্ঞানের সাথে মিশে যায় বিশ্বাস। হেরি সেশেতা বেশ কয়েকদিন ধরে মৃতের শরীরটাকে কাপড় দিয়ে মুড়ে ফেলত। মাথা থেকে শুরু করে পায়ের পাতা অবধি। এটা করার সময় পাশে দাঁড়িয়ে যাদুমন্ত্র পড়ত আরেকজন পুরোহিত, যাকে বলা হত 'হেরি হেব'। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজেও রেখে দেওয়া হত মন্ত্রপূত অ্যামুলেট বা প্যাপিরাসের পাতা। এই কাপড় দিয়ে মোড়ানোর কাজটা হলেই মমি তৈরি শেষ।

পিজি এবারে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল,

- বাপরে! এতো হেবি ফ্যাচাংয়ের ব্যাপার!

- এখানেই শেষ ভাই প্রদীপ্ত? মমি বানানো হয়ে গেলে তাকে দিয়ে দেওয়া বাড়ির লোকের হাতে। তারা তাকে ঢোকাতো কাঠের কফিনে। সেই কফিনের গায়ে বা ভিতরের দেওয়ালে লেখা থাকত বুক অফ দি ডেডের মন্ত্রগুলো, আগেরদিন যেটা বললাম। তারপরে সেই কাঠের কফিনের জায়গা হত পাথরের কফিনের মধ্যে।

- হ্যাঁ জানি, ওগুলোকেই সারকোফেগাস বলা হত তো?

- একদম তাই। কিন্তু সারকোফেগাস নামটার মানে জানো?

- তা তো জানি না।

- ইজিপশিয়ানরা কিন্তু এই শব্দ ব্যবহার করত না। এই যে আমরা এত রকমের ইজিপশিয়ান দেব দেবীর নাম বলছি সেগুলোর অনেকটাই কিন্তু গ্রীক আর রোমান উচ্চারণ। ওরা প্রায় সাতশো বছর দেশটাকে শাসন করেছিল। তেমনই সারকোফেগাস শব্দটাও গ্রীক। সারকো মানে মাংস, আর ফেগাই মানে খাওয়া। সারকোফেগাস মানে তাহলে মাংস খাওয়া।

- এরকম অদ্ভুত নাম কেন!

- কফিন গুলো তৈরি হত লাইমস্টোন দিয়ে। এই কফিনের ভিতরের যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তাতে মৃতদেহের মাংসপেশী গুলো শুকিয়ে প্রায় ভ্যানিশ হয়ে যেত। কিন্তু পচন ধরত না। তাই নাম সারকোফেগাস।

আমি এই সময় ভাবছিলাম বাপরে, সত্যিই কত কিছু জানি না। শব্দটা সেই মমি সিনেমা দেখার সময় থেকে শুনে আসছি, কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে নামটার এরকম অদ্ভুত একটা মানে আছে। কিন্তু একটা জায়গায় খটকা থেকেই যাচ্ছিল। তাই ভবেশদার কাছেই জানতে চাইলাম,

- তাহলে আমাদের কলকাতা মিউজিয়ামের মমিটার এমন খারাপ অবস্থা কেন?

- ভাল কথা বলেছ, কলকাতায় মমিটা কবে এসেছিল জানো?

- না তো।

- ঠিক কবে এসেছিল সেটা জানা যায়না, তবে ৫ই জুলাই, ১৮৩৪ এর তারিখে কোলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংসের একটা নোট পাওয়া গেছে। ওইদিন সোসাইটি একটা চিঠি পায় বেঙ্গল লাইট ক্যাভালরির জনৈক লেফটেন্যান্ট আর্চবল্ডের কাছ থেকে। তিনি নাকি সোসাইটিকে একটি মমি গিফট করতে চান। যেটা পাওয়া গিয়েছিল ইজিপ্টের গৌরভা নামের একটা জায়গায় ফারাওদের সমাধি থেকে। আর্চবল্ডের জাহাজের লোকজন ভয় পেয়ে ওই মমিকে নিতে চায়নি। তাই তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রণতরীতে করে আনা হয় মুম্বইতে, সেখান থেকে কোলকাতায়। এটা সত্যি যে সেই মমির হালত এখন খুব খারাপ, মাথার খুলি বেরিয়ে গেছে। ভাল ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। তবে খোদ ইজিপ্টেই মমিদের যা হাল হয়েছিল শুনলে চমকে যাবে।

কোলকাতা মিউজিয়ামের মমি

- ওরা মমির ক্ষতি করবে কেন? ওরা তো এই কাল্টে বিশ্বাস করত।
- সে তো মাত্র কয়েক হাজার বছরের জন্য ভায়া। মানুষের মন থেকে একসময় সেই বিশ্বাস কর্পূরের মতো হাওয়া হয়ে যেতে থাকে। ফারাওদের সমাধি গুলোতে বারবার ডাকাতি হত, শক্ত পাথরের দেওয়ালে গর্ত খুঁড়ে ডাকাতরা ঢুকে পড়ত। লক্ষ্য ছিল মমির সাথে সাজিয়ে রাখা সোনা গয়না আর আসবাবপত্র। সেসব কিছু লুট করে নেওয়ার পরে মমির শরীরটাকেও ছাড়েনি ওরা। ফারাও তৃতীয় তুতমোসিসের মমি যখন পাওয়া যায় তখন তার বুকে একটা বড় ফুটো। ডাকাতেরা কাপড় কেটে বুকের কাছে বসানো সোনার অ্যামুলেট খুলে নিয়েছিল। কত মমি পাওয়া গেছে হাত, পা, গর্দান ছাড়া। সমাধি লুট করার সময় ডাকাতরা ছোট ছোট বাচ্চাদের মমিগুলোকে জ্বালিয়ে মশালের মতো ব্যবহার করত। এমনকি কাঠের কফিনেও আগুন লাগিয়ে দিত। যাতে তাতে লেগে থাকা সোনা গলিয়ে বার করে নেওয়া যায়।
- তাহলে ভাগ্যিস ইউরোপের লোকজন গিয়ে পড়েছিল মিশরে! তাই যতটুকু রিস্টোরেশন..
- কিসের রিস্টোরেশন? ইউরোপের লোকজন মিশরের খবর পায় কার জন্য জানো?
- না তো।
- নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্য। সে আরেক গল্প, অন্য আরেক দিন বলা যাবে খন। কিন্তু আমার এখানে বক্তব্য হল যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানীর লোকেরাও মমিদের নিয়ে খুব একটা ভাল ব্যবহার করেনি।
- মানে? ওরাও লুট করত?
- লুট আর করবে কী? ততদিনে প্রায় সব সমাধি লুট হয়েই গেছে। ওরা মমিগুলোকে জাহাজে বোঝাই করে দেশে আনত। ফ্রান্সে আর লন্ডনে বিত্তশালীদের বাড়িতে লোকজন ডেকে তামাশা চলত। কখনও সেটা দেখানোর জন্য টিকিটও বিলি করা হত।
- কিসের তামাশা?
- মমি খোলার। টেবিলে মমিটাকে শুইয়ে দামড়া দামড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে তার কাপড়ের আচ্ছাদন খোলা হত। তাতে কোন রকম বৈজ্ঞানিক ভাবনা ছিল না। শুধুমাত্র সস্তার থ্রিল আর কৌতুহলের জন্য কত শত মমি যে নষ্ট হয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।
- ছি ছি। এমন একটা দারুণ শিল্প এভাবে নষ্ট করেছে!

- এ তো কিছুই নয়, মমি খাওয়ার কথা কখনও ভাবতে পারো?
কথাটা শুনেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। পিজিও দেখলাম একবার ওয়াক করল। মমি আবার খাবে? ভবেশদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল এবারে, তারপরে বলল,
- ঠিকই শুনেছ। পার্সিয়ান পাহাড়গুলোতে একরকমের বিটুমেন পাওয়া যেত, তার নাম মামিয়া। গ্রীক ফিজিসিয়ান ডায়োস্কোরিডেস তার বইতে এই মামিয়াকে মমি বলে ভুল করেন। সেই বইটাকেই ফলো করে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এই অদ্ভুত ওষুধ ব্যবহারের ধুম পড়ে যায়। ১৫৮৬ সালে ব্রিটিশ মার্চেন্ট জন স্যানডারসন জাহাজে করে ৫০০ কিলো মমি নিয়ে আসেন লন্ডনে। সেগুলোকে গুঁড়ো করে সেই পাউডারের সাথে আরো কিছু মসলা আর হার্বস মিশিয়ে আজগুবি ওষুধ তৈরি হত। সেই ওষুধ নাকি ফোঁড়া থেকে শুরু করে প্যারালিসিস পর্যন্ত সারিয়ে দেয়। কে এই ওষুধের বিজ্ঞাপণ করেছিল জানো? নামটা শুনলে চমকে উঠবে, ফ্রান্সিস বেকন, সেই সময়কার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

- বলেন কী!
- হুম, মানুষ চড়া দামে পাগলের মতো ওই ওষুধ কিনতো। একসময় চাহিদা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে শেষের দিকে বেওয়ারিশ মৃতদেহ তুলে এনে ব্যান্ডেজ করে আবার মাটিতে পুঁতে কিংবা রোদে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে বিক্রি করত। এই সব চলতে থাকে আরো দুশো বছর ধরে। শেষ হয় এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষের দিকে, যখন ইজিপ্টের ওটোমান সম্রাটরা বে-আইনি মমি পাচার নিষিদ্ধ করে দেয়। তারপরে প্রথম যে মমিটা গোটা দেহে লন্ডনে ঢোকে সেটাকে রাজা দ্বিতীয় চার্লস আনিয়েছিলেন নিজের রক্ষিতার মন জয় করার জন্য। সেটাকে এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।
- তাহলে ঠিকঠাক অ্যানাটমিকাল ডিসেকশন হয়ইনি কখনো মমির?
- কে বলেছে হয়নি? হয়েছে তো। কিন্তু আজকে আর সে গল্প নয়। একদিনে আর কত হজম করবে? বলেই হাতের ঘড়ি দেখল ভবেশদা।
- ইশ, সাড়ে দশটা বেজে গেল। আমার ট্রেনটা না মিস হয়ে যায়। উঠি আজকে। কাল সন্ধ্যে বেলায় দোকানে এসো। তখন না হয় বাকিটা বলে দেব। খুব কৌতুহল হলে গুগল করেও দেখতে পারো। তবে বেশি কিছু পাবে বলে মনে হয় না। এই ভবেশ সামন্তর কাছেই আসতে হবে জানি। বলেই ভবেশদা উঠে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অদ্ভুত মানুষ বটে একটা!

৪

মমির গল্প(দ্বিতীয় পর্ব)

পরের দিন সন্ধেবেলায় ভবেশদার দোকানে গিয়ে দেখি যথারীতি বই মুখে নিয়ে বসে আছে। দোকানে খদ্দের তো দেখি না বিশেষ কখনো, কি করে সংসার চলে কে জানে। আমাদের দেখে মাথা তুলে বলল,

- বাহ মানিকজোড়, এসে গেছ? খুব ভাল, ঝট করে বাকিটা বলে দি। আজকে একটু জলদি বাড়ি ফিরতে হবে। তা কোথায় যেন ছিলাম?

- ওই যে মমির শরীরের ঠিকঠাক ডিসেকশনের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল।

- ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মমির প্রথম মেডিক্যাল অটোপ্সি। যিনি করেছিলেন সেই মানুষটার জীবনটাও ছিল অদ্ভুত বুঝলে।

- কীরকম?

- অগাস্টাস গ্রেনভিল, জন্ম ১৭৮৩ সালে মিলান শহরে। অগাস্টাস যখন বড় হচ্ছে তখন ইতালির ওই অংশটা নেপোলিয়নের দখলে। ডাক্তারি পাস করতে না করতেই অগাস্টাস খবর পেলেন যে তাকে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে ঢুকতেই হবে। এদিকে যুদ্ধ তো ওঁর বিন্দুমাত্র ভাল লাগে না। তাই তিনি মিলান থেকে পালিয়ে চলে এলেন ভেনিসে। তারপরের বছর গুলোতে অগাস্টাস ইউরোপের একটার পর একটা দেশে ঘুরে ঘুরে ডাক্তারি করেছেন আর নানান রোগে ভুগেছেন। প্রথমে গ্রীস, যেখানে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়লেন। সেটা যদি বা সারলো, তো তুরস্কতে গিয়ে হল প্লেগ। তুরস্ক থেকে স্পেন, সেখান থেকে পর্তুগাল। সেখান থেকে ব্রিটিশ নেভির জাহাজে করে ওয়েস্টইন্ডিজ। এত দেশ ঘুরে অগাস্টাস সাহেব অবশেষে এক ব্রিটিশ মেমকে বিয়ে করে লন্ডনে থিতু হলেন। লন্ডনে ওঁর পসার ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠতে লাগল। উনি তখন শহরের নামজাদা সার্জেন আর গাইনোকলজিস্ট। সমাজের সবরকম উঁচুতলার লোকেদের সাথে ওঠাবসা।

তা এই অগাস্টাসের একজন রুগী ছিলেন আর্চিবল্ড এডমন্সটন, যে কিনা সদ্য ইজিপ্ট থেকে ফিরেছে। সে সার্জেন সাহেবকে একটা অদ্ভুত খবর দিল। আর্চিবল্ড নাকি ইজিপ্টের থিবস এলাকা থেকে একটা গোটা মমি তুলে নিয়ে এসেছেন, একদম কফিনে সিল করা। অগাস্টাসের তো চোখ দুটো চকচক করে উঠল। তোমাদের আগেই বলেছি সেই সময় লন্ডনের যেখানে সেখানে লোক জড়ো করে মমি খোলার ধুম পড়ে গেছে। কিন্তু অগাস্টাস ভাবলেন যে যদি একদম যত্ন নিয়ে মমিটা খোলা যায় তাহলে মামিফিকেশনের রহস্যটা বোঝা যাবে! সেকথা বললেনও আর্চিবল্ডকে।

ব্যস, পরেরদিনই অগাস্টাসের বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে গেল থিবসের সেই মমি। সালটা ১৮২৫।

ছয় সপ্তাহ ধরে গ্রেনভিল একটু একটু করে মমির গায়ের কাপড়ের প্যাঁচ খুললেন। কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটা নীলচে কাঁচের ছোট ছোট গুলি আর গমের দানা। পুরোটা খুলে ফেলার পরে বোঝা গেল সেটি একজন নারীর। শরীরটা শুকিয়ে এলেও পেটের চামড়া থেকে বোঝা যায় জীবদ্দশায় ইনি বেশ মোটা সোটা ছিলেন। মমির গোটা শরীরে লাগানো ছিল মোম আর বিটুমেনের মিশ্রন। গ্রেনভিল ভেবেছিলেন এই দিয়েই সংরক্ষন করা হয়েছিল এই মহিলাকে। কালকেই তোমাদের বলেছিলাম যে মমি তৈরির সময়ে মৃতদেহের পেটের বাঁদিকে লম্বালম্বি চিরে পেটের মধ্যের অংশ গুলো বার করে নেওয়া হত। তবে একটু গরীব ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটা ছিল অন্যরকম। তাদের পায়ুদ্বার দিয়ে অ্যাসিড জাতীয় কিছু একটা ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তাতে পেটের নাড়ি ভুড়ি গুলো গলে গিয়ে পায়ুদ্বার দিয়েই বেরিয়ে আসত। ডঃ গ্রেনভিলের এই মমিও ছিল অনেকটা সেরকম। এনার পেটের ওপরে কোনো কাটা দাগ ছিল না। কিন্তু গ্রেনভিল মমির দেহের ডিসেকশন আরম্ভ করার পরে পেটের মধ্যেকার নাড়ি, লিভার, কিডনি প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। হয়ত এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হলেও সেটা ভাল কাজ করেনি।

যাই হোক, কোমরের হাড় দেখে গ্রেনভিল মৃতের বয়সটা আন্দাজ করেছিলেন ৫০-৫৫র কাছাকাছি। আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই মহিলার মৃত্যুর কারণটাও বলে দিয়েছিলেন।

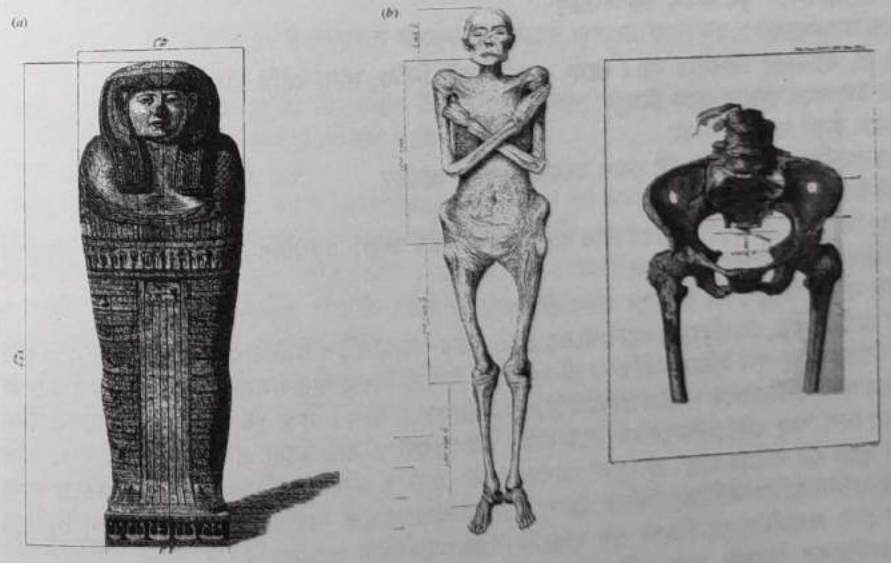

মমির কোমরের হাড়ের স্কেচ

পিজি এবারে টুল থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল,
- কী ভাবে! অত হাজার বছরের পুরনো মমি থেকে মৃত্যুর কারণ বলে দেওয়া গেল। তখন কি মেডিক্যাল সায়েন্স থোড়াই এত অ্যাডভান্স ছিল নাকি?
- না তা ছিল না, তবে মমির ওভারিতে একটা টিউমার পাওয়া যায়। তাই গ্রেনভিল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ওই টিউমারই এর মৃত্যুর কারণ। অটোপ্সির রেজাল্ট বেশ যত্ন করে পাবলিশ করেছিলেন। তাতে ওর নিজের হাতে করা মমিটির কিছু স্কেচও ছিল। এই ঘটনার পরেই গ্রেনভিল বিখ্যাত হয়ে যান।
এতটাই যে একসময় রয়াল ইন্সটিউশনে এই মমিটিকে নিয়ে গিয়ে লেকচার দেন। সেদিন সেই লেকচার থিয়েটারের আলো জ্বালানো হয়েছিল মমির শরীর আর কাঠের কফিন থেকে পাওয়া সেই মোমগুলো পুড়িয়েই।
- বাবারে, এতো একদম সিনেমার মতো গল্প!
- ইতিহাস জিনিসটাই তো সিনেমার মত প্রদীপ্ত ভাই, রোমাঞ্চে ভরা। তোমাকে শুধু তাকে খুঁজে নিতে হবে।
এবারে আমি বললাম,
- তাহলে গ্রেনভিলের সেই মমি এখন কোথায় আছে?
- ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। তবে গ্রেনভিল সাহেব কিন্তু ভুল ছিলেন। ওই মহিলার মৃত্যু কিন্তু আসলে ওভারিয়ান ক্যান্সারে হয়নি। হয়েছিল অন্য একটা রোগে।
- কীসে?
- আমাদের দেশে খুব কমন, কি বলত?
- লাঙ ক্যানসার?
- না না, ক্যানসার ট্যানসার নয়। ওকে, একটা হিন্ট দিচ্ছি, দাদা আমি বাঁচতে চাই!
পিজি টপ করে প্রশ্নটা লুফে নিল,
- 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা!
- একদম ঠিক, তা নীতার কী রোগ হয়েছিল জানা আছে?
- টিউবারকুলোসিস!
- বাহ, সিনেমার ব্যাপারে কিন্তু তোমার জবাব নেই পিজি ভাই। এই টিবি রোগেই অক্কা পেয়েছিলেন আমাদের এই মামিফায়েড মহিলাটি।
- তাই নাকি! কিন্তু সেটা কীভাবে জানা গেল?
- সে আরেক গল্প, গ্রেনভিলের আবিষ্কারের ১৩০ বছর পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের স্টোররুমে একটা বড় কাঠের বাক্স পান ইজিপ্টোলজিস্ট জন টেলর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়তে মিউজিয়ামের অনেক কালেকশনই স্টোররুমে সরিয়ে রাখা হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তার মধ্যের বেশ কিছু ওই স্টোররুমেই রয়ে যায়। ওই বাক্সটাও তার মধ্যে একটা। বাক্সটা খুলে তার মধ্যে দুটো ট্রে পাওয়া যায়। যেগুলো আবার ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা, তাতে গুছিয়ে রাখা আছে একটা মমির শরীরের বিভিন্ন অংশ গুলো। আর বাক্সর নাম্বারের সাথে ক্যাটালগ মিলিয়ে দেখা গেল অগাস্টাস গ্রেনভিলই ওই বাক্স মিউজিয়ামকে দান করেন।
- গ্রেনভিলের ডিসেক্ট করা মমি আবার সামনে এল তাহলে?!
- হ্যাঁ, কিন্তু সেটাও বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল আরো তিরিশ বছর। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি

ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন সেই মমির টুকরো গুলোকে নিয়ে আবার রিসার্চ শুরু করে। গ্রেনভিল সাহেবের সময় থেকে বিজ্ঞান তো অনেক এগিয়ে এসেছে, তাই ওরা মমির ফুসফুস, গল ব্লাডার আর হাড় থেকে টিউবারকুলোসিসের জীবাণুর অংশ পায়। আড়াই হাজার বছর আগে তো টিবির কোন ওষুধ ছিল না। তাই ইনি টিবিতেই মারা যান।
- আপনি বললেন কী করে আড়াই হাজার বছর আগে এই মমি তৈরি হয়েছিল? মমির গায়ে তো আর লেখা ছিল না।
- না তা ছিল না, তবে মমির শরীরের রেডিওকার্বন ডেটিং থেকে বোঝা গেছে যে এটা যীশুর জন্মের ছয়শো বছর আগের।
পিজি এবারে আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল,
- কী বোকার মতো একটা প্রশ্ন করলি, কার্বন ডেটিং তো এখন আকছার হয়। আমি জানতামই ওই করেই মমি কত পুরনো সেটা বার করেছে। কিন্তু ভবেশদা একটা কথা বলুন। ওভারির টিউমারেই যে সেই মহিলা মারা যাননি সেটা কি করে প্রমাণ হল?
ভবেশদা এবারে একটু হেসে বলল,
- নাহ, তোমাকে যতটা ছ্যাবলা ভেবে ছিলাম ততটাও নও তুমি। ভাল প্রশ্ন করলে, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনের প্যাথলজিস্ট এডি ট্যাপ ওই ওভারি, ইউটেরাস আর ফ্যালোপিয়ান টিউব পরীক্ষা করেছেন। তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে টিউমারে ক্যান্সার নেই।
- বিনাইন টিউমার?
- ঠিক, বিনাইন টিউমার। তোমরা ডাক্তারির ছাত্র, তোমরাই জানবে এর মানে কি।
আমি এবারে বললাম,
- সে জানি, মানে ওই টিউমার সাধারণ মানের, ও থেকে কখনো ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব খুব কম।
- হ্যাঁ, সুতরাং ইরতেরসেনুকে মেরেছিল টিউবারকুলোসিস, হাজার হাজার বছরের পুরনো যে ব্যাকটেরিয়া আজও আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
- ইরতেরসেনু? সে আবার কে?
- ওহ,এটা তো বলা হয়নি। ওটাই ভদ্রমহিলার নাম, মমির কফিনের গায়ে লেখা ছিল। গ্রেনভিলের সময় তো হায়রোগ্লিফসের মানে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তাই কী লেখা আছে কেউ বুঝতে পারেনি। এখন বোঝা গেছে নামটা। এই নামের গোদা ইংরাজী মানে করলে দাঁড়ায় 'লেডি অফ দ্য হাউস'। মানে কারো বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী বলতে পারো।
পিজি চোখ বড় বড় করে এবারে বলল,
- বেশ ডিটেকটিভ গল্পের মতো কিন্তু ব্যাপারটা তাই না!
- সেতো বটেই, মৃতের মৃত্যুর কারণ বার করা, তোমাদের ফরেন্সিক মেডিসিনের মতোই তো। মমি থেকে আরও যা সব তথ্য পাওয়া গেছে তা জানলে চোখ কপালে উঠে যাবে!
- তাই নাকি! সব ওই অটোপ্সি করে?
- না না, এখন আর অটোপ্সির দরকারই পড়ে না। এই তো বছর চারেক আগেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই দারুণ একটা কাজ করা হল।
- কীরকম?
- কায়রোর মিউজিয়ামের পরেই পৃথিবীতে মিশরের মমির সবচেয়ে বড় কালেকশন আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, প্রায় ১২০ খানা মমি আছে ওদের কাছে। তার মধ্যে থেকেই আটখানা মমি বেছে

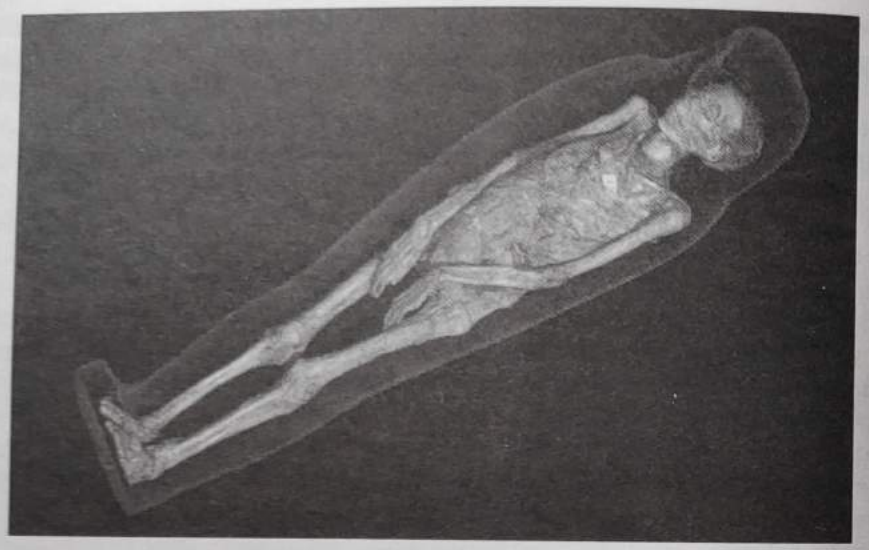

সিটিস্ক্যানিং এর মাধ্যমে বানানো মমির ত্রিমাত্রিক ছবি

নেওয়া হয়, তারপরে তাদের সিটি স্ক্যান করে সেই ইমেজগুলোকে নিয়ে থ্রিডি বা ত্রিমাত্রিক একটা আকার দেওয়া হয়। তাতেই ভিতরে থাকা মমিদের অবয়ব একদম স্পষ্ট বোঝা গেছে। এতটাই স্পষ্ট যে চামড়া, মাথার চুল,নখ সব চেনা যাচ্ছিল। সেই ছবিগুলো পরীক্ষা করেই মানুষগুলোর জীবন যাত্রা, রোগ ভোগ নিয়ে অনেক কিছু আন্দাজ করা গেছে। তার কয়েকটা তোমাদের বলি শোনো। প্রায় প্রতিটা মমিরই দাঁতের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, অনেকের মাড়িতে ঘা বা অ্যাবসেসের দাগও পাওয়া গেছে। খুব কম বয়সেই দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া বা দাঁতের রোগ হওয়ার পিছনে ছিল হাইজিনের ওভাব আর ওদের খাদ্যাভ্যাস। রুটি প্রধান খাদ্য ছিল। সেই রুটি যা থেকে তৈরি হত সেই গম বা ভুট্টার আটার সাথে স্বাভাবিক ভাবেই মিশে থাকত মরুভুমির বালি। আর সেই বালির দানার ঘষা লেগে লেগেই দাঁত ক্ষয়ে যেত। সেই সময়ের লোকেরা আবার হার্টের সমস্যাতেও ভুগত। খাবারের সাথে প্রচুর পরিমানে রেড মিট খাওয়ার জন্য শরীরে যথারীতি কোলেস্টেরল জমত। কয়েকটা মমির আর্টারিতে তাই জমে থাকা কোলেস্টেরল পাওয়া গেছে।

আমি এবারে বললাম,

- অ্যাদেরোসক্লেরোসিস?

- একদম তাই, তোমাদের ডাক্তারি ভাষায় তো এইটাই রোগটার নাম, এই থেকেই হার্টে রক্ত চলাচলও কমে যায়। যার ফল হার্ট অ্যাটাক। তবে একটা মজার কথা বলি, এরই মধ্যে একটা মমির মাথার খুলির মধ্যে একটুকরো তামাও পাওয়া গেছে, কী করে সেটা ওখানে গেল বলত?

- খুলির মধ্যে তামার টুকরো? ইজিপশিয়ানরা কি ব্রেনের অপারেশন করতেও জানত নাকি!

- ধুস, সেরকম কিছু নয়। মনে করে দেখ, মমি বানাবার সময়ের একটা স্টেপ বলেছিলাম।

এবারে আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল,

- বুঝেছি বুঝেছি, মৃতের নাকের মধ্যে দিয়ে তামার শিক ঢুকিয়ে ঘিলু বার করে নেওয়া হত তো! তখনই নির্ঘাত একটা টুকরো ভেঙে ভিতরে রয়ে গেছিল।

ভবেশদা এবারে আমার পিঠ চাপড়ে বলল,

- ওয়েলডান স্পন্দন ভাই! এই তো তুমিও এখন ডিটেকটিভ হয়ে গেছ! একদম ঠিকই বলেছ। বেচারা লোকটা ওই তামার টুকরো নিয়েই কাটাচ্ছে এখনও। আরেকটা দারুণ খবর বলি, ২০১৫ তে ব্রিটিশ মিউজিয়ামই একটা আস্ত কুমীরের মমির সিটিস্ক্যান করেছিল।

- বলেন কী! কুমীরের মমি!!

- হ্যাঁ, অস্বাভাবিক কিছু নয়তো, কুমীরকে মিশরীয়রা দেবতার মতো পুজো করত। এই দেবতার নাম সোবেক। ইজিপ্টের আসওয়ান শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কোম ওম্বো নামের একটা মন্দির আছে। সেই মন্দির কুমীর দেবতা সোবেকের নামেই। সেখানে ৩০০ খানা মমি বানানো কুমীর আছে! সেখান থেকেই একটা মমি আসে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সেটাকেই ওরা স্ক্যান করে।

পিজি এবারে মুখ বাঁকিয়ে বলল,

- এরা দেখছি যা পাচ্ছে তাকেই স্ক্যানারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কোনদিন শুনব বিড়াল কুকুরের মমিও স্ক্যান করেছে।

- সেটাও করেছে ভায়া। তবে তুমি শুধু কুমীরেরটা শোন, এই চার মিটার লম্বা কুমীরের মমিটা স্ক্যান করে এতো ভাল ইমেজ পাওয়া গেছে যে কুমীরটার শেষ খাদ্য হিসাবে একটা গরুর হাড়ও পাওয়া গেছে পাকস্থলীতে! আর ওটার পিঠের সাথে লাগানো ছিল ২৫খানা ছোট ছোট কুমীরের বাচ্চা!

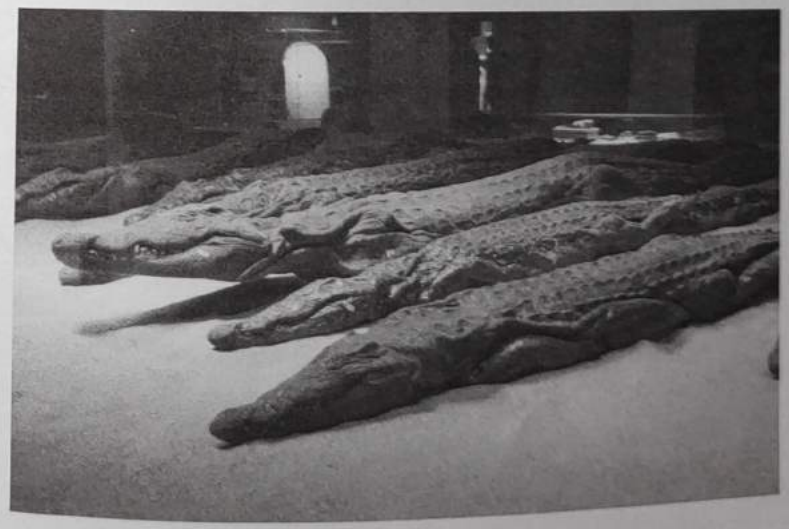

কোম ওম্বোর মন্দিরের কুমীরের মমি

- আরিব্বাস! যত শুনছি তত অবাক হচ্ছি সত্যি।
- ইজিপ্টের ইতিহাস অবাক করার মতোই, এ তো কিছুই নয়, আরো কত কত গল্প আছে...
এবারে ভবেশদার কথার মাঝেই পিজি বলল,
- একটা কথা আমি আগের দিন থেকে ভেবে যাচ্ছি ভবেশদা। সেটা বলি এবারে, নাহলে আজকেও জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাব।
- বলে ফেল ভাইটু।
- মমি বলতেই মাথায় এসেছিল, কাকাবাবুর মিশর রহস্যতে পড়েছিলাম গিজার পিরামিডের কাছে থাকা রানী হেতেফেরিসের সমাধির কথা। যেখানে কিনা হেতেফেরিসের মমি গায়েব হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল। এটা কি সত্যি?
ভবেশদা এবারে স্বভাবসুলভ সব জানি টাইপের হাসিটা দিয়ে বলল,
- না, আংশিক সত্যি। বইটাতে এক জায়গায় হেতেফেরিসের নামের বানানও ভুল আছে। গিজার পিরামিড নিয়েও তো তোমাদের কিছু বলা হয়নি। শুনবে নাকি সে গল্প?
- শুনবো না মানে! আলবাত শুনব!
- ওকে, তাহলে সামনের শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় দিলখুশা কেবিনে দেখা হচ্ছে। ফিস কবিরাজী খেতে খেতে কথা হবে'খন।
বলা বাহুল্য, কবিরাজীটা আমাদেরকেই খাওয়াতে হবে। তবে এই নৈবেদ্য-তে যে প্রসাদ পাওয়া যাবে তার স্বাদ যে কী সে আমরা বুঝে গেছি এতদিনে!

৫

গ্রেট পিরামিড

- সালটা ১৮৬৭, গা পুড়ে যাওয়া গরমের মধ্যেই বছর বত্রিশের এক আমেরিকান নিউজ রিপোর্টার কায়রোর পাঁচ মাইল পশ্চিমে মরুভূমির দিকে চলেছেন। একটা ছোট ডিঙিতে করে নীলনদ পার হতে হল, বাকিটা পথ বালির মধ্যেই পায়ে হেঁটে। দিগন্তে যে তিনটে দানবকে দেখা যাচ্ছিল তাদের সবচেয়ে বড়টার কাছাকাছি আসতেই সে দেখল দিগন্তটাই কেমন হারিয়ে গেল হঠাৎ করে। ওর সামনে দাঁড়ানো পাথরের তৈরি আশ্চর্যটার মাথা যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। সাংবাদিক এবারে সেই পাথর বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সাড়ে চারশো ফিটের চুড়োটায় যখন পা রাখলেন তখন চারপাশটা দেখে যেন তাক লেগে গেল। পৃথিবীটা এত ওপর থেকে কখনো দেখা হয়নি তো আগে! একদিকে হলুদ বালির সমুদ্র বিছিয়ে রয়েছে। তার যেন কোনও শেষ নেই। অন্যদিকটা আবার সবুজ, মাঝখান দিয়ে সরু সুতোর মতো নীল নদ বয়ে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রামগুলোও দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে দূরে পাঁচিলের মতো পাম গাছের সারি।
সাংবাদিকের ছোটবেলাকার একটা স্বপ্ন সত্যি হল। খুফুর পিরামিডে চড়ার স্বপ্ন।
আমরা দুজন এতক্ষণ হাঁ করে ভবেশদার কথা শুনছিলাম। দিলখুশাতে আজকে ভীড় কম ছিল, সপ্তাহের মাঝখানে তো। আমরা ভিতরের দিকের একটা টেবিলে বসেছিলাম, তাই এম.জি রোডের বাস ট্যাক্সির আওয়াজও একটু কম আসছিল। গল্প শোনার একদম আদর্শ পরিবেশ যাকে বলে। তবে রেস্ট্যুরেন্টটার দেওয়ালে বিশ্রী গোলাপী রঙ করেছে, সেটা বড্ড চোখে লাগছিল প্রথমে। কিন্তু ভবেশদা মুখ খোলার পরেই সেসব কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়ে চারপাশে ইজিপ্টের মরুভূমি চলে এল। খাবার দিতে মনে হয় এখনো একটু দেরী আছে। ভবেশদা গ্লাসের জলে একটু চুমুক দিয়ে এবারে বলল,
- বলো তো দেখি এই লোকটার নাম কী? যে কিনা তরতর করে খুফুর পিরামিডে উঠে গেল।
- আমেরিকান সাংবাদিক, ১৮৬৭.. এভাবে হয় নাকি? আপনি আরো কিছু হিন্ট দিন।
- ওকে, ইনি ১৮৯৬ কোলকাতায় এসেছেন, ময়দানে হেঁটেছেন। যে হোটেলে ছিলেন তাকে বলেছিলেন জুয়েল অফ দা ইস্ট! এখন সেটার নাম ললিত গ্রেট ইস্টার্ন।
আমাদের বোকার মতো মুখ দেখে ভবেশদা একটু বিরক্তই হল এবারে,
- নিজের শহরটাই ভাল করে চেনো না। এদিকে এসেছ ইজিপ্টের গল্প শুনতে। যাক গে, টম সইয়ার, হাকলবেরী ফিনের নাম শুনেছ নিশ্চয়?
এবারের শব্দগুলো কমন পড়েছিল। পিজি বিজয়ীর মতো হাসতে হাসতে বলল,
- বুঝেছি কার কথা বলছেন, মার্ক টোয়েন যে কোলকাতাতে এসেছিলেন সেটাই জানতাম না।

টোয়েনেরও তাহলে ইজিপ্টের নেশা ছিল?!
- শুধু টোয়েন নয় ভায়া। গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বের তাবড় তাবড় লোককে এই দেশটা টেনে এনেছে। তার অনেকটাই ওই পিরামিডের জন্য।
- দি গ্রেট পিরামিড!
- শুধু সেটা নয়। দেশটা জুড়ে নব্বইয়ের ওপরে পিরামিড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে তাদের মধ্যে সেরা হল গিজার তিনটে পিরামিড। যেগুলোকে আমরা ছোটবেলায় হিস্ট্রির বইতে দেখেছি। ইজিপ্টের প্রথম পিরামিডের কথা তো আগেই বলেছি তোমাদের।
- হ্যাঁ, সাকারার স্টেপ পিরামিড।
- ঠিক তবে গিজার পিরামিডগুলো সেটার থেকে অনেক বড়। প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা। এই পিরামিড বানানোর গল্পটাও কিন্তু দারুণ বুঝলে।
ব্যস, আবার এক মুহূর্তের মধ্যে আমরা চলে এলাম ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে। ভবেশদা বলতে লাগল,
-আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগের কথা, গিজার মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এক বাইশ বছরের যুবক। ওঁর নজর চারপাশের চুনাপাথরের পাহাড়গুলোতে। ফারাও খুফু এখন মিশরের অধিপতি। এত কম বয়সেই তাঁর অধীনে উত্তর আর দক্ষিণ মিশর এক হয়েছে। যে কাজটা ওর বাবা নেফ্রু শুরু করেছিলেন সেটা খুফু শেষ করতে পেরেছেন। দেশ জুড়ে শান্তি এখন। খুফু অমর হতে চান, হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফারাওরা ঈশ্বর 'রা' এর প্রতিনিধি। মারা যাওয়ার পরে তাদের অমর হয়ে থাকাই দস্তুর। তাই জন্যই মমি বানানো হয়, পিরামিড বানানো হয়। ওর বাবা নেফ্রুও তো দুটো পিরামিড বানিয়েছিলেন নিজের জন্য। একটা মেইদাম নামের এক জায়গায়। কিন্তু সেটাকে ঠিক পিরামিড বলা যায় না। অঙ্কের হিসাবের গন্ডগোলের জন্য সেই পিরামিডের পেটের কাছ থেকে অনেকটা বেঁকে আসতে হয়েছিল। পরে অবশ্য দাশুর নামের আরেকটা জায়গাতে নেফ্রু আরেকটা পিরামিড বানান। সেটা নিখুঁত। সূর্য ডোবার সময় সেই পিরামিডের গায়ের পাথরগুলো লাল লাগে। এমনটা আর একটাও নেই ইজিপ্টে। তবে খুফুর স্বপ্ন আরো বেশি কিছুর।
খুফুর নিজের একটা পিরামিড হবে। যেটা হবে আগের বানানো যে কোনও পিরামিডের থেকে অনেক অনেক বড়। এমন কিছু একটা যেটা আগে এই দেশের কেউ দেখেনি। পরেও কেউ বানাতে পারবে না। সেই পিরামিড বানানোর জন্যই খুফু গিজার এই জায়গাটা বেছে নিয়েছেন। কারণ দুটো। এক, হাতের কাছেই থাকা চুনাপাথরের খনি। যেখান থেকে পিরামিড বানানোর জন্য পাথর খুব সহজেই পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয়ত এই জায়গাটা বেশ উঁচুও, তাই অনেক দূর থেকে দেখতেও পাওয়া যাবে পিরামিডটা। কিন্তু মুশকিল একটাই, রাজধানী মেমফিস থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে এই গিজা। রাজার সমাধি রাজধানী থেকে এত দূরে হলে চলে নাকি? কী করা যায়? দুটোকে কাছাকাছি আনা তো অসম্ভব। তবে ওদের দূরত্বটা এক ভাবে কমিয়ে ফেলাই যায়। মেমফিস শহর নীল নদের গায়েই। সেই নীল নদ থেকেই একেবারে গিজা অবধি লম্বা খাল তৈরি করে ফেললেন খুফু। দুটো জায়গার মধ্যে যাতায়াত করার খুব সুবিধা হয়ে গেল এতে। প্রতিবছর নীলনদের বন্যার জন্য সেই খালে জলের অভাবও হল না। খুফু গিজার মরুভূমিতেই নিজের আরেকটা রাজপ্রাসাদও বানিয়ে ফেললেন। পিরামিড তৈরি তো আর একদিনের কাজ নয়। তিরিশ বছর ধরে একটু একটু করে তৈরি হয়েছিল গ্রেট পিরামিড! খুফু এই পিরামিড বানানোর কাজটা দিয়েছিলেন..
-দুটো ফিশ কবিরাজি, একটা চিকেন কাটলেট। চা আসছে।

টেবিলের ওপরে ঠকাস ঠকাস করে প্লেট গুলো রাখতে রাখতে বলল ওয়েটার। এমনভাবে রসভঙ্গের জন্য একেবারে দুর্বাশা মুনির মতো তাকালাম ওর দিকে। কিন্তু তাকানোই সার। প্লেট গুলো নামিয়ে রেখেই লোকটা অন্য টেবিলে চলে গেল। পিজি ফিশ কবিরাজি খায় না। ওর নাকি সব মাছেই আঁশটে গন্ধ লাগে। তাই ওর জন্য কাটলেটটা নেওয়া। ভবেশদার মুখটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখলাম। কবিরাজির গায়ে লেগে থাকা ঝুরি গুলো তুলে একটু কাসুন্দি আর একটু টমেটো সসে চুবিয়ে মুখে পুরে দিল। দিয়েই গাইতে আরম্ভ করল,
"হোঁঠো সে ছুঁলো তুম.."
রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হচ্ছে দেখে আমাকে মুখ খুলতেই হল এবারে,
- ভবেশদা।
- উম্মম্ম...
- বলছি খুফু পিরামিডটা বানাতে দিলেন..
- ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাল খাবার মুখে পড়লেই না আমার কেমন গজল এসে যায়। স্যরি স্যরি। তা যেটা বলছিলাম, খুফু কাজটা দিলেন নিজেরই এক আত্মীয় হেমিউনুকে। তার দায়িত্বেই তৈরি হল গ্রেট পিরামিড। ১৩ একর জায়গা নিয়ে। এক একটা দিক ২৩০ মিটার লম্বা। উচ্চতায় প্রায় দেড়শো মিটার। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির থেকেও উঁচু। ভল্যুমের দিক থেকে বলতে গেলে কুড়ি খানা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঢুকে যাবে ওর মধ্যে।
- বলেন কি! এতো বড় যে সেটা ছবি দেখে বুঝিনি।
- হ্যাঁ, বললাম না, প্রাচীন পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্যের একটা হল গ্রেট পিরামিড। এত পুরনো একটা জিনিস আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আরবিতে একটা প্রবাদ আছে জানো? মানুষ সময়কে ভয় পায়, আর সময় ভয় পায় পিরামিডকে। এখন একে যে অবস্থায় দেখো তার চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল কয়েকহাজার বছর আগেও। গোটা পিরামিডটার গা মোড়ানো ছিল ঝকঝকে সাদা পাথর দিয়ে। সেই পাথর এসেছিল গিজার দক্ষিণ পুর্বের তুরা নামের একটা জায়গার খনি থেকে। নীল নদ দিয়ে নৌকায় করে আনা হয়েছিল সেই পাথর। সূর্যের আলো পড়লে ঝিকমিকিয়ে উঠত পিরামিডটা সেই সময়। কিন্তু পরের দুহাজার বছর ধরে মানুষ ওই সাদা পাথর খুলে নিয়ে গেছে নিজেদের ঘর বাড়ি বানানোর জন্য। গোটা ইজিপ্ট জুড়ে অনেক পুরনো বাড়ি আর প্রাসাদে আজও সেই সাদা পাথর পাওয়া যায়।

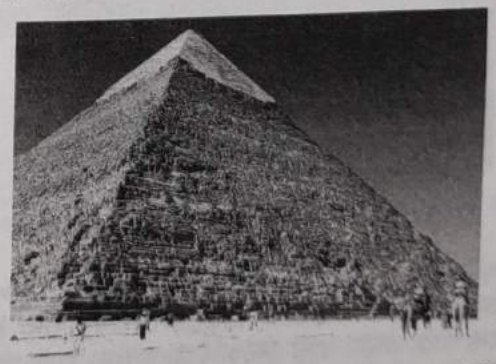

পিরামিডের মাথায় তুরা পাথরের আস্তরণ, এখন যেটুকু অবশিষ্ট আছে

পিজি এতক্ষণ চুপচাপ কাটলেট খাচ্ছিল। এবারে মুখ খুলল ও,
- পিরামিডের ভিতরে কি ছিল ভবেশদা! অনেক ঐশ্বর্য থাকার কথা তো!
- তা হয়ত ছিল পিজি ভায়া। কিন্তু সেসবের কিছুই পাওয়া যায়নি। পিরামিড বানানোর হাজার বছরের মধ্যেই ডাকাতরা ওর মধ্যে ঢুকে সব লুট করে নেয়। কিন্তু বুদ্ধি করে পিরামিডে ঢোকার রাস্তাটাও এমন ভাবে বন্ধ করে দেয় যাতে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা না যায়। তারপরে মানুষ পিরামিডে ঢোকে আরো দুহাজার বছর পরে। সেই লোকটার নাম আল মামুন।
- আরে! কাকাবাবুর মিশর রহস্যতে একজন ইজিপশিয়ান বিজনেসম্যানের নাম ছিল তো আল মামুন!
- হ্যাঁ, কিন্তু এই আল মামুন যে-সে লোক নয়। বাগদাদের রাজা, যদিও ওদের ঠিক রাজা বলা হত না। রুলারদের বলত কালিফ। তো এই আল মামুন ঠিক করে পিরামিডের ভিতরে ঢুকবে। কিন্তু চারিদিকে ঘুরেও কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন গরম ভিনিগার ঢেলে পিরামিডের পাথরে ফাটল ধরানোর চেষ্টা চলল। তাতে কাজ না হওয়ায় শেষে হাতুড়ির দ্বারস্থই হতে হয় মামুনকে। পিরামিডের গায়ে পাথর ভেঙে গর্ত করে সেইখান থেকে ভিতরের দিকে টানেল বানানো

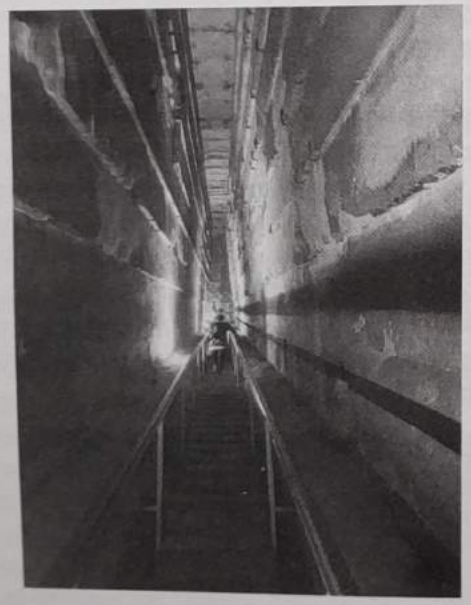

গ্র্যান্ড গ্যালারি

হতে থাকে। তবে মামুন ভাগ্যবান ছিলেন। কিছুদুর অবধি টানেল কাটার পরেই শ্রমিকরা একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গে এসে পড়ে, যেটা ওপর দিকে উঠে গেছে। সেই পথ একটু ওপরে গিয়েই অনেকটা চওড়া হয়ে যায়। এখন সেই পথকে বলে গ্র্যান্ড গ্যালারি। এই পথ শেষ হয় একটা খুব

নিচু ছাদের ছোট ঘরে, এখন যাকে বলা হয় কুইন'স চেম্বার। এই ঘরের একটা দেওয়াল দিয়ে আবার সুড়ঙ্গ কেটে মামুন এসে পড়েন একটা বিশাল বড় ঘরে। যার সিলিং অনেক উঁচুতে। ঘরের দেওয়াল গুলোও বাকি পিরামিডের পাথরের থেকে আলাদা,লাল রঙের। পরে জানা গেছে এই পাথর এসেছিল কায়রো থেকে সাড়ে আটশো কিলোমিটার দূরে থাকা আসওয়ান শহরের খনি থেকে! নীল নদের পথে।
মামুন একটু হতাশই হন এই ঘরে ঢুকে। একদম ফাঁকা। শুধু পশ্চিম দিকে একটা পাথরের সারকোফেগাস রয়েছে। মামুন সেই সারকোফেগাস খোলেন। পিরামিড থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মামুন ঘোষনা করে দেন যে তিনি সারকোফেগাসের মধ্যে একটা মমি পেয়েছেন যার সারা শরীর সোনা দিয়ে মোড়ানো, হাতে তলোয়ার আর বুকের ওপরে একটা বড় রুবি পাথর বসানো। খুব সম্ভবত নিজের নাম ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আল মামুন ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। ঐখানে কিছু পাওয়ার কথাই নয়। কারণ পিরামিড তো তার আগেই ডাকাতরা ফাঁকা করে দিয়েছে। তবে ওই সারকোফেগাসটা খুব সম্ভবত খুফুরই ছিল। আর ওই ঘরকে এখন বলে কিং'স চেম্বার।

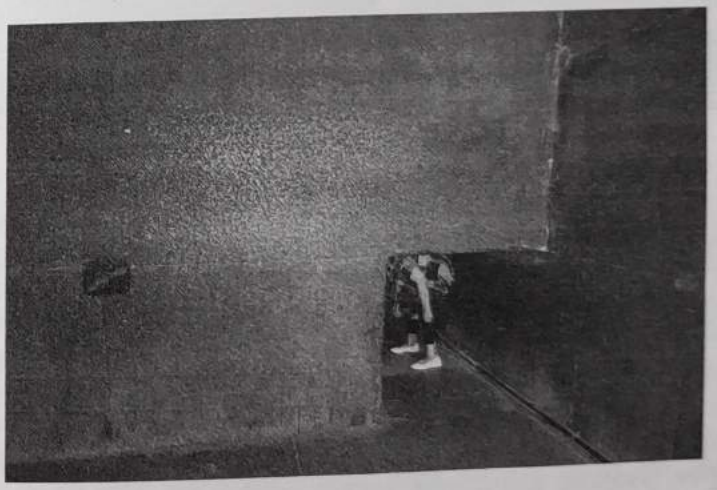

কিংস চেম্বারে ঢোকার রাস্তা

আমি এবারে বললাম,
- ও আচ্ছা বুঝেছি। তাহলে আগে যে কুইন'স চেম্বারের কথা বললেন ওখানে খুফুর স্ত্রীয়ের মমি ছিল এক সময়ে?
- একদমই ভুল ধারণা। খুফুর পিরামিডের ওর স্ত্রীয়ের কোন মমিই ছিল না। ওই ঘরটা কিং'স চেম্বারের থেকে একটু ছোট হওয়ায় নাম কুইন'স চেম্বার। হয়ত একসময় ওই ঘরে কোন ঐশ্বর্য সত্যিই ছিল। ওই ঘরে এখন আর যাওয়া যায় না। কিং'স চেম্বারে কিন্তু এখন ট্যুরিস্টরাও ঢুকতে পারে। আল মামুনের বানানো পথটাই এখনো ব্যবহৃত হয় কিং'স চেম্বারে পৌঁছনোর জন্য।

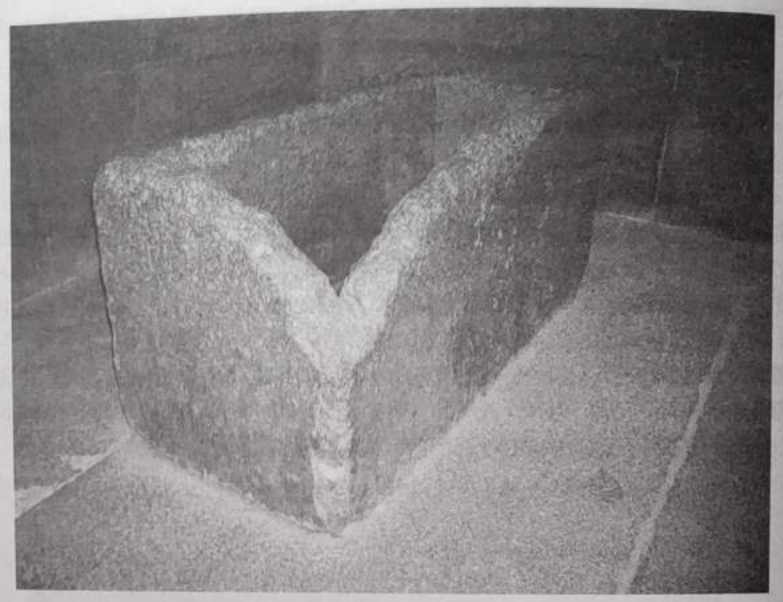

খুফুর ফাঁকা সারকোফেগাস

- আরিব্বাস! তাহলে খুফুর সারকোফেগাসটাও এখনও আছে!
- আছে তো। এক রকম ভাবে আছে ফাঁকা সারকোফেগাসটা।
- আচ্ছা, তাহলে দুটো ঘর পিরামিডের মধ্যে।
- না, দুটো নয়, সব মিলিয়ে আটটা। সতেরশো শতাব্দীতে ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্টরা বাকিগুলো আবিষ্কার করে। কিং'স আর কুইনস চেম্বার ছাড়াও কিং'স চেম্বারের গায়ে রয়েছে একটা ছোট অ্যান্টিচেম্বার। আর কিং'স চেম্বারের সিলিংয়ের ওপরে রয়েছে চারটে ফাঁকা ঘর। খুব সম্ভবত যাতে পাথরের ভারে কিং'স চেম্বারের সিলিং না ভেঙে পড়ে তাই এই ঘরগুলো বানানো হয়েছিল। কিং আর কুইন্স চেম্বারটাকে জুড়েছে গ্র্যান্ড গ্যালারি। সেখান থেকে আরেকটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে পিরামিডের গা অব্দি। যেটার একটা অংশ আল মামুন খুঁজে পেয়েছিল। কুইনস চেম্বার থেকে আবার একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে মাটির নিচের আরেকটা ঘরে। দুঃখের কথা সেটাও একদম ফাঁকা অবস্থাতে পাওয়া যায়। অবাক করার ব্যাপার হল এই যে কিং'স আর কুইনস চেম্বার থেকে আরো চারটে সুড়ঙ্গ চলে গেছে বাইরের দিকে। কিন্তু তার সব কটাই অদ্ভুত ভাবে পিরামিডের গা অব্দি পৌঁছনোর আগেই শেষ হয়ে গেছে। কেন এগুলো বানানো হয়েছিল সেটা কেউ জানে না। আবার খুফুর পিরামিডের সাথে কিন্তু ক্রিকেট খেলার একটা ক্ষীণ লিঙ্ক আছে।
- তাই নাকি! সেটা কিভাবে?
- কিং'স চেম্বারের ওপরে যে চারটে ফাঁকা ঘর ছিল সেগুলো আবিষ্কার করেছিলেন হাওয়ার্ড ভ্যাস নামের এক আর্কিওলজিস্ট। তিনি এই ঘরগুলোর নাম বিখ্যাত ব্রিটিশদের নামে রাখেন। তাদের মধ্যে একটা ঘরের নাম রাখা হয় অ্যাডমিরাল নেলসনের নামে। এঁকে নিশ্চয়ই চেনো?

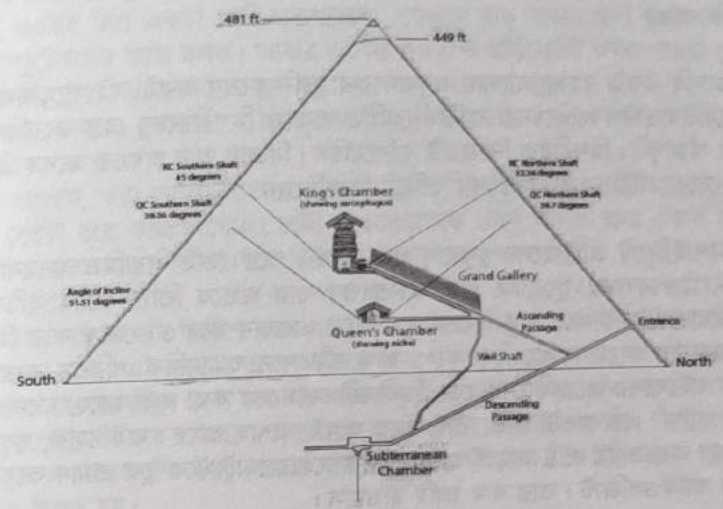

পিরামিডের ভিতরের নকশা

- চিনি মানে নাম শুনেছি, ক্রিকেটে ১১১ কে তো নেলসন'স নাম্বার বলে।
- ঠিক, হোরাশিও নেলসন ছিলেন ব্রিটিশ নেভির ফ্ল্যাগ অফিসার। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের বিখ্যাত যুদ্ধে মারা যান। এই অ্যাডমিরাল নেলসনের নাম থেকেই নেলসনস নাম্বার এসেছে। কারণ নাকি নেলসনের একটা চোখ, একটা হাত আর একটা পা ছিল না। তবে এই তথ্য ভুল যদিও, নেলসনের একটা করে চোখ আর হাত না থাকলেও পা দুটোই ছিল। তাই ক্রিকেটে ১১১ কে নেলসনস নাম্বার বলার কোনও যৌক্তিকতাই নেই...এই দেখ, আবার অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। কাজের কথায় ফিরে আসি।

এই পিরামিডকে নিউক্লিয়াস করেই গিজার মরুভূমিতে গড়ে ওঠে একটা বিশাল কবরখানা। খুফুর পিরামিডের পাশেই আরো দুটো বিশাল পিরামিড বানায় ওর ছেলে খাফরে আর নাতি মেনকুরে। পিরামিডের গায়ে তুরার সাদা পাথরের একটা আস্তরণের কথা বললাম না? ওইটা এখন একমাত্র খাফরের পিরামিডের মাথার কাছটাতেই পাওয়া যায়। এই তিনটে পিরামিড ছাড়াও গিজার প্লেটুতে এখন আছে আরো ৮ খানা ছোট পিরামিড আর ১০০০ এর ওপরে কবর। আর আছে বিখ্যাত স্ফিংস!

- স্ফিংস নিয়ে কিছু বলুন না ভবেশদা!
- উফফ, বলেছি না একদিনে একটাই জিনিস হজম করতে। এবারে আমি বরং তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি।

ভবেশদার একটা প্রশ্ন মানেই আরেকটা দারুণ কিছুর খোঁজ পাওয়া। তাই আমি পিজি দুজনেই এবারে প্রায় একসাথে বলে উঠলাম,

-কি?

- এতক্ষণ তো খুফুর পিরামিডের কথা শুনলে। এবারে বলো তো এই দুর্দান্ত জিনিসটা বানানো সম্ভব হল কি করে?
পিজি বলল,
-এটা তো শুনেছি একটা রহস্য, বাংলায় অনুবাদ করা দানিকেনের একটা বই পড়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে গ্রহান্তরের এলিয়েনরা নাকি পিরামিড বানাতে মিশরীয়দের হেল্প করেছিল।
- ধুস, এসব গাঁজাখুরি। মিশরীয়রা নিজেরাই বানিয়েছিল। বিজ্ঞান আর অঙ্কতে অনেক এগিয়ে ছিল ওরা। তবে হেরোডোটাস খুফুকে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছিলেন।
- কীভাবে?!
- হেরোডোটাস ইজিপ্টে এসেছিলেন খুফুর দু'হাজার বছর পরে। তাই পিরামিড বানানোর ব্যাপারে যেটুকু জেনে ছিলেন তার পুরোটাই ছিল জনশ্রুতি। তার ওপরে ভিত্তি করেই ইতিহাস লিখে ফেলেন। হেরোডোটাসের মতে খুফু ছিলেন খুব নিষ্ঠুর একজন ফারাও। জোর করে মিশরীয়দের পিরামিড বানানোর কাজে লাগিয়েছিলেন। ১ লাখ ক্রীতদাস অমানুষিক পরিশ্রম করে পিরামিড বানিয়েছিল। বাইবেলের এক্সোডাসেও তো ইহুদী ক্রীতদাসদের কথা বলা আছে, যাদের ফারাওরা পশুর মতো খাটায়। এর কতটা সত্যি তাই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাই হোক, খুফুর বদনাম ঘুচতে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় আড়াই হাজার বছর। হেরোডোটাসকে ভুল প্রমাণ করেন একজন ইজিপশিয়ান আর্কিওলজিস্ট। তার নাম জাহি হাওয়াস।

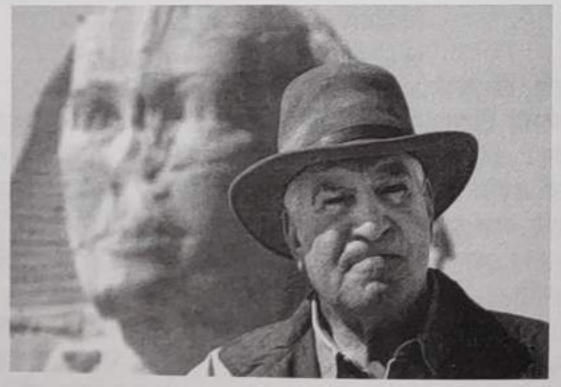

জাহি হাওয়াস

১৯৯০ সালে জাহির দল পিরামিড চত্বরের কাছেই একটা বিশাল কবরখানা আবিষ্কার করে। যেগুলো খুব সাধারণ মানের। কিন্তু কবরখানার মানুষগুলোর পরিচয় থেকেই বোঝা যায় ওদের কাজ। ওরাই পিরামিড বানানোর কাজ করত। ১৯৯৯ তে এই শ্রমিকদের ছোট একটা গ্রামও খুঁজে পাওয়া যায় গিজাতেই। ১ লাখ না, ১০,০০০ মানুষ কাজ করেছিল খুফুর পিরামিড বানানোর জন্য। এবং তাদের প্রত্যেককেই পারিশ্রমিক দেওয়া হত। থাকার জায়গাও ছিল বেশ। শুধু তাই নয়, কায়িক পরিশ্রমের ধকল নিতে পারার জন্য ওদের ডায়েটও ছিল বেশ ভাল। দেশ জুড়ে পশুর মাংস খুব মূল্যবান হলেও ওদের রেশনে সেটা রোজ থাকত। এমন কি স্বাস্থ্যের খেয়ালও খুব

ভাল ভাবে রাখা হত। অত ভারী ভারী পাথর বইবার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই কাছেই ছিল একটা ছোট হাসপাতাল, যেখানে হাড় ভাঙার জন্য প্লাস্টার করা বা ছোট খাটো অ্যাম্পুটেশনের কাজ চলত। আবার অনেক হতভাগ্য শ্রমিকেরই কবর পাওয়া গেছে ঘাড় বা মাথা ভাঙা অবস্থায়। তবে তাদের খুব যত্ন করে কবর দেওয়া হয়।
- হুমম, এটা তাহলে বুঝলাম যে নিজেদের ইচ্ছাতেই সবাই কাজ করেছিল। কিন্তু পিরামিডটা বানালো কী করে ওরা?
- আগেই বললাম, ওরা আর্কিটেকচারে তুখোড় ছিল। পিরামিডের নকশাটা আগেই বানিয়ে নিয়ে তারপরে সেইটা ধরে কাজ এগোয়। ভারী পাথরগুলোকে টেনে আনার জন্য রাস্তার বালিকে জলে ভিজিয়ে দিত ওরা। এতে পাথর টানা অনেক সহজ হয়ে যেত। অর্ধেক মানুষ লাগত একটা বড় পাথরকে টানতে। তারপরে কাঠের র‍্যাম্পের ওপরে দিয়ে এনে পাথরগুলোকে একের পর এক বসাতো। তবে এই কাজটা তিরিশ বছর ধরে করে যাওয়ার মতো প্ল্যানিং আর ম্যানেজমেন্ট চমকে দেওয়ার মতো। ওহ, এই দেখো, এতক্ষণ ধরে এত খুফু খুফু করে যাচ্ছি, একটা মজার কথা তো বলাই হয়নি। যে লোকটার জন্য এরকম আকাশচুম্বী একটা জিনিস বানানো হল সেই লোকটার মমি যে আগেই নষ্ট হয়ে গেছে ডাকাতদের হাতে সেটা আগেই বলেছি। কিন্তু গোটা ইজিপ্টে খুঁজেও খুফুর একটার বেশি স্ট্যাচু পাওয়া যায়নি। আর সেটা মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা। জ্যামিতি বক্সের স্কেলও ওর দ্বিগুণ হয়।

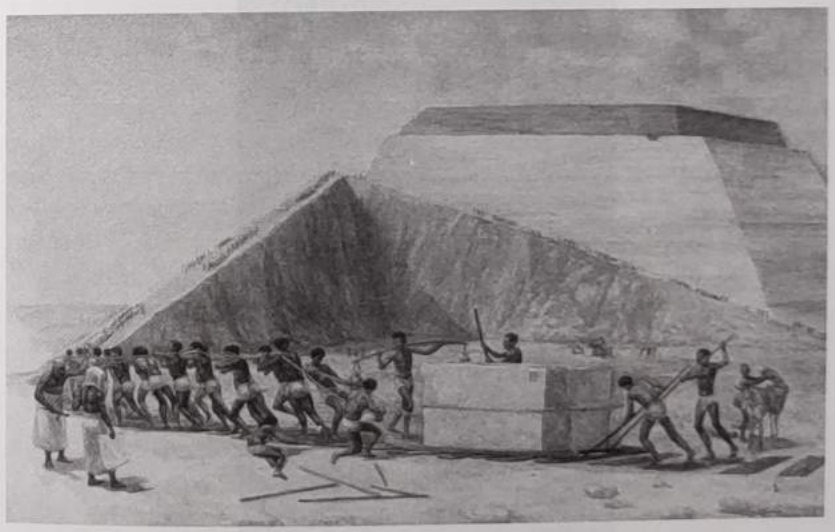

যেভাবে পাথর টেনে নিয়ে যাওয়া হত

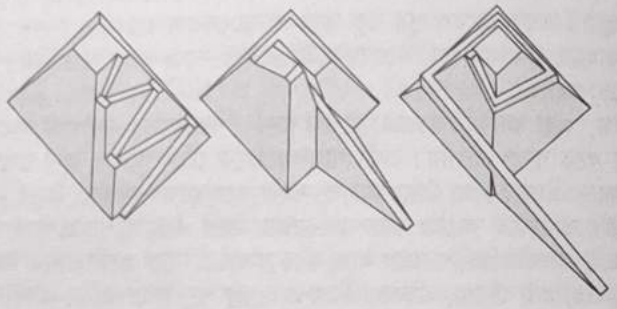

পিরামিড বানানোর জন্য তিন রকমের র‍্যাম্প

খুফুর মূর্তি

আমি এবারে বললাম,
- আচ্ছা খুফুর কথা তো শুনলাম, কিন্তু ওর মায়ের গল্প তো বললেন না?
- হেতেফেরিস?
- হ্যাঁ, আগেরদিন জানতে চাইলাম না? সেই হেতেফেরিসের টুম্বে কোন মমি ছিল না! আবার ফিরেও এল! যেমনটা মিশর রহস্যে বলেছিল।
ভবেশদা এবারে একটু ভ্রুঁ কুঁচকে বলল,
- ও হ্যাঁ, বলেছিলে বটে। সে গল্প বলাই যায়। কিন্তু কবিরাজিটা তো শেষ হয়ে গেল। আজকাল এরা সাইজও ছোট করে দিয়েছে কেমন। কিন্তু টেস্টটা বুঝলে এক...
- এই যে দাদা! এদিকে আরেকটা ফিস কবিরাজি দিতে হবে!
পিজি বুঝে গেছে কি করতে হবে এখন। ভবেশদাকে এই অবস্থায় কিছুতেই ছাড়া যাবে না। হেতেফেরিসের রহস্যটা আজকে জানতেই হবে।

৬

হেতেফেরিসের রহস্য!!

- আজ থেকে ৪৭০০ বছর আগের একটা দিন, মিশরের ফারাও হুনি নিজের প্রাসাদে মাথা নিচু করে বসে আছেন। দেশের মানুষ তাঁকে ভগবানের মতো পুজো করে। হেন কোন পার্থিব সম্পদ নেই যা তার আয়ত্তের বাইরে। তবুও হুনি আজকে নিঃস্ব। যে কোন পিতার সবচেয়ে কষ্টের কাজটা এইমাত্র তাকে করে আসতে হল। কবর দিয়ে এলেন নিজের একমাত্র পুত্রসন্তানকে। হঠাৎ করেই একদম কম বয়সেই ছেলেটা চলে গেল। হুনির সামনে এখন একটা বড় প্রশ্ন, পরের ফারাও কে হবে? কোনও পুরুষকেই তো বসতে হবে মেমফিসের মসনদে। কিন্ত হুনির বাকি সন্তানেরা তো সবাই কন্যা। এদিকে তার চারিদিকে শত্রুরও তো অভাব নেই। শকুনের মতো তাকে তারা ঘিরে রাখবে। ফারাও মারা গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহাসনের জন্য। হুনির বয়স হয়েছে। এই বয়সে নতুন করে আর সন্তানের বাবা হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে উপায়?

এই বলে ভবেশদা একটা ভ্রু ওপরে তুলে আমাদের দিকে চাইল। দু নম্বর কবিরাজীটা এই একটু আগেই দিয়ে গেছে। আমরা আর কিছু অর্ডার করিনি। এমনিতেই বাড়ি থেকে বেশি টাকা পাওয়া যায় না মাসের হাত খরচার জন্য। একদিনে দুটো করে ফিস কবিরাজী সাঁটালে পরের উইকএন্ডে হোস্টেলের ক্যান্টিনের ট্যালট্যালে ডাল ভাত দিয়েই পেট ভরাতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল। ভবেশদাকে অন্তত আরেকটা কবিরাজী দিয়ে আটকে রাখা গেছে।

আমি ভবেশদার প্রশ্নর উত্তরে বললাম,

- হুম, খুব চাপের কেস বটে। তবে হুনি চাইলে নিজের জামাইকেই দেশের রাজা বানাতে পারতেন তো। রাজত্ব আর রাজকন্যা দুটোই পাবে সে তাহলে।

- একদম ঠিক ধরেছ স্পন্দন ভাই। ফারাও হুনি ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। নিজের সবচেয়ে বড় মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এমন একজনের যার বংশ নাম করা হলেও সেই বংশের কেউ কোনদিন আগে ফারাও হননি। হুনির পরে ইনিই ফারাও হন। হঠাৎ করে ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া এই লোকটির নাম ছিল নেফ্রু।

- মানে খুফুর বাবা?

- হ্যাঁ, আর নেফ্রুর স্ত্রী, হুনির বড় মেয়ে যার জন্য নেফ্রুর ফারাও হওয়া সম্ভব হল সে হল রানী হেতেফেরিস। হেতেফেরিস শব্দের মানে হল সেই মেয়েটা যার হাসি মুখ।

পিজি এবারে ফিচ করে হেসে বলল,

- বুঝেছি, হেতেফেরিস বাঙালী হলে নাম হত সুহাসিনী!

- চ্যাংড়ামি শুরু করলে কিন্তু আমি উঠে যাব।

- না না, সরি সরি। আর কিছু বলব না, আপনি বলুন।

পিজি জিভ কেটে চুপ করে বসল।

- যেটা বলছিলাম, আরো অনেক রানী থাকলেও ফারাও নেফ্রু হেতেফেরিসকে সবচেয়ে বেশি

ভালবাসতেন। কারণটা খুব স্বাভাবিক। ওই মেয়েটির জন্যই যে তিনি সম্রাট হতে পেরেছিলেন। আগেই বলেছি নেফ্রুর দুটো পিরামিড ছিল, একটা মেইদামে আরেকটা দাশুর নামের একটা জায়গায়। দাশুরের পিরামিডেই নেফ্রুকে সমাধিস্থ করা হয়। হেতেফেরিসকেও কবর দেওয়া হয় নেফ্রুরই পিরামিডের পাশে।

- বলছেন টা কি? হেতেফেরিসের সমাধি দাশুরে? আমরা তো জানতাম গিজাতে। খুফুর পিরামিডের পাশে।

ভবেশদার কথায় আমি একটু অবাকই হলাম এবারে।

- তুমি যেটা বলছ ঠিক, আবার আমার কথাও ঠিক।

- তার মানে হেতেফেরিসকে দুবার সমাধিস্থ করা হয়?

মুখে সেই ট্রেডমার্ক রহস্যাবৃত হাসিটা এনে ভবেশদা এবারে বলল,- সেটা এখনই বলব না, আগে খুফুর একটা গল্প শোনো।

একদিন খুফুর দরবারে একটা লোক ভয়ে ভয়ে হাজির। খারাপ একটা খবর সে নিয়ে এসেছে, ফারাও জানতে পারলে হয়ত তার জন্য চরম শাস্তিও পেতে হতে পারে একে, কিন্তু খবরটা এমনই যে ফারাওকে জানাতেই হবে।

- কী খবর?

- ডাকাতির।

- কোথায়?

- দাশুরে, খুফুর মায়ের সমাধিতে।

-বলেন কী!

- হুমম, তবে আর বলছি কী। দাশুরের সমাধিক্ষেত্রকে যারা পাহারা দেয়, ইনি তাদের প্রধান। অনেক সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে নাকি রানী হেতেফেরিসের সমাধিতে ডাকাত ঢুকেছিল। তবে খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। সমাধির একটা দেওয়ালই শুধু ভেঙে গেছে। ডাকাতেরা ভিতর থেকে প্রায় কিছুই নিয়ে পালাতেও পারেনি। তবে যেহেতু ওরা একবার সমাধিটার কথা জেনে গেছে তাই ফের কখনও সিঁধ কাটবার চেষ্টা করতেই পারে।

আমি বললাম,

- আচ্ছা এবারে বুঝলাম, তাই জন্যই খুফু ওর মায়ের সমাধিকে দাশুর থেকে সরিয়ে গিজাতে নিজের পিরামিডের কাছে নিয়ে চলে এলেন।

- কারেক্ট!

- কিন্তু ভবেশদা তাহলে তো গিজার সমাধিতে হেতেফেরিসের মমি থাকার কথা। কিন্তু ছিল না কেন?!

- এত অধৈর্য হলে কি চলবে স্পন্দন ভাই? হেতেফেরিসের মমির কথা তো ছেড়েই দাও। সমাধিটাও খুঁজে পাওয়া যেত না যদি না একজন ফোটোগ্রাফারের ট্রাইপড পিছলাতো।

গল্পের মধ্যে আবার একটা নতুন গল্প, আমি আর পিজি এবারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসলাম। ভবেশদা বলে চলল,

- পয়লা নভেম্বর ১৯২৪ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির স্পনসরশিপেতে খুফুর পিরামিডের দক্ষিণ-পূর্বদিকে নতুন এক্সক্যাভেশন শুরু হয়, আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট জর্জ রেসনারের নেতৃত্বে। কিন্তু জানুয়ারির শেষের দিকে রেসনারকে কয়েকমাসের জন্য হার্ভার্ডে ফিরে যেতে হয়। যাওয়ার সময় জর্জ কাজের দায়িত্ব দিয়ে যান সাইট ম্যানেজার অ্যালান রো-কে।

আরেকটা বড় কাজ দেন মিশনের ফোটোগ্রাফার আবদৌকে। আবদৌ-এর কাজ ছিল রোজ কী কী কাজ হচ্ছে তার ডিটেইল ছবি তুলে রাখা। ভোরবেলায় আবদৌ সাইটে চলে আসত ক্যামেরা আর ট্রাইপড কাঁধে, শ্রমিকদের আসার ঘন্টা খানেক আগে, কাজ শুরু হওয়ার আগে একবার ভাল করে ছবি তুলে রাখত। আবার বিকেল বেলায় সেদিনের মত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে নতুন যা যা কিছু পাওয়া গেল সেগুলোর ছবি তুলত। সবমিলিয়ে হাজারের ওপরে ছবি তুলেছিল আবদৌ। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একটা ভোরবেলা। অন্য বাকি দিন গুলোর মতোই আবদৌ আজও পৌঁছে গেছে সাইটে। খুফুর পিরামিডের পূর্বদিকে একটা উঁচু জায়গা দেখে ট্রাইপড বসাতে গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত! খরখরে বালির মধ্যেও ট্রাইপডটা স্লিপ করে গেল! ভাগ্যিস ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা গলা দিয়ে ঝোলানো ছিল! নয়ত ওইটার বারোটা বাজত। আবদৌ এবারে ওই খান থেকে আরেকটু সরে এসে ট্রাইপড বসালো। কিন্তু খেয়াল করল ট্রাইপডটা বালির নিচে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি এখানে বালির নিচে অন্য কিছু আছে? সামান্য একটু বালির আস্তরণ হাত দিয়ে সরাতেই সেই অন্য কিছুটা দেখতে পাওয়া গেল। ঝুরো ঝুরো ময়লা আর সাদা চুনাপাথরের গুঁড়ো! এমনটা তো এখানে থাকার কথা নয়। তাহলে কী....!
তখনই আবদৌ একছুটে ডেকে আনল অ্যালান রোকে। শ্রমিকদের দিয়ে ওপরের বালি পরিষ্কার দেখা গেল একটা আয়তকার গর্তের মুখ। সেখানে জমে থাকা চুনাপাথরের টুকরোগুলোকে সরানোর পরে বেরিয়ে এল বারো ধাপের একটা সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়ির শেষে কিছু নেই।
- যাহ্ তারমানে ধাপ্পা!

- মোটেই তা নয়। সমাধি যাতে কেউ খুঁজে না পায় তাই সমাধির মুখ পাথরের টুকরো দিয়ে এই ভাবেই বুজিয়ে রাখা হত। শ্রমিকরা এবারে নতুন উদ্যমে ভারী ভারী পাথর গুলোকে সরাতে লাগল। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই ন'মিটার গভীর গর্তে পৌঁছনোর পরে একটা মসৃণ পাথর পাওয়া গেল। পাথরের পিছনেই একটা লোকানো কুঠুরি। যেখানে রাখা আছে একটা মানুষের মাথার খুলি আর আর ষাঁড়ের তিনটে পায়ের হাড়।
- মাথার খুলি না হয় বুঝলাম। কিন্তু ষাঁড়!

সমাধিতে ঢোকার রাস্তা

- হ্যাঁ, দেবতাকে খুশি করার জন্য ষাঁড়ের বলি দেওয়া হত। রো এই হাড় দেখেই নিশ্চিত হলেন যে খুব কাছাকাছি কোন সমাধিই আছে। গর্তটা আরো গভীর হতে হতে ২৫ মিটারে এসে থামল। এবারে একটা বড় পাথরের চাঁই সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার ঘর! কিন্তু মাটির অত নিচে থাকা সেই ঘরে সূর্যের আলো তো পৌঁছতেই পারছে না। শ্রমিকরা এবারে দারুণ একটা বুদ্ধির আশ্রয় নিল। কাঁচের আয়না দিয়ে সেই খাড়াই গর্তের মধ্যে সূর্যের আলো ফেলা হল। তারপরে সেই আলো রিফ্লেক্ট করানো হল আরেকটা আয়নায়, তারপরে আরেকটায়, এই ভাবে অন্ধকার ঘরটাতে অবশেষে আলো এসে পৌঁছল। ওই আলোয় ঘরের যেটুকু দেখা গেল তাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার!
ঘরের মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে আছে সোনার টুকরো! কাঠের বড় পালঙ্ক, চেয়ার রাখা আছে। সেগুলোও জায়গায় জায়গায় সোনায় মোড়া। একটা বড় কাঠের বাক্স পাওয়া গেল। তাতে আটখানা ছোট ছোট পাথরের কৌটো রাখা, যার মধ্যে রাখা আছে সুগন্ধী তেল। মেয়েদের সাজগোজের সরঞ্জামও পাওয়া গেল। আর আছে অ্যালাবাস্টার পাথরের একটা কফিন! নাও পিজি, এবারে তোমার হেতেফেরিসের কবরে পৌঁছে গেছি।

রানীর অ্যালাবাস্টারের কফিন

পিজি একটু গোমরা মুখ করে বলল,
- বুঝলেন কী করে যে ওটা অন্য কারোর নয়, হেতেফেরিসেরই?
- নাম লেখা ছিল যে।
- অ্যাঁ, নাম লেখা ছিল?
- হ্যাঁ, একটা কাঠের পাতের ওপরে লেখা ছিল,
"উত্তর আর দক্ষিণ ইজিপ্টের মাতা, হোরাসের অনুগামী, রানী হেতেফেরিস!"

আমি এবারে বললাম,
- তাহলে হেতেফেরিসের এই সমাধির খোঁজ ডাকাতরা আর পায়নি।
- না পায়নি, তাই তো এত কিছু পাওয়া গিয়েছিল এর মধ্যে। তবে এবারে মুশকিলটা হল অন্য জায়গায়। জর্জ রেসনার হার্ভার্ড থেকে ফিরে আসার পরে হেতেফেরিসের সমাধির জিনিসপত্রগুলো বার করা শুরু হয়। সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো কাঠের খাট, চেয়ার, বাক্স গুলোর হাল খুব খারাপ ছিল। অনেক গুলো জায়গাতে শত টুকরো হয়ে পড়েছিল মেঝেতে। সেই সব টুকরো গুলোকে খুব সাবধানে গুছিয়ে ওই ২৫ মিটার লম্বা গর্ত থেকে বার করতে লেগে গেল ৩২১ দিন। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট সোনার টুকরোগুলো ওই আসবাবপত্র থেকেই খসে পড়েছিল। মোম গলিয়ে মাটিতে ফেলে তোলা হল ওগুলোকে। কিন্তু এই শত সহস্র টুকরো গুলোকে জোড়া লাগাবে কে? রেসনার নিজে পৃথিবীর তাবড় তাবড় এক্সপার্টের দ্বারস্থ হলেন। তাতেও কোন সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। শেষে কায়রো মিউজিয়ামের ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টিক্যুইটি থেকে পাঠানো হল আহমেদ ইউসুফ নামের একজনকে। রেসনার প্রথম প্রথম তাকে পাত্তা দেননি। কিন্তু চারিদিকে অনেক চেষ্টা করেও কোনও আশার আলো না দেখে রেসনার যখন হাল ছেড়ে দিতে বসেছেন তখন আহমেদ ওকে বললেন,
'সুযোগ পেলেই আমি এই টুকরোগুলো জুড়ে দিতে পারি।'
এই কথায় রেসনার বেশ হাসলেন। কিন্তু আহমেদ একদম অবিচলিত ভাবে আবার বললেন,
'আমাকে এক সপ্তাহ একদম একা ছেড়ে দিন,'
এক সপ্তাহ ও লাগল না, ছ'দিনের মাথাতেই রেসনার অবাক হয়ে দেখলেন আহমেদ একটা গোটা বাক্স জোড়া লাগিয়ে ফেলেছে। ওপরের সোনার সুক্ষ কাজ নিয়ে! এই ঘটনার পরে রেস্টোরেশনের কাজটা রেসনার আহমেদের ওপরেই ছেড়ে দেন। আহমেদ একে একে রানীর খাট আর চেয়ারগুলোও জোড়া লাগিয়ে ফেলেন। এগুলো এখন কায়রোর মিউজিয়ামে রাখা আছে।

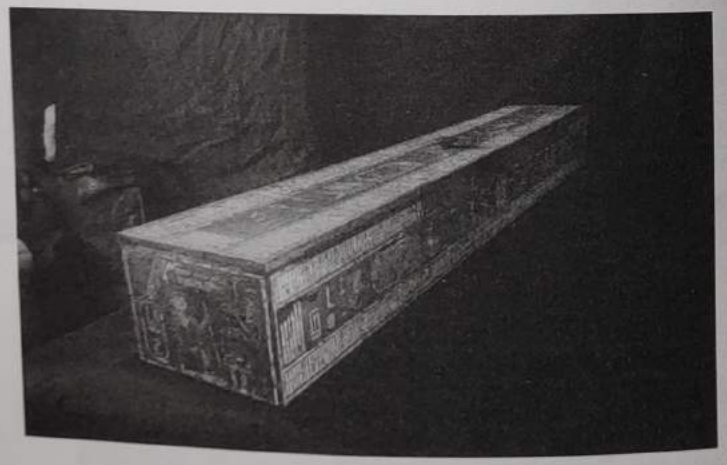

আহমেদ ইউসুফ যে বাক্সটা জোড়া লাগিয়েছিলেন

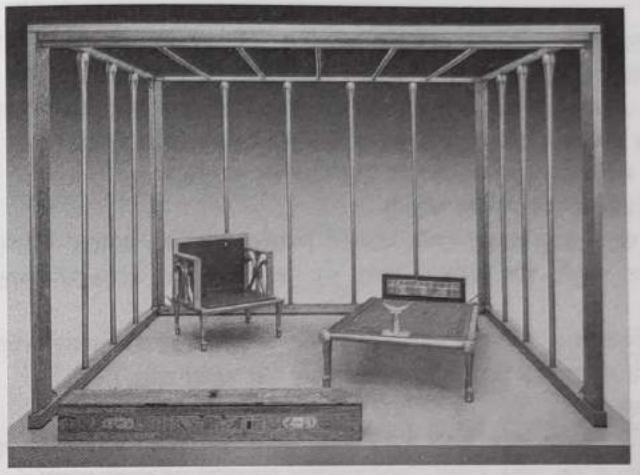

রানীর বসার চেয়ার, শোয়ার খাট

- আর হেতেফেরিসের মমি?
- হ্যাঁ, এবারে তার কথায় আসি। হেতেফেরিসের অ্যালাবাস্টার কফিনটা দারুণ ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ৩রা মার্চ, ১৯২৭ সালে জর্জ রেসনার এই কফিনটা খোলেন। কিন্তু ভিতরে কিছু পাননি। হেতেফেরিসের মমি হাওয়া! অথচ কফিনের সাথেই চারটে ছোট ছোট পাথরের জারও পাওয়া গিয়েছিল। ওগুলোর মধ্যে ছিল হেতেফেরিসের ফুসফুস, স্টমাক, লিভার আর ইন্টেস্টাইন।
- হেতেফেরিসের মমিটা তাহলে গেল কোথায়?! ওটাকে তো দাশুর থেকে তুলে নিয়ে এসে গিজার ওই কবরেই রাখা হয়েছিল বললেন?
- না তো, আমি কি বলেছি হেতেফেরিসের মমি শুদ্ধু সব কিছু আনা হয়েছিল দাশুর থেকে?
- মানে?
- মানে মিথ্যে।
- মিথ্যে?
- হ্যাঁ, ফারাও খুফুকে সেদিন মিথ্যে কথা বলা হয়েছিল। ডাকাতরা হেতেফেরিসের সমাধি লুট করার সময় মমিটাকেও নষ্ট করে ফেলে। খুব সম্ভবত মমির গায়ে লাগানো সোনার জুয়েলারি আর দামী পাথরের জন্যই। কিন্তু সেই খবর খুফুকে দিলে কারোর শরীরে আর মাথা থাকত না। তাই সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল ঘটনাটাকে। খুব তাড়াহুড়ো করে দাশুর থেকে সমাধির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেই টুকুকে তুলে নিয়ে চলে আসা হয় গিজার সমাধিতে। ফাঁকা কফিনটাও সেই সময়তেই নিয়ে এসে রেখে দেওয়া হয়। খুফু তো আর কফিন খুলে মৃত মায়ের মমি দেখতে চাইতেন না!
-কিন্তু এই ঘটনাটা জানা গেল কিভাবে? কোথাও লেখা ছিল নাকি?
- না, লেখা থাকবে কী করে? হেতেফেরিসের ফাঁকা কফিনের কারণটা জর্জ রেসনারেরই হাইপোথেসিস বলতে পারো। পাক্কা গোয়েন্দার মতো তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

- কী ভাবে!
- হেতেফেরিসের সমাধিতে ঢুকেই রেসনার খেয়াল করেন সমাধিতে অনেক আসবাবপত্র থাকলেও সেগুলো সব অগোছালো ভাবে রাখা আছে। যেন কেউ খুব তাড়াহুড়ো করে কাজটা করতে চেয়েছে। তার একমাত্র লক্ষই ছিল যত জলদি সম্ভব হেতেফেরিসের জিনিসপত্র গুলোকে এক জায়গাতে রেখে সমাধিটা বন্ধ করে দেওয়া। আর পাথরের জার গুলোতে পাওয়া দেহের অংশই বলে দিচ্ছে যে কফিনের মধ্যেও একসময় হেতেফেরিস শুয়েছিলেন।
- তার মানে মমিটা সত্যিই পাওয়া যায়নি!
- না, যায়নি। তবে পরে আবার সেটা কফিনে ফিরেও আসেনি। শুনতে খারাপ লাগলেও এই জায়গাতে সুনীল গাঙ্গুলী ভুল ছিলেন। তাও ওঁর জন্যই তোমরা হেতেফেরিসের নামটা অন্তত শুনেছিলে।
তবে বুঝলে মানিকজোড়, বইটাতে আরো দুটো ভুল আছে। হেতেফেরিসের সমাধির বর্ণনা ঠিক নেই। ১২৪ নম্বর পাতায় কি অফ লাইফের ছবিটাও ভুল আঁকা আছে।
- কি অফ লাইফ!
- হুমম, সেটা কি জিনিস পরে বলব খন। এখন চলো ওঠা যাক। অনেকক্ষণ ধরে ফাঁকা প্লেট সামনে রেখে আমরা গল্প করে যাচ্ছি। রেস্ট্যুরেন্টের লোকেরা না তেড়ে আসে।
দিলখুশা থেকে বেরিয়ে এম জি রোডের ওপরে এসে দাঁড়ালাম। ভবেশদা শিয়ালদার বাস ধরে নিলেই আমরা উল্টোদিকে হোস্টেলের পথে হাঁটা লাগাবো। দূরে দেখলাম শিয়ালদার বাস আসছে। ভবেশদা সেই দিকে তাকিয়ে বলল,
- তোমাদের তাহলে গিজার পিরামিড চত্বরের প্রায় সব কিছুই বলে দিলাম, বাকি রয়ে গেল শুধু হোর-এম-আখেতের গল্প।
- হোর-এম-আখেত? সেটা কী?
- সেটা? সেটা হল...
স্ফিংস!!
বলেই ভবেশদা টপ করে বাসে উঠে পড়ল।

৭

স্ফিংস

- আচ্ছা বলো দেখি সেটা কি যেটা ভোরবেলায় চারপেয়ে, দুপুরে দুপেয়ে আর সন্ধ্যেবেলায় তিনপেয়ে?
এ শহরে শীত বলে কিছু নেই যেন। ঠান্ডাটা এই জানুয়ারি মাসেই অনেক কমে গেছে। তার সাথে সেই চ্যাটচ্যাটে ঘামটাও ফিরেছে। সন্ধ্যের দিকটায় তবু একটু হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা তিনজনে বেনুদার দোকানে বসেছিলাম। পিজি গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কীসব হাবিজাবি জ্ঞান দিচ্ছিল। হঠাৎ করে ভবেশদা ধাঁধাটা জিজ্ঞাসা করল আমাদের।
আমি বললাম,
- ধাঁধা? কী ব্যাপার? আগের দিন কীসের গল্প বলবেন বলেছিলেন সেটা মনে আছে তো?
- মনে আছে রে বাবা। তাই তো ধাঁধাটা জিজ্ঞাসা করলাম। তোমরা এর উত্তর ভাবতে থাকো। আমি ততক্ষণে সাড়ে তিনহাজার বছরের পুরনো একটা গল্প বলি, শোনো।
গ্রীষ্মকালের একটা দিন, খুফুর পিরামিড তৈরির হাজার বছর পরের কথা। রাজকুমার চতুর্থ তুতমোসিস গিজার মরুভূমিতে হরিন শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে মাথার ওপরের গনগনে সূর্য থেকে বাঁচতে একটা বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে বসলেন। একটু পরেই ক্লান্ত চোখে ঘুম নেমে এল।
হঠাৎ করেই তুতমোসিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবতা হোরাস! হোরাস তুতমোসিসকে বললেন বালির মধ্যে ডুবে থাকা তাঁর মূর্তিটাকে বাঁচাতে। তাহলেই নাকি তুতমোসিস হবেন ভবিষ্যতের ফারাও!
ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তুতমোসিস। স্বপ্ন দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে! কিন্তু ফারাও কী করে হবেন তিনি? বাবা আমেনহোটেপের চতুর্থ সন্তান তিনি। প্রথম সন্তানদেরই তো ফারাও হওয়ার কথা। যাই হোক, যে পাথরের ছায়ায় তুতমোসিস এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন এবারে সেটিকে ভাল করে দেখলেন। একটা মাথার আদল মনে হচ্ছে না?
বেশ কয়েক মাস ধরে শ্রমিকদের সাহায্যে পাথরের চারপাশের বালি সরানো সম্ভব হল। যেটা বেরিয়ে এল সেটা দেখে তুতমোসিস অবাক হয়ে গেলেন! তার সামনে বসে আছে একটা বিশাল সিংহ! তার মুখটা মানুষের। তুতমোসিস মূর্তিটার একটা ভাঙা পা সারালেন। লাল, নীল আর আর হলুদ রঙও করালেন মুর্তিটার। তারপরে বসে থাকা সিংহটার দুপায়ের মাঝখানে একটা শিলা বসালেন। যাতে লেখা হল তুতমোসিসের স্বপ্নের কথা। এখানেই এই ভগবানের নাম দেওয়া হল হোর-এম-আখেত। যার মানে হল দিগন্তের হোরাস। অবাক কান্ড এই যে বাকি তিন ভাইকে

টপকে তুতমোসিস ফারাও-ও হয়ে গেলেন! ফারাও তুতমোসিসই পৃথিবীর প্রথম আর্কিওলজিস্ট। তুতমোসিসের বসানো সেই শিলার নাম এখন ড্রিম স্টেলা।

পিজি এবারে বলল,

- বুঝেছি। আর ওই বিশাল মুর্তিটাই হল স্ফিংস। কিন্তু স্ফিংসটা বানালো কে?

- এ নিয়ে অনেক ধন্দ আছে বুঝলে। স্ফিংসের বয়স ঠিক কতো সেটা কেউ জানে না। স্ফিংস কে কেন বানিয়েছিলেন সেটা কোথাও লেখা নেই। অনেকে ভাবে খুফুর সন্তান খাফরে, যিনি গিজার দ্বিতীয় পিরামিড বানিয়েছিলেন, তিনিই বানিয়েছিলেন স্ফিংসকে। স্ফিংসের মুখটা খাফরেরই। কেউ কেউ আবার বলে না খাফরে না, স্ফিংস বানিয়েছিলেন খাফরের আরেক ভাই দেজাফ্রে। আবার অনেকে বলে স্ফিংস খুফুর পিরামিডেরও আগের। তবে ইজিপ্ট দেশটা জুড়ে কিন্তু আরো অনেক স্ফিংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনো মন্দির বা ফারাওয়ের সমাধির বাইরে স্ফিংসের মূর্তি রাখার চল ছিল। মিশরীয়রা ভাবত স্ফিংসই সেই মন্দিরকে পাহারা দেবে। লাক্সর আর কার্নাকের দুটো মন্দিরের মাঝের রাস্তার দুধারে রাখা ছিল হাজারেরও ওপরের স্ফিংস। এত গুলো একই রকম মূর্তি থাকলেও গিজার স্ফিংস বিখ্যাত ওর আকারের জন্য। লম্বায় ৭৩ মিটার, হাইটে ২০ মিটার।

লাক্সরের মন্দিরের বাইরের অ্যাভেনিউ অফ স্ফিংস

আমি এবারে বললাম,

- আচ্ছা স্ফিংসের মুখটা এরকম ভাঙা কেন?

- সেটারও একটা গল্প আছে বুঝলে, ১৩৭৮ সাল, মিশরে তখন মুসলিম ধর্ম একটু একটু করে ঢুকছে। স্থানীয় মানুষ সেই সময় স্ফিংসের পুজো করত। ওরা ভাবত এই স্ফিংসের জন্যই নীল নদে বন্যা আসে। যার জন্য নদীর দুপাশের জমি উর্বর হয়। গিজাতে শেখ-সাইম-আল-দার নামের একজন সুফি ছিল। ইসলামে তো মূর্তি পুজোর চল নেই। এই সুফি একদিন রেগে মেগে একটা ছেনি বাটালি নিয়ে স্ফিংসের ওপরে চড়াও হয়। ভেঙে দেয় স্ফিংসের নাকটা। তারপরে নাকি হোরাসের অভিশাপে চারপাশের গ্রামগুলো বালিতে ঢেকে যায়। গ্রামবাসীরা তখন সেই সুফিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। স্ফিংসের ভাঙা নাকের টুকরোগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও থুতনির

কাছে লেগে থাকা একটা লম্বা দাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। সেই দাড়ির টুকরোটা এখন আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

- আমাদের কোলকাতা মিউজিয়ামেই তো স্ফিংস রাখা আছে তাই না?

- হ্যাঁ আছে তো। মমির ঘরটাতে ঢোকার মুখেই রাখা আছে একটা পাথরের মাঝারী স্ফিংস। তবে মিউজিয়াম ছাড়াও কলকাতার আরেকটা জায়গাতে স্ফিংস রাখা আছে, একটা নয় আবার, একজোড়া। কোথায় বলো তো? হালের ইকোপার্কের স্ফিংসটা বাদ দিয়ে বলো।

- কলকাতাতে আরো দুটো স্ফিংস? কোথায়? জানিনা তো!

- শুনলে অবাক হবে, রাজভবনের ছোট গেটের ওপরে। ছ'ফুট মতন লম্বা। টেরাকোটার ওপরে চুনের প্রলেপ দিয়ে বানানো। তার মধ্যে একটা ২০০৯ সালের আয়লাতে ভেঙে যায়। এগুলো কেন বানানো হয়েছিল কেউ জানে না। আরো অবাক করা একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ১৯১৫ সালে কাঠের ওপরে আঁকা একটা কালী ঠাকুরের ছবি আছে। এই কোলকাতা থেকেই গিয়েছিল সেই ছবি। ছবিতে ঠাকুরের মাথার ওপরের যে চালা থাকে তার দুপাশে দুটো স্ফিংস আঁকা আছে!

- বলেনকি! মা কালীর ছবিতেও স্ফিংস!

- ইতিহাস বড় অদ্ভুত স্পন্দন ভাই। এই স্ফিংসগুলোর এই কোলকাতায় বসে থাকার কোনও কারণ আমি জানি না।

পিজি এবারে বলল,

- ভবেশদা আমি শুনেছিলাম স্ফিংসের ভিতরে নাকি লোকানো ঘর আছে। এটা কি সত্যি?

- কিছুটা সত্যি বুঝলে। ১৯৮৭ সালে টোকিয়োর ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা টিম এসে স্ফিংসের শরীরের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরীক্ষা করে। ১৯৯১ সালে জন ওয়েস্ট নামের এক বিজ্ঞানী আবার স্ফিংসের পরীক্ষা করেন সিসমিক রিফ্র্যাকশন দিয়ে। দুবারেই যে তথ্য সামনে আসে তাতে চমকে যায় সবাই! স্ফিংসের শরীরের মধ্যে দুটো ফাঁপা জায়গার আভাস পাওয়া গেছে। ওর দুপায়ের মাঝেও মাটির নিচে দুটো ঘর আছে নাকি। কিন্তু সেগুলো খুঁড়ে দেখার পারমিশন কাউকে এখনো দেওয়া হয়নি।

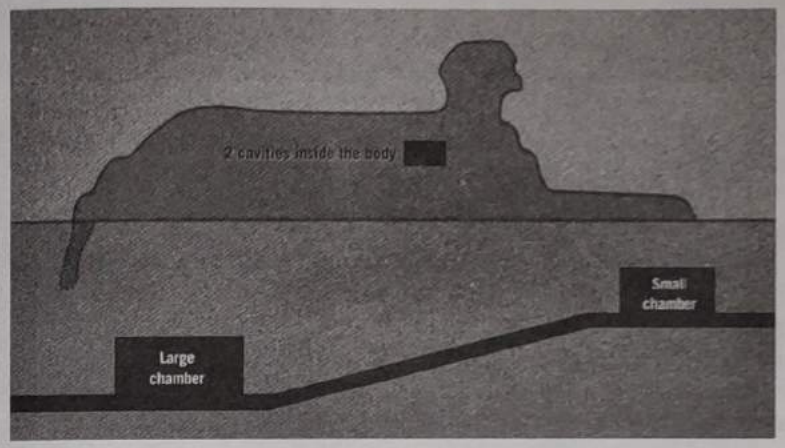

স্ফিংসের নিচের গুপ্ত ঘর

- কেন?

- কারণ স্ফিংসের অবস্থা এখন বেশ খারাপ। কায়রো শহরের পলিউশনে মূর্তিটার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় ২০০০ পাথরের টুকরো ৬ বছর ধরে জোড়া লাগানো হয়েছে। এখন স্ফিংসের বাঁ কাধের রেস্টোরেশন চলছে। সংরক্ষণের সব কাজ শেষ হলে হয়ত মাটির নিচের ঘরগুলোর খোঁজ শুরু করা যাবে। ততদিন স্ফিংস নিজের রহস্য নিজের কাছেই রেখে দেবে।

আমি এবারে বললাম,

- আপনি বললেন স্ফিংসের উল্লেখ মিশরের কোন প্রাচীন লেখাতেই নেই। আর এখন স্ফিংসের মুখটাও তো ভাঙা। তাহলে আসলে এটাকে কেমন দেখতে ছিল সেটা কেউ জানতেই পারবে না কোনোদিন?

- ভাল প্রশ্ন করেছ স্পন্দন ভায়া। তোমাদের তাহলে একটা পাগলা লোকের গল্প বলি। আমেরিকান ইজিপ্টোলজিস্ট মার্ক লেনার। এই লোকটার গোটা জীবনের একটাই লক্ষ্য, সেটা হিল স্ফিংসের সংরক্ষণ। একসময় মার্ক লেনার বছরের পর বছর কাটিয়েছেন ইজিপ্টে। গিজার ধুধু মরভূমিতে স্ফিংসের দুপায়ের মাঝখানে তাবু বানিয়ে থেকেছেন একটানা। নাওয়া খাওয়া ভুলে মূর্তিটার মাথা থেকে পা অবধি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। স্টিরিওস্কোপিক ক্যামেরা দিয়ে প্রতিটা অ্যাঙ্গেল থেকে স্ফিংসের অজস্র ছবি তুলেছিলেন লেনার। পরে উনি এই ছবিগুলো দেন আমেরিকান আর্কিটেক্ট টমাস জ্যাগারসকে। জ্যাগার এবারে ছবিগুলোর হেল্প নিয়ে কম্পিউটারে স্ফিংসের থ্রি-ডাইমেনশনাল একটা ছবি বানিয়ে ফেলেন! যে যে জায়গা গুলো ক্ষয়ে গেছে সেখান গুলোও ভরে ফেলেন। বাকি থাকল শুধু মুখটা। লেনার এবারে জ্যাগারকে স্ফিংসের আশেপাশের সময়কার প্রায় সব ফারাওদের মুখের ছবি দেন। অবাক করার ব্যাপার হল এই যে সবার মুখের মধ্যে শুধু ফারাও খাফরের মুখটাই স্ফিংসের সাথে একদম মিলে গেছে। এখন তোমরা একটু গুগল করলেই স্ফিংসের এই রিকন্সট্রাকটেড ছবিটা দেখতে পাবে।

মার্ক লেইনার

থ্রিডি রিকনস্ট্রাকসনের পরে স্ফিংস!

এক টানা এতটা বলে ভবেশদা একটু থামল। তারপরে প্লাস্টিকের জগ থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে বলল,

- উফফ, অনেক বকাও তোমরা আমাকে। স্ফিংসের গল্প তো শুনলে। এবারে বলত এই নামটার মানে কী?

- নামের মানে? সেভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি।

- স্ফিংস শব্দটা কিন্তু ইজিপশিয়ান নয়, গ্রীক। গ্রীকদের সাথে ইজিপশিয়ানদের ব্যবসা বানিজ্যের খাতিরে বেশ ভাল যোগাযোগ ছিল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওরা ইজিপ্টে ওই অদ্ভুত জীবের মূর্তি দেখে এসেছিল। তারপরে কখন যে স্ফিংস গ্রীক মাইথোলজির একটা অংশ হয়ে গেল সেটা কেউ জানে না।

- বলেন কী! গ্রীক মাইথোলজিতেও স্ফিংস!

- হ্যাঁ, ঠিকই শুনছ। গ্রীক পুরাণে স্ফিংস হল একটা রাক্ষস। যার শরীরটা একটা সিংহীর, মুখটা মেয়ের, তার একজোড়া ঈগলের ডানা আছে, লেজটা আবার সরীসৃপের। এই স্ফিংস নাকি থেবস নামের এক শহরকে পাহারা দেয়। শহরে যেই ঢুকতে যায় তাকেই স্ফিংস একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। তার উত্তর না দিতে পারলেই স্ফিংস সেই লোকটার গলা টিপে মেরে ফেলে তাকে খেয়ে নেয়। গ্রীক শব্দ স্ফিংগো থেকে স্ফিংস শব্দটা এসেছে। স্ফিংগো মানে নিংড়ে নেওয়া।

- তাহলে স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর কেউ পেরেছিল দিতে?

- পেরেছিল তো। ইডিপাসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।

- হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রয়েডের ইডিপাস কমপ্লেক্সের নাম শুনেছি।

ইডিপাস আর স্ফিংস

- ঠিক, এই ইডিপাস ছিলেন একজন গ্রীক বীর। ওর গল্প তোমাদের অন্য কোন একসময় বলব না হয়। যাই হোক, ইডিপাস যখন থেবস শহরে ঢুকতে যায় তখন স্ফিংস ওকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। ইডিপাসই প্রথম যে ওর উত্তরটা পেরে যায়। এর পরেই পাহাড়ের চুড়ো থেকে লাফিয়ে স্ফিংস আত্মহত্যা করে।
পিজি এবারে বলল,
- হুম, এই ইডিপাস ভদ্রলোক দেখছি বেশ স্মার্ট ছিলেন। তা ধাঁধাটা কি ছিল?
ভবেশদা এর উত্তর না দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল। এবারে সব কিছু পরিষ্কার হল আমার কাছে!
- বুঝেছি বুঝেছি! আপনার প্রথমে বলা ধাঁধাটাই স্ফিংস ইডিপাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল! সেটা কি যেটা ভোরবেলায় চারপেয়ে, দুপুরে দুপেয়ে আর সন্ধ্যেবেলায় তিন পেয়ে?
- ঠিক, এবারে বল দেখি উত্তরটা।
আমরা এবারে একে অন্যের মুখের দিকে চাইলাম, পিজি বলল,
- আপনার গল্পটা শুনতে শুনতেই ভাবছিলাম উত্তরটা। কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না তো।
- হুম, তাহলে তো তোমরা স্ফিংসের খাদ্য হতে!
- আপনি জানেন নাকি উত্তরটা?
- জানি তো।
- কী?!
ভবেশদা এবারে আমাদের দুজনের খুব কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল,
- মানুষ!!

৮

ওবেলিস্ক

গত শনিবার বইমেলাতে গিয়েছিলাম। আমি আর পিজি দুজনে যাব বলেই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সাড়ে দশটা নাগাদ হোস্টেল থেকে বেড়িয়ে পিজি বলল চল দেখি ভবেশদা কী করছে। আমাদের চলমান মিশরীয় এনসাইক্লোপিডিয়া তখন সবেমাত্র গুমটিটা খোলা শুরু করেছিল। কিন্তু সে গুমটি আর তার খোলা হল না, আমি আর পিজি ওকেও বগলদাবা করে উঠে বসলাম করুণাময়ীর বাসে। ভবেশদা প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করছিল বটে, সেন্ট্রাল পার্কে নাকি বইমেলার আমেজটাই পাওয়া যাবে না। তাই ও এবারে আর যাবে না মেলাতে। কিন্তু পিজি ওর ব্রহ্মাস্ত্রটা বার করেছিল তখনই। তারপরে আর ভবেশদা না করতে পারেনি। বেনফিশের ফিশ কাটলেটকে না বলবে এমন বাঙালী খুব কমই আছে।
আট নম্বর গেট দিয়ে মেলায় ঢুকলাম। ছোট জায়গাটা, তাই খুব একটা খোলামেলা ভাবে স্টল গুলো ছিল না এবারে, বড় বড় পাবলিশার্সদের স্টলগুলোও যেন মাপে একটু ছোট। তবে অবাক হওয়ার ব্যাপার এইটাই যে ভীড়টা বেশ কম। মেলাতেই এক স্টলের মালিকের কাছে শুনলাম চিংড়িঘাটাতে নাকি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ওইদিকের রাস্তা একেবারে বন্ধ। তাই অনেকেই চাইলেও বইমেলার দিকে আসতে পারছে না। এতে আমাদের যদিও বেশ ভালই হল। মোটমুটি কোন স্টলেই লাইনে দাঁড়াতে হল না। রাজার মতো ঢুকলাম। স্টলের ভিতরে ধাক্কাধাক্কিটাও এড়ানো গেল। অবশ্য ওই ভীড়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে বই দেখা, বই কেনারও একটা আলাদা মজা আছে।
গোটা মেলাটা ঘুরে দেখতে ঘন্টা তিনেক মতো লাগল। মেলাতে বইয়ে তেমন ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আজকাল বাড়িতে বসেই অনলাইনে বেশ ভাল ছাড়ে বই কেনা যায়। কিন্তু তবু বইমেলাতে এসে বই না কিনে ফিরতেও কেমন একটা লাগে। বইয়ের গন্ধ নাকে এলেই মনে হয় কিনে ফেলি। আমি কিনলাম বুদ্ধদেব বসুর কালের পুতুল আর তিথিডোর। ভবেশদা কিছুই কিনল না। আর পিজি কিনল অ্যাস্টেরিক্স।
অ্যাস্টেরিক্সের ওপরে পিজির একটা অদ্ভুত মোহ আছে খেয়াল করেছি। বাংলায় লেখা সব কটা বই তো ওর আছেই। ইংরাজীরগুলোও কিনেছে ও। এমনকী ২০১০ এ আলবার্ত উদের্জো অ্যাস্টেরিক্স আঁকা আর লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরেও যে দুটো বই বেরিয়েছিল সেগুলোও আছে পিজির কাছে। আমাকে ওগুলো পড়িয়েছিল, আমার কিন্তু আগের অ্যাস্টিরেক্সের মতো ভাল লাগেনি। কিছু একটা যেন নেই। তবে পিজিই আমাকে দেখিয়েছিল ২০১৫তে বেরোনো 'অ্যাস্টেরিক্স অ্যান্ড দি মিসিং স্ক্রল' এ অ্যাসটেরিক্সের সেই দুটো ছবি যেটা উদের্জো নিজে এঁকেছিলেন অবসর কাটিয়ে ফিরে

এসে। সেই বছরেই প্যারিসে চার্লি হেবদোর দপ্তরে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে খুন করা হয় সাতজন কার্টুনিস্টকে। ওঁদের স্মৃতিকে সন্মান করেই যে উদের্জো ওই ছবিগুলো আঁকেন সেটাও পিজির কাছ থেকেই জানা। ছেলেটা এই কমিক্সটাকে গুলে খেয়েছে একেবারে। ২০১৭ র অক্টোবর মাসে যখন এই কমিক্সের সাঁইত্রিশ নম্বর টাইটেল 'অ্যাসটেরিক্স অ্যান্ড দি চ্যারিওট রেস' বার হয় তখনই পিজি বলেছিল কিনবে। ওর এবারের বইমেলার সংগ্রহ ওই বইটাই।

মেলায় ঘুরে ঘুরে খিদেটা ভালই পেয়েছিল। পিজির ভবেশদাকে দেওয়া কথা মতো বেনফিশের স্টল থেকে তিনটে ফিশ কাটলেট কেনা হল। তারপরে আমরা গুছিয়ে বসলাম আনন্দ'র স্টলের সামনে বড় চাতালটাতে। কাটলেট খেতে খেতেই পিজি অ্যাস্টেরিক্সটা বার করে পড়তে শুরু করল। আমি আর ভবেশদা গল্প করছিলাম। ১৯৯৭ সালে ময়দানের যে মেলাতে আগুন লেগেছিল তার কথা বলছিল ভবেশদা। ময়দানের মেলার যে আমেজটা ছিল সেটা মিলনমেলা বা এখানে একেবারে মিসিং সে সব কথাও উঠে এল।

একসময় পিজি হাতের বইটা বন্ধ করে বলল,

- বুঝলি, বইটা হাফ নামিয়ে দিলাম। ফেরি আর কনরাডের জুটি কিন্তু আগের দুটোর থেকে এটাকে বেটার বানিয়েছে।

- বলছিস?

- হুমম, তবে এই গল্পটা একটু অন্যরকম বাকিগুলোর থেকে।

- তাই নাকি?

- হ্যাঁ, ওবেলিক্সকে দেখছি এবারে অনেকটা বেশি স্পেস দিয়েছে। অ্যাস্টেরিক্সের থেকেও বেশি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ও সাইডকিক না, মেন হিরোই।

- আচ্ছা ওবেলিক্সের নামটা এমন কেন বল দেখি?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ভবেশদা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই মুচকি হাসছে।

- তা তো জানি না, ওই মেনহির পাথর চাগিয়ে ঘোরে বলেই কি?

- না ঠিক তা নয়, তবে ওই মেনহিরের সাথে সামান্য মিল আছে বলতে পারো। ওবেলিস্ক শব্দটা গ্রীক ওবেলিসকস থেকে এসেছে, যেটার উৎস আবার ওবেলস। এর মানে হল লম্বা পাথরের থাম, যাক মাথাটা সুঁচলো। গ্রীকদের কাছে এটা ছিল শক্তির একটা প্রতীক। তবে জিনিসটা আদতে কিন্তু গ্রীক না।

- তাহলে?

- বিশাল উঁচু একটা থাম, একটাই পাথর কেটে তৈরি। তার মাথায় বসানো একটা পিরামিড।

- এখানেও ইজিপ্ট!

- হ্যাঁ ভাই, ওই দেশটা না থাকলে আজকে হয়ত তোমার কার্টুনের ওবেলিক্সের নামটাই অন্য কিছু হত।

||

কাটলেটের সাথেই কেনা কফিতে চুমুক দিয়ে ভবেশদা বলল,

- পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া নিয়ে ইজিপ্সিয়ান মাইথোলজিতে অনেক রকমের গল্প আছে বুঝলে, তার মধ্যে একটা হল বেনু নামের এক পাখির। সৃষ্টিকর্তা নাকি বেনু পাখির রূপ ধরে একটা পাথরের ওপরে বসে আওয়াজ করেন। সেটাই প্রথম শব্দ। অসীম নিস্তব্ধতা ভেঙে সেই আওয়াজের সাথেই

জন্ম হয় পৃথিবীর। এই বেনু পাখির শরীর ছিল সূর্যের মতো উজ্জ্বল, একবার মারা যাওয়ার পরেও নাকি আবার সে বেঁচে ফিরত।

- অনেকটা ফিনিক্সের মতো না!

- অনেকটাই, গ্রীক পুরাণের বেশ কিছুটা মিশর থেকে ধার করা, এটাও হয়ত তার মধ্যে একটা। বেনু পাখি তৈরি হয়েছিল সূর্যের দেবতা 'রা' আর মৃতদের দেবতা 'ওসাইরিসকে' মিলিয়ে। এবারে বেনু যে পাথরটায় বসে ডাক দিয়েছিল সেই পাথরটাই নাকি এই পৃথিবীর প্রথম বস্তু। এই পাথরটার নাম বেনবেন। উত্তর ইজিপ্টের হেলিওপলিসে 'রা' এর সাথে সাথে বেনবেনেরও পুজো হত। মিশরীয়রা এই বেনবেনের কল্পনা করেছিল পিরামিডের আকৃতিতে। আর সেখান থেকেই ওবেলিস্কের কনসেপ্টের সৃষ্টি। নেটে ইজিপ্সিয়ান ওবেলিস্ক বলে সার্চ করো তাহলেই পেয়ে যাবে।

ওবেলিস্কের ছবিতে দেখলাম সত্যি একটা বিশাল পাথরের টুকরো, চারকোণা, গায়ে হায়রোগ্লিফ খোদাই করা। মাথাটায় একটা ছোট পিরামিড। ভবেশদা বলতে লাগল,

- ফারাওরা এই ওবেলিস্ক বানিয়ে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করতেন বুঝলে। ওবেলিস্কের গায়ে লেখা হত ফারাওয়ের গুণগান, আর ভগবানের স্তুতি। ওঁরা ভাবত মাটি থেকে অনেক উঁচু এই থামই ভগবানের কাছে রাজার বার্তা পৌঁছে দেবে। মাথার ওই ছোট পিরামিডে খোদাই করা থাকত সূর্য দেবতা আর ফারাওয়ের ছবি। পিরামিডটা মোড়ানো থাকত সোনাতে। কারণ সূর্যের আলো পড়ে তা চকচক করে। আর তাছাড়া ওরা ভাবত সোনা হল স্বয়ং ঈশ্বরের শরীরের মাংস, তাই খুব পবিত্র।

প্রথম ওবেলিস্ক তৈরি হয় টুয়েন্টিফিফথ সেঞ্চুরি বিসিতে। ফারাও উসারকাফের সময়। কিন্তু সেটা বানানো হয়েছিল চুনাপাথরের টুকরো একটার ওপরে আরেকটা সাজিয়ে। গোটা একটা

পাথর কেটে ওবেলিস্ক বানানো শুরু হয় আরো পাঁচশ বছর পরে। প্রথম আর তৃতীয় তুতমোসিস, হাতসেপসুত, দ্বিতীয় রামেসিস এরা প্রচুর ওবেলিস্ক বানিয়েছিলেন গোটা দেশ জুড়ে।
পিজি এবারে বলল,
- এগুলোর হাইট কেমন হত ভবেশদা? দেখে তো বেশ উঁচুই মনে হচ্ছে।
- হ্যাঁ, মোটামুটি ধরো একটা দশ তলা বাড়ির সমান।
- এত বড় একটা পাথর! ওভাবে বানাতো কী করে! ওইটার ওজনও তো প্রচুর হবে!
- ওবেলিস্ক বানানোর পদ্ধতিটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল বুঝলে। সাধারণত গ্রানাইট, চুনাপাথর বা বালিপাথর কেটে বানানো হত। প্রথমে বিশেষজ্ঞরা পাথরের খনিতে গিয়ে একটা বড় পাথরের টুকরোকে পছন্দ করত। তারপরে সেই লম্বা পাথরের টুকরোর দু'পাশে দু ফুট গভীর পরিখা কাটা হত। তার ভিতরে সারি দিয়ে বসত শ্রমিকেরা। তারা এবারে পাথরের টুকরোটাকে সমান ভাবে কাটত। গাটা পালিশ করত ডিওরাইটের মতো ভলকানিক পাথর দিয়ে। কারণ সেগুলো গ্রানাইটের থেকেও শক্ত হত। তারপরে তার গায়ে সম্রাটের আদেশ মতো হায়রোগ্লিফিক লিপি খোদাই করা হত। পাথরটাকে দুপাশ থেকে কেটে চৌকো আকার দেওয়া হত। এবারে একদম শেষে পাথরের মাটিতে লেগে থাকা অংশটা ভাঙলেই তৈরি ওবেলিস্ক!

যেভাবে ওবেলিস্ক তৈরি হত

- তৈরি তো হল, কিন্তু এত ভারী জিনিসটাকে খনি থেকে তো নিয়েও যেতে হবে যেখানে বসাতে হবে সেখানে।
- হ্যাঁ তারও পন্থা আছে বইকি। লাক্সরের মন্দিরের বাইরের বিশাল বড় একটা ওবেলিক্স আছে। সেটাকে কীভাবে আনা হয়েছিল শোনো। আসওয়ানের খনিতে তো তাকে বানানো হল। তারপরে কাঠের পাটাতনের ওপরে চাপিয়ে তার নিচে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তাকে গড়িয়ে আনা হল নীল নদের তীরে। তারপরে সবাই অপেক্ষা করে রইল বর্ষার জন্য। বর্ষাকালে নীল নদে যখন বন্যা হল তখন জলের গভীরতা অনেক বেড়ে গেল। তখন সেই ওবেলিস্কটাকে একটা বিশাল নৌকায়

চাপিয়ে নিয়ে আসা হল লাক্সরে। এবারে আবার অপেক্ষা। কখন নদীর জল নামে। জল নেমে যাওয়ার পরে ওবেলিস্ককে আবার নৌকা থেকে নামিয়ে আগের মতো কাঠের পাটাতনের ওপরে চাপিয়ে নিয়ে আসা হল লাক্সরের মন্দিরের বাইরে। সেখানে আবার বালি দিয়ে একটা বিশাল উঁচু ঢিপি বানানো হল। তার গা বেয়ে এবারে ধীরে ধীরে দাঁড় করানো হল ওবেলিস্কটাকে। তারপরে বালি সরিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে।

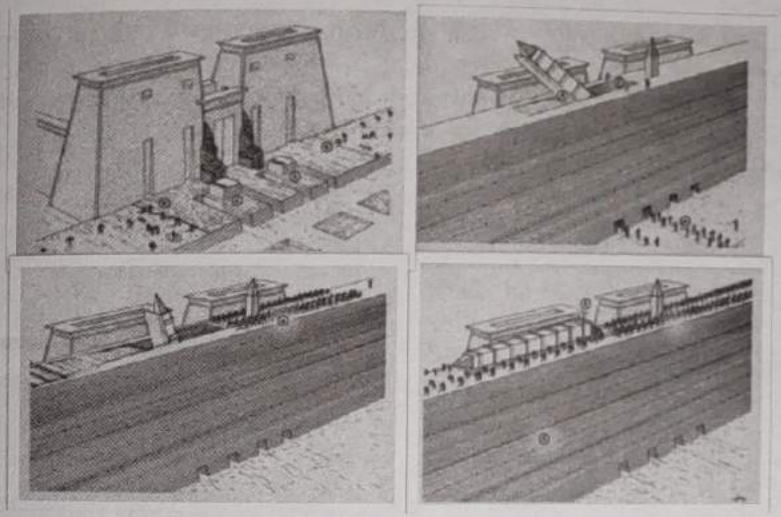

লাক্সরের মন্দিরের ওবেলিস্ক

- বাবারে! এতো বিশাল ঝক্কির ব্যাপার! তবু ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলের তারিফ করতে হয়। কিন্তু ভবেশদা একটা কথা বলুন, ওবেলিস্ক না হয় ফারাওদের সময় বেশ পপুলার ছিল। বললেন অনেকগুলো বানানোও হয়েছিল। কিন্তু আজকের আগে অব্দি তো কখনো মিশরের কোন ছবিতে এটাকে খেয়াল করিনি।

- সেটা না দেখারই কথা ভাই। কারণ বেশিরভাগ ওবেলিস্কই এখন সে দেশের বাইরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউরোপ আর আমেরিকাতে।

- ওত ভারী জিনিসও ওরা ছাড়ে নি!

- ছাড়বে কেন? ওবেলিস্কগুলোকে দেখতেই তো দারুণ আকর্ষক ছিল। সেই রোমানদের সময় থেকে ওরা দেশ ছাড়া হওয়া শুরু করেছে। সম্রাট অগাস্টাস একটা ওবেলিস্ককে উপড়ে নিয়ে আসেন রোমে। সেই শুরু, তারপরে থিওডোসিয়াস আরেকটাকে আনেন কন্সট্যান্টিনোপলে, যেটা এখন ইস্তানবুল। শ্যাম্পোলিয়নের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই?

- মনে থাকবে না আবার! যিনি হায়রোগ্লিফ আবিষ্কার করেছিলেন।

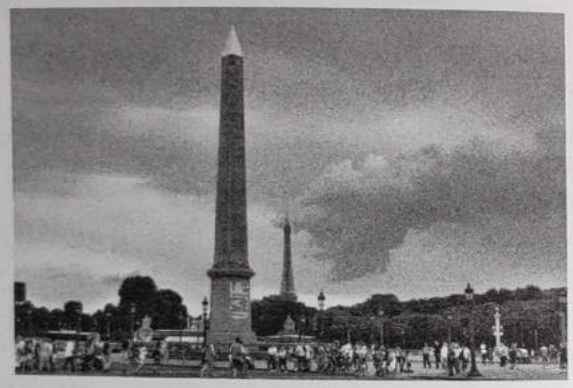

প্যারিসের ওবেলিস্ক

লন্ডনের ওবেলিস্ক

- এগজ্যাক্টলি, সেই শ্যাম্পোলিয়ন যখন ইজিপ্টে ঘুরতে এসেছিলেন তখন লাক্সরের রামেসিসের মন্দিরের বাইরের একজোড়া ওবেলিস্কের মধ্যে একটাকে তুলে আনেন। সেটা এখন আছে প্যারিসে। আবার ব্রিটিশরা যখন ফ্রেঞ্চদের হারিয়ে দিল তখন ইজিপ্টের সুলতান ওদের একটা ওবেলিস্ক উপহার দেন। সেটা এখন লন্ডনে, থেমসের ধারে। 'ক্লিওপেট্রা'স নিডল' নামেই এখন সবাই ওকে চেনে।

- বলেন কী! তার মানে ক্লিওপেট্রার সময়ে এটা তৈরি হয়েছিল।

- ধুস, সেই ফারাও ক্লিওপেট্রার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এটা ফারাও তৃতীয় তুতমোসিসের সময়ের। তবে নামটা কেন হল সেটা বেশ মজার। প্রায় ২০০ টন ভারী ওবেলিস্কটাকে লন্ডনে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন ডিক্সন লোহার একটা লম্বা সিলিন্ডারের মতো দেখতে ডিঙি বানান। এরই মধ্যে ওবেলিস্কটাকে ভরে ওল্গা নামের একটা জাহাজে করে সেই ডিঙিটাকে টেনে নিয়ে আসা হয় জলপথে। ডিক্সন ওর বানানো ডিঙির গাল ভরা নাম দিয়েছিলেন 'ক্লিওপেট্রা'। তাই সেই থেকে ওবেলিস্কটার নামও হয়ে যায় ক্লিওপেট্রা'স নিডল। এখন এটার সাথে নিউইয়র্কে থাকা আরেকটা ওবেলিস্ক আর প্যারিসের ওবেলিস্ককেও ওই একই নামে ডাকে সবাই।

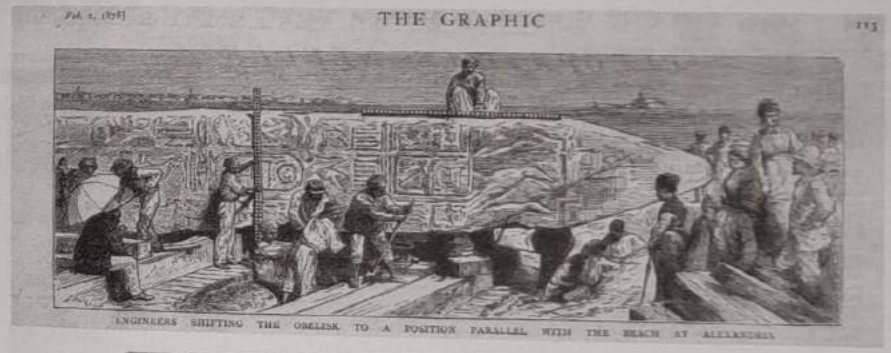

ক্লিওপেট্রা নামের সেই ডিঙিটা

- আচ্ছা ভবেশ দা ওই নিউইয়র্কের ওবেলিস্কটাই সেই ফরেস্ট গাম্প সিনেমাতে দেখিয়ে ছিল না! টম হ্যাঙ্কসের সেই বিখ্যাত স্পিচটা! আর তারপরে.. উফফ কী দারুণ সিন ছিল!
সিনেমার কথা বলার সময় হলেই পিজি উত্তেজিত হয়ে পড়ে দেখেছি। এবারেও সেরকমই হল। ভবেশদা ওর কথায় একটু হেসে উত্তর দিল,
- না ভাই, ওইটা তো ওয়াশিংটন মনুমেন্ট। আমেরিকাতেই বানানো। ইজিপ্টের নয়। আইকন হিসাবে এটা এমনই স্ট্রং যে গোটা পৃথিবী জুড়েই অজস্র ওবেলিক্স বানানো হয়েছে পরে।
- আমাদের দেশে এরকম কিছু নেই?!
- আমাদের এই শহরেই তো ছিল ভায়া।
- তাই নাকি!
- হুম, হলওয়েল মন্যুমেন্টের নাম শুনেছ?
- শুনব না আবার! সিরাজদৌল্লার ফোর্ট উইলিয়াম দখলের পরে অন্ধকূপে ঠেলে দেওয়া হয় ব্রিটিশ বন্দীদের। তাতে মারা যান অনেকে। এর স্মৃতিতেই বানানো হয় হলওয়েল মন্যুমেন্ট।
- বাহ! একদম ঠিক বলেছ, ১৭৫৬ সালে অন্ধকূপের হত্যাকান্ড হয়। সেই অন্ধকূপ থেকে যে কয়েকজন প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন জন জেফানিয়া হলওয়েল । ১৭৫৯ সালে ইনিই উদ্যোগ নিয়ে হলওয়েল মনুমেন্ট বানান। এই মনুমেন্টটা ছিল ইজিপশিয়ান ওবেলিস্ক এর আদলে।
পিজি বলল,
- বাহ! তাহলে এখন সেটা কোথায় গেল?

হলওয়েল মন্যুমেন্ট, পিছনের বাড়িটা রাইটার্স বিল্ডিং

- সেটারও অনেক গল্প, ১৮২১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। সেই সময়কার পাদ্রী জেমস লঙের মত অনুযায়ী যেহেতু এই মনুমেন্ট এদেশীয়দের হাতে ব্রিটিশদের লাঞ্ছনার প্রতীক তাই এটাকে ভেঙে ফেলাটাই বেটার বলে মনে

করেন হেস্টিংস। তবে ১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বরে আবার হলওয়েল মন্যুমেন্টের একটা ছোট্ট মার্বেলের রেপ্লিকা বানানো হয়, মন্যুমেন্টের আগের জায়গাতেই। সেটা বানান লর্ড কার্জন।
- ওকে। তার মানে রেপ্লিকাটা অ্যাটলিস্ট এখনও ওখানেই আছে।
- ধুস, গোটাটা শোনো আগে, ১৯৪০ সালে নেতাজী হলওয়েল মন্যুমেন্ট ভেঙে ফেলার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ঠিক হয় ৩রা জুলাই, সিরাজের মৃত্যুদিনে এটাকে ভেঙে ফেলা হবে। ইংরেজরা বেগতিক বুঝে ২রা জুলাই নেতাজীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তার পরেও আর রিস্ক নিতে চায়নি ওরা। কার্জনের বানানো রেপ্লিকাটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট জন্স চার্চের প্রাঙ্গণে। এখনো ওখানেই আছে সেটা। কিন্তু আকারে এতটাই ছোট এই রেপ্লিকা যে একে ওবেলিস্ক ঠিক বলা যাবে না বুঝলে। তবে এদেশে একটা ওবেলিস্ক দাঁড়িয়ে আছে দিল্লীতে। আর এর সাথেও আমাদের শহরের নাম জড়িয়ে আছে জানো।
- তাই নাকি!
- হুমম, ১৯১১ সালের জুন মাসে ইংল্যান্ডের নতুন রাজা হন পঞ্চম জর্জ। সে বছরেরই ১২ই ডিসেম্বরে জর্জ আসেন দিল্লীতে। মুঘল রাজাদের আদলে পঞ্চম জর্জ দরবার বসান। সেই দিন একটা এমন ঘোষণা করেন যেটা স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা ওবেলিস্ক বানানো হয়। এখন সেটা আছে দিল্লীর করোনেশন পার্কে।

করোনেশন পার্কের ওবেলিস্ক

- ঘোষণাটা কী ছিল?!
- আন্দাজ করতে পারো কি?
যথারীতি অন্যবারের মতো এবারেও আমাকে আর পিজিকে চুপ করে থাকতে দেখে ভবেশদা নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিল।
- সেই দিনই আমাদের কোলকাতা ব্রিটিশ রাজত্বের রাজধানীর তকমা হারায়। আর দিল্লী হয়ে যায় নতুন রাজধানী।

৯

খুফুর নৌকা

কালকে কলেজে প্যাথলজির লেকচার ক্লাস চলছিল। আমি আর পিজি পিছনের দিকের একটা বেঞ্চে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম ব্যাটা মোবাইলে কি একটা খুটখুট করছে, ক্লাসে মন নেই। ছুটির পরে বুঝলাম কারণটা।

- ভবেশদাকে প্যাঁচে ফেলার মতো একটা জিনিস পেয়েছি বুঝলি।

- ভবেশদাকে? কী সেটা?

- হুঁ হুঁ বাবা, ও কী ভাবে? ও মিশরের ইতিহাসের সব কিছু জানে? এমন একটা জিনিসের ব্যাপারে আজকে নেটে পড়লাম না যেটা কোনও বাংলা বইতে লেখা নেই। আজ সন্ধেবেলায় চল ভবেশদার দোকানে। লোকটার নলেজের একটা অ্যাসিড টেস্ট হবে।

পিজি একরকম টেনে নিয়েই গেল আমাকে ভবেশদার দোকানে। তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে ছ'টা।

- কী ব্যাপার হে মানিকজোড়? আজকে আবার গল্প শুনতে নাকি?

পিজি বেশ গম্ভীর মুখ করে বলল,

- ভবেশদা, খুফুর নৌকা নিয়ে কিছু বলতে পারবেন? না মানে, আমি একটু রিসার্চ করছিলাম নেটে...

আমি ভাবলাম খুফুর নৌকা? সেটা আবার কি জিনিসরে বাবা। ফারাও খুফুর নৌকা থাকতেই পারে। সেটা নিয়ে আবার কিছু জানার আছে নাকি? ভবেশদা কিন্তু পিজির মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল,

- হুম, নেটে রিসার্চ করছিলে, ওই জিনিসটা গলিতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলার মত। তা কী পেলে তোমার রিসার্চে?

পিজি রেগে গেলে কান দুটো লাল হয়ে যায়, এটা আমি বুঝতে পারি। আজকেও সেরকমই একটা ব্যাপার হল,

- আমি নেটে কী পেলাম সেটা বলব পরে, আগে আপনি বলুন আপনি কী জানেন?

- আমি কী জানি? তা ভাল, না খুব বেশি কিছু জানি না এ ব্যাপারে। তবে তুমি খুফুর কোন বোটের কথা বলছ?

- কোন বোট মানে? খুফুর তো একটাই নৌকা...

- উঁহু, একটা না, দুটো।

- দু...দুটো?

- হ্যাঁ ভাই, দুটো বোট তো, তুমি জানো না?

এবারে পিজির ঢোঁক গেলার পালা। ও যখন মাথা চুলকোচ্ছে তখন আমি বললাম,

- আপনারা কী কথা বলছেন আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। খুফুর নৌকার গল্পটা আজকে

বলুন না তাহলে।

- না ভাই, আজকে বলার মতো মুড নেই। আসলে সকাল থেকে কেন জানিনা গলাটা শুকিয়ে আছে, ঠান্ডা কিছু একটা পেলে..

আমি বললাম,

- কোনো ব্যাপার না, প্যারামাউন্টে চলুন, পিজি আজকে শরবত খাওয়াবে আমাদের? তাই না পিজি?

ও আর কী বলবে? পরাজিত সৈনিকের মতো কাঁধ ঝুলিয়ে চলল আমাদের সাথে।

||

সুরুত করে আওয়াজ করে ডাব শরবতে একটা চুমুক দিয়ে ভবেশদা বলল,

- নৌকার কথা ভাবলেই প্রথমেই কী মাথায় আসে বলত?

- নদী?

- ঠিক, মানুষের মৃত্যুর পরের জীবনের সাথে নদী অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে আছে বুঝলে, আমাদের পুরাণের কথাই ধর না, মারা যাওয়ার পরে বৈতরণী নদী পার করে মৃত আত্মা পৌঁছে যাবে যমের দক্ষিণ দুয়ারে। যেখানে তার পাপ পুণ্যের বিচার হবে। সেই বিচার ঠিক করে দেবে সে স্বর্গে যাবে নাকি নরকে যাবে। আবার গ্রীক পুরাণের স্টাইকস নদীর কথা ধরো। এই নদী বেয়েও মৃত মানুষের আত্মা পৌঁছে যাবে নরকে। যেখানে তার বিচার করবে দেবতা হেইডিস। কিছুর সাথে মিল পাচ্ছ এই গল্পের?

- পাব না আবার? মিশরের পুরাণেও তো মারা যাওয়ার পরে আত্মা যায় মাটির নিচের জগতে, ওসাইরিসের কাছে তার বিচার হয়। আপনিই বলেছিলেন বুক অফ দি ডেডের গল্প।

- বাহ! মনে আছে দেখে খুব ভাল লাগল। মিশরীয়রাও এই বৈতরণী আর স্টাইকস নদীর মতো নীলনদকে মনে করত মৃত্যুর পরের জগতে যাওয়ার রাস্তা। নীলনদেরই পশ্চিম তীরে ছিল অ্যাবিদস নামের একটা জায়গা, যেখানে ছিল ওসাইরিসের মন্দির। তাই ইজিপশিয়ানরা বিশ্বাস করত এই নদী পেরিয়েই আত্মা ওসাইরিসের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু বৈতরণী, স্টাইকস আর নীল, এই তিনটে নদীই পেরতে গেলে কি লাগবে বলে মনে হয়?

- কি আবার,নৌকা।

- ঠিক, সেই হিসাবে ফারাও খুফুও যে মারা যাওয়ার পরে একটা নৌকা করেই ওসাইরিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন সেটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাই বলে দু'খানা আস্ত নৌকা যে খুফুর সমাধির সাথে রাখা থাকবে সেটা কেউ কখনো ভাবেনি আগে।

- কিন্তু খুফুর পিরামিড তো একদম ফাঁকা ছিল বলেছিলেন।

- আমি কি বলেছি নাকি যে নৌকাগুলো পিরামিডের মধ্যে রাখা ছিল? চল তোমাদেরকে ৬৪ বছর আগের একটা দিনে নিয়ে যাই।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৪, গিজার মরুভূমির দক্ষিণে কাজ করছিলেন আর্কিওলজিস্ট মহম্মদ জাকি আর ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট গারাস ইয়ানি । অবশ্য জাকির কাজকে আর্কিওলজি না বলে ময়লা পরিষ্কার করা বলা যেতে পারে। সৌদি আরবের রাজা আবদেল আজিজ নাকি গিজার পিরামিড দেখতে আসবেন। তাই পিরামিডের আশেপাশের চলতে থাকা এক্সক্যাভেশনের কাজের জন্য তৈরি হওয়া

আবর্জনা সরাবার দায়িত্বে ছিলেন ওরা। কিন্তু এই সব ছাইপাঁশ ঘাঁটতে ঘাঁটতেই ওদের হাতে চলে এল একটা অমূল্য রতন!

মৃতদেহকে যেমন ধরণের নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার চল ছিল

অনেকগুলো বিশাল আয়তকার চুনাপাথরের টুকরো। পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগানো আছে। দেখেই মনে হচ্ছে মাটির নিচের কিছু একটার ওপরের ঢাকনার কাজ করছে ওইটা! কয়েকটা পাথরের গায়ে আবার লেখা আছে –

'এই সম্পদ তার বাবা খুফুকে অর্পণ করলেন ফারাও জেদেফ্রে!'

আরেকটা একটা নতুন আবিষ্কার তাহলে! ব্যাস, সৌদির রাজা আসার চিন্তা পাশে সরিয়ে রেখে দুজনে মিলে লেগে পড়লেন ওই পাথর পরিষ্কার করার কাজে। কাজ শেষ হতে লেগে গেল এক মাস।

২৫শে মে, ১৯৫৪, সেইদিনই পাথরের ওপরের সব ময়লা সরানোর কাজ শেষ হল। এবারে খুলে দেখার অপেক্ষা। কিন্তু সেইদিনই মহম্মদ জাকির কাছে একটা খারাপ খবর এল। ওর ছোট্ট মেয়ে ওয়াফাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সব কাজ ফেলে জাকি ছুটলেন মেয়ের কাছে। দুঃখের খবর এই যে মেয়েকে বাঁচানো গেল না। মহম্মদও আর কাজে ফিরলেন না।

অন্যদিকে গারাস ইয়ানি পড়লেন আরেক ফাঁপরে। এক্সক্যাভেশনের কাজ তো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জাকিকে এই অবস্থায় পাওয়া যাবে না। এদিকে কাজ ফেলে রাখলে মরুভূমির ধুলো বালিতে আবার একটু একটু করে পাথর ঢাকা পড়ে যাবে। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই ইয়ানি খুঁজে বার করলেন আরেকজন আর্কিওলজিস্টকে, কামাল এল মালাখ।

কামাল ইয়ানির সাথে মিলে পাথরের চাঁইয়ের কোণের দিকের একটা ছোট টুকরো ভেঙে ফেললেন। তারপরে নিজের ব্যাগে থাকা দাড়ি কামানোর ছোট আয়নাটা দিয়ে সূর্যের আলো ফেললেন পাথরের নিচের গহবরে। আর সাথে সাথেই চমকে উঠলেন! খুব সামান্য আলোতেই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে একটা কাঠের তৈরি দাঁড়!! কামালের বুঝতে বাকি রইল না যে এই লম্বা গর্তটা কি ঐশ্বর্য

খুফুর নৌকার গর্তের পাশে
কামাল-এল-মালাখ

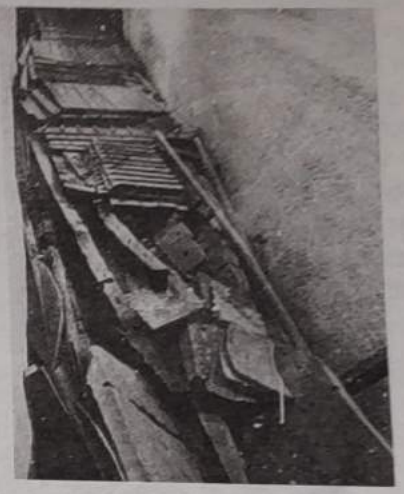

যে অবস্থায় নৌকাটাকে
খুঁজে পাওয়া যায়

লুকিয়ে রেখেছে! চার হাজার বছর পুরনো একটা নৌকা!

খ্যাতির লোভ মারাত্মক বুঝলে। এই আবিষ্কারের সাথে সাথেই সেই দিন রাতেই কামাল নিউ ইয়র্ক টাইমসকে একটা ইন্টারভিউ দিয়ে দেন। তাতে বলে দেন যে খুফুর নৌকার আবিষ্কর্তা তিনি একাই! মহম্মদ জাকির নাম বেমালুম চেপে গেলেন কামাল। আর যেদিন এই মিথ্যে কথাটা বলছেন সেদিনই নিজের মেয়ের কবর দিচ্ছেন জাকি। তবে সত্যিটা কয়েকদিনের মধ্যেই সামনে আসে। কামালকে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়।

যাই হোক। এই ঘটনার কয়েকদিন পর থেকেই ওই গর্ত থেকে বোটটা বার করার কাজ শুরু হয়। তবে নৌকাটার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ১,২২৪ টা সিডার কাঠের টুকরো পাওয়া গেল। আর কিছু প্রায় নষ্ট হতে বসা কাপড় আর দড়ি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেখানে একটাও লোহার পেরেক পাওয়া যায়নি। মিশরীয়রা মাটির নিচ থাকা খনিজ লোহার সন্ধান তখনও পায়নি। যেটুকু লোহা পাওয়া যেত সেটা আকাশ থেকে এসে পড়া উল্কা থেকে। তাই ওদের কাছে লোহা ছিল খুব দুর্লভ আর পবিত্র বস্তু। কাঠের খাঁজে কাঠ লাগিয়ে আর জায়গায় জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধেই নৌকা বানানো হত।

তবে এত বড় একটা আবিষ্কারের পরেও সবার মনে একটা চিন্তা রয়েই গেল। এই বারোশো টুকরোর জিগ-স পাজল জুড়ে আসল নৌকা বানাবে কে? গোটা মিশরে এমন একটাই মাত্র মানুষের সেই ক্ষমতা ছিল। সেই লোকটা যে..

বুঝেছি বুঝেছি! যে রানী হেতেফেরিসের সমাধির আসবাব পত্রগুলোর রেস্টোরেশন করেছিল তো! কী নাম যেন..

- বাহ! তোমাদের মনে আছে দেখছি! লোকটার নাম আহমেদ ইউসুফ। ওঁকেই ডেকে আনা হল। প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেলেও পরে আহমেদ এই চ্যালেঞ্জটা নেন। তার পরেই শুরু হয় ওর একটা নতুন জীবন। তিন মাস ধরে কায়রোর নৌকা তৈরির কারখানায় গিয়ে কাজ শেখেন। তার পরে ওই ১,২২৪ টা টুকরোর প্রতিটাকে আলাদা করে মার্ক করে ছোট ছোট নৌকার রেপ্লিকা বানাতে থাকলেন। তারপরে হাত দিলেন আসল কাজে। যে যে টুকরোগুলো নষ্ট হয়ে গেছিল অবিকল সেই মাপের কাঠের টুকরো বানালেন। ২০ বছর ধরে চলল খুফুর নৌকা জোড়া লাগানোর কাজ। একজন রেস্টোরার হয়ে গেলেন একজন বোট বিল্ডার। কাজ যখন শেষ হল তখন সেই বিশাল নৌকা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল! প্রায় ৪৫ মিটার লম্বা। দুপাশে সারি দিয়ে রাখা দাঁড়। নৌকার একপ্রান্তে কাপড় দিয়ে মোড়া একটা ছাউনি। নৌকার নিচের দিকের কাঠে আর দাঁড়গুলোতে এমন ক্ষয়ের দাগ স্পষ্ট যা কিনা জল থেকেই হতে পারে।

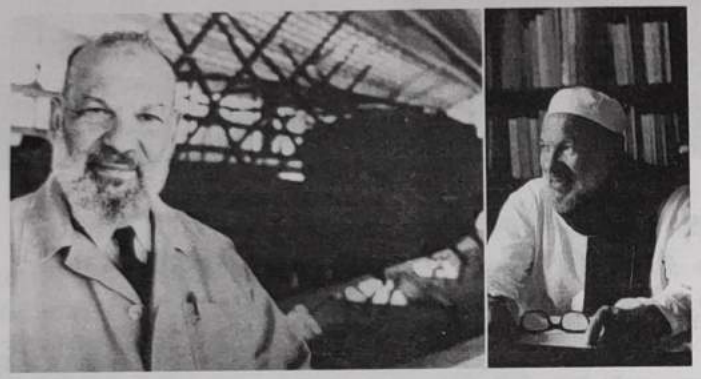

আহমেদ ইউসুফ

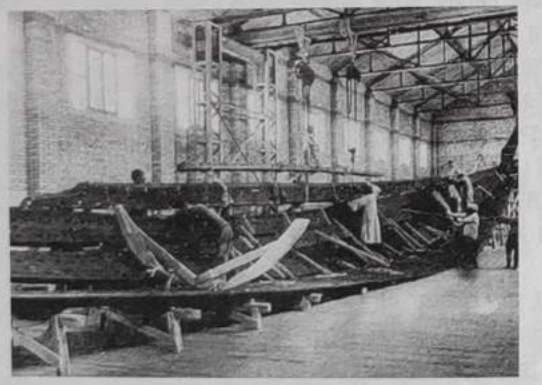

খুফুর নৌকাকে জোড়া লাগানোর কাজ যখন চলছে

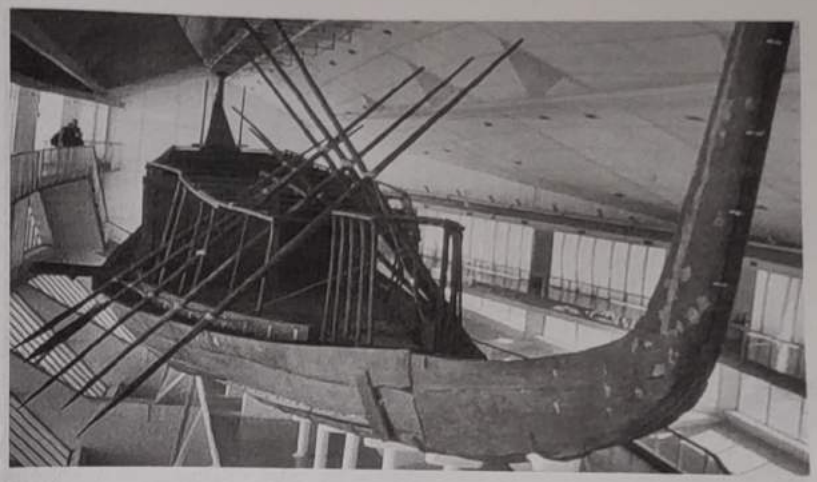

খুফুর প্রথম নৌকা, এখন যেমন

- মানে খুফুর নৌকা একসময় নীলনদের জলেও চলেছিল !!
- খুব সম্ভবত তাই। তবে এটাকে ঠিক খুফুর নৌকা বলাটা হয়ত ঠিক হবে না। ছেলে দেজেফ্রে মৃত বাবার উদ্দেশ্যে এই নৌকা দান করেছিলেন। তবে খুফুর নিজের নৌকাও পাওয়া গেছে ১৯৮৭ সালে। সেই গল্পও বেশ মজার।

টোকিওর ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে আসা জাপানীজ আর্কিওলজির একটা দল আরেকটা চুনাপাথর চাপা দেওয়া প্রায় একই রকম আকারের একটা গর্তের সন্ধান পায়। সেই গর্তটা আবার ১৯৫৪ সালে খুঁজে পাওয়া গর্তটার পাশেই ছিল। তাই ওরা মোটামুটি বুঝেই গেছিলেন যে এখানেও আরেকটা নৌকাই আছে। তবে এবারে আগের বারের থেকেও সাবধানে কাজ শুরু করা হয়। চারহাজার বছরের পুরোনো বাতাসে বদ্ধ থাকা নৌকার কাঠের টুকরোগুলো দুম করে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে আরো ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। তাই আর্কিওলজিস্টরা এবারে পাথরের গায়ে খুব ছোট্ট একটা ফুটো ড্রিল করে বানিয়ে সেখানে ঢোকালেন একটা এন্ডোস্কোপ। আর কী দেখতে পেলেন বলো তো?

- কী আবার? নৌকা?
- ধুস, ওরা দেখলেন একটা মাছি!
- অ্যাঁ, জ্যান্ত মাছি! অত হাজার বছর ধরে বেঁচে ছিল!
- না রে বাবা, চুনাপাথরের স্ল্যাবটা এক এক জায়গায় ভঙ্গুর হয়ে নিজে থেকেই ছোট ছোট গর্ত তৈরি হয়েছিল। সেই গর্ত দিয়ে ঢুকে ভিতরে মাছি আর পিপড়ে আস্তানা গেঁড়ে ছিল। সম্প্রতি পাথরের স্ল্যাবগুলোকে সরিয়ে ফেলে ভিতরের নৌকার টুকরোগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। সেগুলো জোড়া লাগানোর কাজ এখনও চলছে। আর সেই গর্ত থেকেই একটা পাথরে ফারাও খুফুর নাম খোদাই করা পাওয়া গেছে। সম্রাট নিজের সমাধির জন্যই বানিয়েছিলেন এই নৌকাটা।

একটানা এতটা বলার পরে এবারে চামচ দিয়ে গ্লাসের ভিতরে থাকা ডাবের শেষ শাঁসের টুকরোটা তুলে মুখে পুরে দিয়ে ভবেশদা পিজির দিকে তাকাল,
তাহলে বুঝলে পিজি ভায়া, এই জন্যই বলেছিলাম খুফুর নৌকা একটা নয়, দুটো। আর এই গল্পটা তুমি ইন্টারনেট খুঁড়ে ফেললেও পেতে না।
- তাহলে আপনি এগুলো জানলেন কী করে?
- বই, বইয়ের বিকল্প কিছু হয় না কি? যাক গে, আজকে খুফুর নৌকার কথা শুনলে, জানলে নৌকা করে মৃতের অন্য জগতে পৌঁছনোর কথা। কিন্তু একটা বাঙালী মেয়ে তার জীবদ্দশাতেই ভেলায় চড়ে এরকম একটা নদী বেয়েই পৌঁছে গিয়েছিল স্বর্গের দ্বারে। কে বলোতো?
- বাঙালী? মেয়ে? এরকম তো আগে শুনিনি!
- শুনেছ, কিন্তু ভুলে গেছ। মনসামঙ্গল কাব্য হয়ত ভুলে যেতেই পার, কিন্তু সুমনকে ভুললে কি করে?
বলেই ভবেশদা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল,
"কাল কেউটের ফনায় নাচছে লখিন্দরের স্মৃতি,
বেহুলা কখনও বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি..."

১০

রোসেটার পাথর

আগের উইকএন্ডে বাড়ি গিয়েছিলাম। সোমবার তেমন কোনও ভাল ক্লাস ছিল না। তাই সেদিনও দিনের বেলাটা বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যখন হোস্টেলের ঘরে ঢুকলাম দেখি ভবেশদা পিজির সাথে বসে চা আর তেলেভাজা খাচ্ছে। পিজি আমাকে দেখেই বলল,
- এই দ্যাখ, একদম ঠিক টাইমে এসে গেছিস, ভবেশদা গরমাগরম বেগুনি নিয়ে এসেছে। ঝটপট বসে পড়।
তেলেভাজা আবার ছাড়া যায় নাকি! আমি প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়তে যাচ্ছিলাম আর তখনই ভবেশদা বলল,
- টি শার্টটা তো বেশ। কোথা থেকে জোগাড় করলে এটা?
- মামা ইজিপ্টে বেড়াতে গিয়েছিল বলেছিলাম না। ওখান থেকে এনে দিয়েছে।
গোলগলা টি-শার্টটাতে সাদার ওপরে কালো দিয়ে হায়রোগ্লিফিক অক্ষর প্রিন্ট করা ছিল। আমাদের চলমান মিশরীয় এনসাইক্লোপিডিয়ার চোখ এড়ায়নি সেটা। ভবেশদা আমাকে দাঁড় করিয়ে টি-শার্টটার ওপরে ঝুঁকে এল। মিনিটখানেক খুঁটিয়ে দেখার পরে বলল,
- ধুস, তোমার মামাকে বেকার জিনিস গছিয়েছে। হায়রোগ্লিফিক অক্ষর আছে। কিন্তু এলোমেলো। এগুলোর কোন মানে নেই।
পিছন থেকে পিজি বলল,
- আপনি হায়রোগ্লিফ পড়তে পারেন?
- হুঁ, খুব সামান্য। হায়রোগ্লিফ পড়া কি অত সহজ হে পিজি ভাই। এর রহস্য উদ্ধার করার জন্য কত মানুষ কত রাত জেগেছে জানো?
- হ্যাঁ, শুনেছিলাম খুব কঠিন ভাষা নাকি এটা।
- হ্যাঁ, সত্যি খুব কঠিন। সে কথায় পরে আসছি। আগে যে লোকটার জন্য শুধু হায়রোগ্লিফ না, গোটা মিশর দেশটাকেই পৃথিবীর মানুষ চিনল তার কথা বলি। কয়েকটা হিন্টস দি তোমাদের, দেখি পারো কি না,
লোকটার হাইট ৫ফুট ৭ ইঞ্চি, যুদ্ধবাজ, প্রায় গোটা ইউরোপ দখল করে ফেলেছিলেন, কিন্তু বিড়ালকে ভয় পেতেন, সত্যজিত রায় যে লিজঁ দি অঁর পেয়েছিলেন সেটা ইনি চালু করেছিলেন।
আমরা দুজনেই মাথা চুলকোলাম একটু, ভবেশদা এবারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
- তোমাদের দেখলে মাঝে মাঝে মনে হয় উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছি। ওকে আরো দুটো শব্দ বলছি, দেখো পারো কি না এবারে। ওয়াটারলু, সেন্ট হেলেনা।

- নেপোলিয়ন বোনাপার্টে!
- এই তো হয়েছে এবারে। স্কুলের ইতিহাস বইয়ের বাইরে আর কোনদিন কিছু পড়নি বুঝতেই পারি।

নেপোলিয়ন

ভবেশদার কথা গায়ে মাখলে চলে না, আমি বললাম,
- কিন্তু নেপোলিয়নের সাথে ইজিপ্টের কী সম্পর্ক?
- ওই লোকটাই তো সব কিছুর উৎস!
- মানে?
- গুছিয়ে বলি শোনো। সালটা ১৭৯৮, নেপোলিয়ন তখন ফ্রেঞ্চ অ্যাডমিরাল জেনারেল। হঠাৎ করে ওঁর মাথায় একটা ইচ্ছা চাপল। আলেকজান্ডার ছিল ওর ছোটবেলাকার হিরো। সেই আলেকজান্ডারের পথ অনুসরণ করবেন। ইজিপ্ট দখল করতে হবে।
- আচ্ছা এই হল নেপোলিয়নের মিশরে আসার কারণ।
- এইটা ছাড়াও আরেকটা কারণ ছিল যদিও। নেপোলিয়নের ফন্দি ছিল ইজিপ্ট দখল করে সুয়েজের মধ্যে দিয়ে ক্যানাল বানিয়ে রেড সীতে এসে পড়া। সেখান থেকে আরব সাগরের পথ ধরে এশিয়ার একটা দেশে আসা।
- কোন দেশ?
- যে দেশে এখন আমরা বসে আছি।
- বলেন কী! নেপোলিয়ন ভারতে আসার চেষ্টা করেছিলেন?! কিন্তু কেন?

- কারণটা খুব সহজ। ভারত তখন ব্রিটিশদের অধীনে। নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল দেশের এক রাজার সাথে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশদের ভারত থেকে উৎখাত করা। এতে ব্রিটিশদের শক্তি কমত। ইউরোপেও ওদের হারানো সহজ হয়ে যেত। এবারে দেশের কোন রাজার সাথে নেপোলিয়ন হাত মেলাবার কথা ভেবেছিলেন সেটা দেখো পিজি ভাই কেমন চট করে বলে দেবে।
ভবেশদা এবারে পিজির দিকে তাকিয়ে বলল,
- তোমাদের ছোটবেলায় দুরদর্শনে এঁকে নিয়ে খুব বিখ্যাত একটা সিরিয়াল হয়েছিল। এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সঞ্জয় খান। একবার সেটে আগুন লাগার জন্য এর শুটিং তিনবছর পিছিয়ে গিয়েছিল।
- হেঁ হেঁ, বুঝে গেছি, টিপু সুলতান।
- ওই দেখো, বল কোর্টে পড়ার সাথে সাথে ফোরহ্যান্ড স্ম্যাশ মেরেছে ছেলে। টিপু সুলতানকে নেপোলিয়ন নাকি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির কী হয়েছিল সেটা আজও কেউ জানে না। তো যাই হোক, আগের কথায় ফিরে আসি।
- হ্যাঁ, নেপোলিয়নের ইজিপ্টে আসা।
- ঠিক, পয়লা জুলাই, ১৭৯৮তে কয়েকশো রণতরীতে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন ইজিপ্টের উত্তরদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে পৌঁছলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার শহর দখল করার পরে ফ্রেঞ্চ আর্মি ধীরে ধীরে কায়রোর দিকে এগোতে লাগল। বিখ্যাত গিজার যুদ্ধে তারা সেই সময়ের শাসক মামলুকদের হারিয়ে কায়রোর দখলও নিল। যাকে এখন বলে ব্যাটেল অফ দা পিরামিডস। ২১শে জুলাই কায়রো ফ্রেঞ্চদের হাতে এল। কিন্তু নেপোলিয়নের গোটা ইজিপ্ট দখল করার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। মরুভূমির প্রচন্ড গরমের মধ্যেই অনেক সৈন্যর মৃত্যু হয়। অনেক মারা যায় পেট খারাপে আর প্লেগে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সৈন্যরাও চলে আসে ইজিপ্টে। খুফুর পিরামিডের গল্প বলার সময় অ্যাডমিরাল নেলসনের কথা বলেছিলাম মনে আছে?
- হ্যাঁ ক্রিকেটে ১১১ যার নামে।

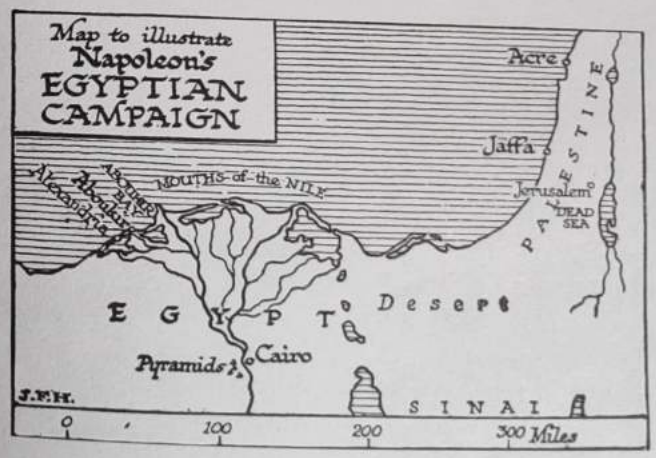

নেপোলিয়নের মিশরে আসার পথ

- কারেক্ট, এই অ্যাডমিরাল নেলসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ন্যাভাল ফোর্স ফ্রেঞ্চদের প্রায় সব কটা রণতরী ধ্বংস করে ফেলে। ১৮০১ সালে ফ্রেঞ্চরা হার মানে ব্রিটিশদের কাছে। নেপোলিয়ন যদিও তার অনেক আগেই ফ্রান্সে পালিয়ে এসেছিলেন। ব্রিটিশদের জাহাজে করেই শেষমেশ ফ্রান্সে ফেরে মাত্র ১০০০ জন সৈন্য। নেপোলিয়নের আর সুয়েজ খাল কেটে ভারতে পৌঁছানো হয়নি। সেটা হলে আমাদের ইতিহাসটা অন্যরকম হত।

ব্যাটেল অফ দা পিরামিডস

মিশরে নেপোলিয়ন

- কিন্তু আপনি বলেছিলেন নেপোলিয়নের জন্যই পৃথিবীর মানুষ প্রাচীন মিশরকে চিনেছিল। সেরকম তো কিছু পেলাম না এতে।

- সেই কথাতেই আসছি এবারে, নেপোলিয়ন তো শুধু সৈন্য সামন্ত নিয়েই ইজিপ্টে আসেননি। ওঁর সাথেই এসেছিল ১৬৭ জন স্কলার। তাদের মধ্যে ছিল ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়র, ডাক্তার, বোটানিস্ট, আর্কিওলজিস্ট, ইন্টারপ্রিটার, কেমিস্ট,জুলজিস্টরা। এদের কাজ ছিল মিশরের মাটিতে যা কিছু পাওয়া যাবে সেগুলোর পরীক্ষা করা, এক জায়গাতে নোট করা। আর তাদের হস্তগত করা দেশের জন্য। এরা মিশর থেকে অজস্র মূর্তি, প্রত্নসামগ্রী আর প্যাপিরাস নিয়ে দেশে ফেরে। যেগুলো ফ্রান্সে সাড়া ফেলে দেয়। সবার তখন এই অদ্ভুত দেশটা নিয়ে আগ্রহ, যেখানে নাকি বিশাল উঁচু পিরামিড আছে, অদ্ভুত দেখতে স্ফিংস আছে আর আছে মমি! মৃত মানুষের শরীরকে নাকি ওরা বাঁচিয়ে রাখে! ফ্রান্সের সব কটা বড় খবরের কাগজে এগুলো প্রথম পাতায় চলে আসে। সেখান

থেকে বাকি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে আর সময় লাগেনি। মানুষ সেই প্রথম চিনল অনেক দূরের একটা দেশকে। দেশে ফিরে আসার পরে এই স্কলাররাই একটা বিশাল বই প্রকাশ করেন। নাম 'দেস্ক্রিপশন দি ইজিপ্তে' । নটা ভল্যুমের টেক্সট, আবার ১১টা ভল্যুম শুধু ছবির জন্য! মিশর দেশটার হেন কোন জিনিস নেই যা এর মধ্যে ছিল না। তবে সবারই একটা জায়গাতে গিয়ে মুশকিল হল।

- সেটা কি?

ভবেশদা কচরমচর করে বেগুনি চেবাতে চেবাতে বলল,

- যা কিছু পাওয়া গেছিল মিশরে তার সবেতেই একটা অদ্ভুত লিপিতে লেখা। অন্য সবরকম লিপির থেকে একদম আলাদা। ছোট ছোট ছবি ওপর থেকে নিচে নয়ত পাশাপাশি আঁকা । সাপ, পালক,পাখি, সূর্য... কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না এর মানে। আবার এর অর্থ উদ্ধার না করা গেলে তো দেশটার ইতিহাসই অধরা থেকে যাবে!

- বুঝেছি, হায়রোগ্লিফের কথা বলছেন।

- হুম, হায়রোগ্লিফ শব্দটা হল গ্রীক, যার মানে খোদাই করা পবিত্র অক্ষর। মিশরের খুব হাতে গোনা কয়েকজনই এই লিপির ব্যবহার জানতো। তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল পুরোহিত। এরা আর কাউকে এই বিদ্যা শেখাতেন না। তাই ফারাওদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে হায়রোগ্লিফ জানা মানুষও একসময় পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। হায়রোগ্লিফ একটা লিপি যার সাথে আশেপাশের আর কিচ্ছুর মিল নেই। সাধারণত কোনও নতুন লিপি উদ্ধার করার সময় তার কাছাকাছি থাকা অন্য কোনও লিপির সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এইখানেই একটা বড় আবিষ্কারের কথা লুকিয়ে আছে। একটা কালো পাথরের টুকরো।

- পাথর?!

- হ্যাঁ। রোসেটা স্টোনের নাম শুনেছ?

- না তো।

- তাহলে সেই গল্পটা ঝট করে বলে দিই, সালটা ১৭৯৯, ব্রিটিশ ন্যাভাল আর্মি তখন ফ্রেঞ্চ দের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে। তাই ফ্রেঞ্চরা চেষ্টা করল সমুদ্রের উপকূলগুলোতে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে। রোসেটা হল এমনই একটা জায়গা, নীলনদ যেখানে ভুমধ্যসাগরে এসে মিশেছে সেখানকার একটা পুরনো পরিত্যক্ত শহর। ফ্রেঞ্চ অফিসার জ্যাভিয়ার পকার্ডের ওপরে দায়িত্ব পড়ল এই রোসেটাতে একটা আর্মিবেস তৈরি করার। ওখানে মামলুকদের আমলের একটা ভেঙে পড়া প্রাসাদ ছিল, সেটাকেই সারিয়ে নিয়ে একটা আর্মি ব্যারাক আর ওয়াচ টাওয়ার বানাতে আরম্ভ করলেন পকার্ড। কাজ ভালই চলছিল। কিন্তু ১৯শে জুলাই একজন ফ্রেঞ্চ সৈন্য সেই ভাঙা প্রাসাদের ভিতরের দিকে একটা ঘর পরিষ্কার করার সময় দেখতে পেল একটা মাঝারি মাপের পাথরের চাঁই পড়ে আছে। তার ওপরের আর নিচের দিকটা ভাঙা। আশেপাশের আবর্জনা সরিয়ে ফেলার পরে গোটা পাথরটা সামনে এল। সাথে সাথে খবর গেল পকার্ডের কাছে। পকার্ড একনজরে পাথরটাকে দেখেই বুঝেছিলেন এর গুরুত্ব। চকচকে মসৃন কালো রঙ, লম্বায় তিনফুট, প্রস্থে দু ফুট, আর প্রায় দশ ইঞ্চি মোটা বেশ ভারী পাথর। তার গায়ে খোদাই করা তিনরকমের লিপি। একটা হায়রোগ্লিফ, একটা ডিমোটিক, যে ভাষা দেশের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত। আরেকটা হল গ্রীক।

- গ্রীক!

হ্যাঁ, এতে অবাক হওয়ার তো কিছু নেই। গ্রীকরা বেশ কয়েকশো বছর রাজত্ব করেছিল মিশরে।

তবে তাদের সময়কার কোনও লেখা এতদিন পাওয়া যায়নি। এই প্রথম এমন কিছু পাওয়া গেল

যেখানে হায়রোগ্লিফের লিপিগুলোকে গ্রীক লিপির সাথে মেলানো যাবে! পকার্ড সাথে সাথে খবর পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্সে। সেখানকার খবরের কাগজ গুলোতে বড় করে বেরোলো রোসেটা স্টোনের কথা। সবাই এবারে আশায় বুক বাঁধল। এবারে দুর্বোধ্য হায়রোগ্লিফের মানে উদ্ধার করা যাবে!

- দাঁড়ান দাঁড়ান!

শেষ কয়েক মিনিট দেখছিলাম পিজি মোবাইলে কী একটা দেখছে। মোবাইলটা এবারে আমার হাতে দিতে দিতে বল,

- এই দেখো, রোসেটা স্টোন কেমন দেখতে, কিন্তু ভবেশদা এখানে তো বলছে যে পাথরটা এখন আছে লন্ডনে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে!

- হ্যাঁ তাই তো।

- কিন্তু আপনি যে বললেন...

- ফ্রেঞ্চদের হাত থেকে ব্রিটিশদের কাছে কি করে এল তাই ভাবছ তো? এটাও একটা মজার গল্প, একটু আগেই বললাম যুদ্ধে হেরে গিয়ে ফ্রেঞ্চদের ব্রিটিশ জাহাজে করেই দেশে ফিরতে হয়েছিল। তো এই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন জেনারেল হাচিনসন। ইনি একটা অদ্ভুত জেদ করে বসেন। তার হাতে পাথরটা দিয়ে তবেই ফ্রেঞ্চরা জাহাজে উঠতে পারবে। তার আগে না। হাচিনসনের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না এই পাথরটার ব্যাপারে। শুধুমাত্র চকচকে কালো রঙের জন্য ইনি প্রায় জোর করেই রোসেটা স্টোনকে কেড়ে নেন ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে। তাই এই পাথরের ঠাঁই হয় ইংল্যান্ডে। ইজিপশিয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টিকুইটি এখন অনেক চেষ্টা চালাচ্ছে পাথরটাকে মিশরে ফেরত আনার। কিন্তু মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ একটা অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছে। পাথরটাকে ওরা মিশরের মাটিতে পায়নি, পেয়েছে ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের হাত থেকে। তাই মিশরে ওটাকে ফেরত পাঠাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

- ঠিক এমনটাই আমাদের কোহিনুরের সাথেও হয়েছে তাই না?

- একদম তাই, কোহিনুরের মতই রোসেটা স্টোনও যে তার উৎসে কোনোদিন ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না।
- তাহলে এই পাথর থেকে হায়রোগ্লিফের রহস্যের সমাধান হয়েছিল কি?
- সেটা হয়েছিল, কিন্তু তাতে লেগেছিল আরো ২৩ বছর! আর যে লোকটা হায়রোগ্লিফের মানে উদ্ধার করেছিলেন সে কোনোদিন পাথরটাকে নিজের চোখে দেখার সুযোগও পাননি!
- বলেন কী?!
- হ্যাঁ ভাই। ইতিহাস বার বার আমাদের অবাক করে, তাই না!

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আগে যেভাবে ছিল রোসেটার পাথর

১১

ঈশ্বরের লিপির রহস্য (প্রথম পর্ব)

- আচ্ছা ধরো তোমার কাছে একটা খুব দামী বই আছে। কিন্তু সেটা জার্মান ভাষায় লেখা। তুমি পড়তেই পারবে না। তখন তুমি কী করবে?
ভবেশদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম,
- এ আবার কী, এমন বই রাখবই বা কেন যেটার ভাষা আমি জানি না।
- যদি বলি বইটা অমূল্য। পৃথিবীতে মাত্র একটাই এমন বই আছে, মলাটটা আবার সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাহলে কি রাখবে এমন বই?
পিজি ফুট কাটল এবারে,
- তখন তো আর সেটা শুধু বই থাকল না। ওরকম অ্যান্টিক জিনিস তো সবাই রাখতে চাইবে নিজের কাছে।
- ঠিক বলেছ। রোসেটা স্টোনটা পেয়ে ব্রিটিশদেরও এই একই হাল হয়েছিল। জেদ করে নিজের দেশে নিয়ে তো চলে এল। কিন্তু ওতে কি লেখা আছে সেটা বুঝতে না পারলে তো ওটা একটা দামড়া পাথরের চাঁই ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের তো বললামই পাথরের ওপরে হায়রোগ্লিফ, ডেমোটিক আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। গ্রীক ভাষাটা অনেকে পড়তে জানত। তাই লেখাগুলো কপি করার কাজ শুরু হল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রোসেটার স্টোন এখন

পিজি বলল,
- ওরে বাবা, ছবিতে দেখে যা বুঝলাম অনেকগুলো লাইন লেখা ছিল তো! একটা অচেনা ভাষার অত লেখা দেখে কপি করা কি সোজা নাকি!
- না একদমই সোজা ছিল না কাজটা, আর ওইভাবে কপি করতে গিয়ে প্রচুর ভুল ত্রুটিও হচ্ছিল। তাই এবারে অন্য পন্থা নেওয়া হল। নিকোলাস কন্তের নাম শুনেছ?
- না তো।
- এই ভদ্রলোক গ্রাফাইটের পেনসিল আবিষ্কার করেন। এই লোকটিই আবার রোসেটা স্টোনের কপি তৈরি করেন। লিপিগুলো পাথরের ওপরে খোদাই করা ছিল। এই খোদাই করা জায়গা গুলোতে গ্রিস লেপে দেওয়া হল। আর পাথরের বাকি অংশতে প্রলেপ দেওয়া হল রাবার আর নাইট্রিক অ্যাসিডের একটা মিশ্রণের। তারপরে পাথরের ওপরে কালি ঢালার পরে সেই কালি খোদাই করা জায়গাতে গিয়ে বসল। তখন একটা সাদা পাতা তার ওপরে চেপে ধরতেই সেই পাতায় গোটা লিপিটারই একটা ছাপ চলে এল। কন্তে এমন অনেকগুলো কপি তৈরি করেছিলেন। এই সব কপি গুলো ছড়িয়ে দেওয়া হল ইউরোপ আর আমেরিকার শহর গুলোতে। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ডাবলিন আর এডিনবারা ইউনিভার্সিটি পেল একটা করে কপি। একটাই আশায়, যদি কেউ এই লিপির মানে উদ্ধার করতে পারেন। তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী আর ভাষাবিদরা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ রেখে একটা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। কে আগে হায়রোগ্লিফের রহস্যভেদ করতে পারে!
- গ্রীক লেখাটার মানে উদ্ধার করা গেল না? সেটা করা গেলেই তো হায়রোগ্লিফের মানে বার করে ফেলা যেত।
- হ্যাঁ গ্রীক ভাষায় লেখা লাইনগুলোর মানে তো কয়েকজন ভাষাবিদ করেই ফেলেছিলেন। সেগুলোকে আবার ল্যাতিন আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদও করা হয় সাধারণের বোঝার জন্য। সেখান থেকেই বোঝা যায় এই পাথরে নাম লেখা আছে টলেমি বংশের রাজার।
- টলেমি?

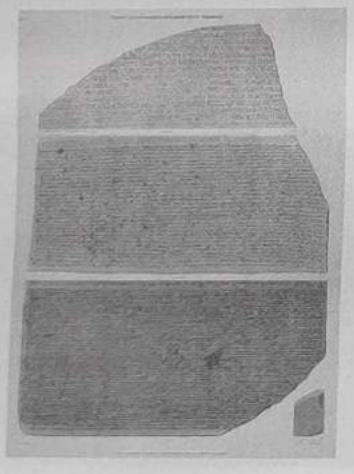

কাগজের ওপরে রোসেটা স্টোনের কপি

- হ্যাঁ, এরা জাতিতে গ্রীক ছিলেন। যীশুর জন্মের আড়াইশো বছর আগে এদের রাজত্ব ছিল মিশরে। রোসেটার পাথরে এই রাজাদেরই জারি করা আদেশ লেখা ছিল। তাই একই কথা তিনটে ভাষায় থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। গ্রীক ভাষা গ্রীকদের জন্য। সাধারণ মানুষের জন্য ডেমোটিক। অন্যদিকে রাজা হলেন ফারাও, আর ফারাওরা ঈশ্বরেরই রূপ, তাইজন্যই পবিত্র ভাষা হায়রোগ্লিফও ছিল। যারা এই লেখার মানে উদ্ধারের জন্য লড়াই করছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন যে কোন একটা লাইনে গ্রীক শব্দ কত নম্বরে আছে দেখে সেই হায়রোগ্লিফের সেই লাইনের সেই শব্দটা আইডেন্টিফাই করতে পারলেই হল। তাহলেই বোঝা যাবে যে অক্ষরগুলো কী মানে বোঝাচ্ছে। কিন্তু সেই ভাবে এগোতে গিয়ে কুল কিনারা হারিয়ে ফেললেন সবাই। অবাক হয়ে দেখলেন হায়রোগ্লিফে কোনো কোনো শব্দ শুধু একটা অক্ষরেরই। আবার কোনো শব্দে চার পাঁচটা অক্ষর। অক্ষর বলাটা অবশ্য ঠিক না। কয়েকটা ছবি যেমন সাপ, প্যাঁচা, গরু, পালক, পরপর সাজানো। সেগুলোই অক্ষর! তবে দুজন মানুষ এই লিপির মানে উদ্ধারে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছিলেন।একজন ইংল্যান্ডের, আরেকজন ফ্রান্সের।
জঁ ফ্রাঁসোয়া শাম্পোলিয়নের জন্ম হয়েছিল ১৭৯০ সালে, ফ্রান্সের ছোট্ট শহর ফিজেকে, বেশ গরীবের ঘরে। ওর বাবা ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করতেন। দশ বছর বয়স থেকে ও ওর দাদার কাছে গ্রেনোবেল শহরে থাকতে শুরু করে। ছোটবেলা থেকেই ভীষণ গোঁয়ার ছিলেন এই শাম্পোলিয়ন। অঙ্ক, বিজ্ঞান ওর ভাল লাগত না। কিন্তু নতুন নতুন ভাষা শেখার ব্যাপারে ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। মাত্র ১১ বছর বয়সেই ও ল্যাতিন, গ্রীক, আরবিক, হিব্রু আর সিরিয়াক ভাষায় লিখতে পড়তে পারতেন ইনি। গ্রেনোবেল শহরেই ওঁর হাতে আসে একটা ছোট প্যাপিরাসের টুকরো। নতুন দেখা একটা লিপির মানে বোঝার জন্য এবারে উঠে পড়ে লাগে শাম্পোলিয়ন। সেই শুরু, এর পরে প্রায় গোটা জীবনটাই কেটে যায় হায়রোগ্লিফের মানে উদ্ধারের নেশায়।

শাম্পোলিয়ন

শাম্পোলিয়নের দাদার কাছে রোসেটা স্টোনের একটা কপি ছিল। সে নিজেও শখের বশে একবার এই লিপি নিয়ে নাড়াঘাঁটা করে রণে ক্ষান্ত দেয়। তবে এই কপিটা পেয়ে শাম্পোলিয়নের একটা বড় লাভ হল। একটা ব্যাপার ও বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিল। হায়রোগ্লিফের মানে জানতে গেলে আগে মিশরের সাধারণ মানুষের ভাষা ডিমোটিককে বুঝতে হবে। সেই কাজটা করতেই কয়েক বছর কেটে গেল। সারা দিনরাত এক করে একটাই কাজ করে যেতে লাগল শাম্পোলিয়ন। অবসাদও কম হত না সেই সময়। মনে হত যদি অন্য কেউ তার আগে হায়রোগ্লিফ পড়ে ফেলে! তাহলে তো এত খাটনি সব জলে যাবে।

- হ্যাঁ, আপনি তো বললেন আরো অনেকেই এটা নিয়ে কাজ করছিল।

- হ্যাঁ করছিল তো অনেকেই। কিন্তু শাম্পোলিয়নের মতোই বাকিদের থেকে এগিয়ে ছিল আরেকটি মাত্র মানুষ। সেই লোকটা আবার ব্রিটিশ।

ডঃ থমাস ইয়ং, একটা লোক যে চিকিৎসক ছাড়াও ছিলেন একজন নাম করা বিজ্ঞানী, অ্যাস্ট্রোনমার আর মিউজিশিয়ান! শাম্পোলিয়নের মতোই এও অন্তত পাঁচটা ভাষা লিখতে পড়তে পারতেন অনায়াসে। ইনি কিন্তু হায়রোগ্লিফের চল্লিশখানা চিহ্নের মানে বার করে ফেলেছিলেন ! ওর এই আবিষ্কার শাম্পোলিয়নকে অনেক সাহায্য করেছিল। দুজনেই দুজনের কাজের ব্যাপারে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন। চিঠির আদান প্রদান চলত। কিন্তু একটা চাপা প্রতিযোগিতাও ছিল। তবে ডঃ ইয়ংয়ের কাছে এই কাজটা ছিল একটা হবির মতো। অন্যদিকে শাম্পোলিয়নের কাছে এটাই ছিল সবকিছু।

এই একটা কাজের নেশাতে শাম্পোলিয়ন নিজের জীবনটাকেই ভুলতে বসেছিলেন। শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছিল, সারাদিন একটা ঘরে নিজেকে বন্দী করে রাখতেন। প্রতিবেশীরা ওকে পাগল ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৮২১ সালের শেষের দিকে ওঁর কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ৩০০ টা হায়রোগ্লিফের চিহ্নের মানে বার করতে পেরেছিলেন শাম্পোলিয়ন। সেগুলোকে সাজিয়ে শব্দ বানানোও শিখে গিয়েছিলেন।

১৮২২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। সেই দিন যেদিন শাম্পোলিয়ন এতদিনের সাধনার ফল পেলেন। আবু সিম্বেলের মন্দিরের নাম শুনেছ?

- না তো।

- বাঙালীর ইজিপ্টের জ্ঞান পিরামিড, মমি আর তুতানখামেনেই শেষ হয়ে যায়। তোমরাও তেমনই। আবু সিম্বেলের মন্দির বানিয়েছিলেন ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস। হাজার বছর ধরে এই মন্দির মরুভূমির বালির তলায় চাপা পড়েছিল। এর আবিষ্কার নিয়ে একটা দারুণ গল্প আছে! পরে কোনও একসময় মনে করিয়ে দিও। বলব'খন।

তো এখন যেটা বলছিলাম, ১৮২২ সালের ওই দিন শাম্পোলিয়নের হাতে আসে আবু সিম্বেল মন্দিরের গায়ে খোদাই করা হায়রোগ্লিফের কপি। সেই কপি হাতে পেয়েই শাম্পোলিয়ন চমকে উঠলেন! অনেকগুলো শব্দ তো উনি বেশ ভাল মতোই পড়তে পারছেন! এর জন্য তো আর অন্য কোনো ভাষার সাহায্য লাগছে না। তাহলে ও সত্যিই হায়রোগ্লিফের রহস্যভেদ করে ফেলেছেন! তুমুল উত্তেজনা আর আনন্দের চোটে "পেয়েছি পেয়েছি" বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেন শাম্পোলিয়ন। কাছেই ছিল ওর দাদার অফিস। সেখানে পৌঁছে দাদাকে খবরটা দিয়েই অজ্ঞান হয়ে যান। এত দিনের পরিশ্রমের ধকল আর শরীর নিতে পারেনি।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮২২ সালে প্যারিসের অ্যাকাদেমি অফ ইন্সক্রিপশন থেকে শাম্পোলিয়নের একটা পেপার পাবলিশ করা হয়। বাকিটা ইতিহাস। ওই পেপার আরো আরো অনেক ভাষায়

ট্রান্সলেটেড হয়ে ছড়িয়ে পরে সারা পৃথিবীতে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে শাম্পোলিয়নই প্রথম যে হায়রোগ্লিফকে পুরোপুরি জেনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে শাম্পোলিয়নের ব্যস্ততা তখন তুঙ্গে। ও তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হায়ফোগ্লিফের লিপির মানে উদ্ধারে ব্যস্ত। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সেই প্রথম মানুষের সামনে এল। ধরা দিল ওদের আচার, ব্যবহার,দর্শন, পুরাণ সব কিছু। ১৮২৬ সালে শাম্পোলিয়নকে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামের ইজিপ্সিয়ান কালেকশনের কিউরেটর করে দেওয়া হয়। কায়রো মিউজিয়ামের পরে সব চেয়ে বেশি ইজিপ্সিয়ান প্রত্নসামগ্রী আছে এই ল্যুভর মিউজিয়ামেই।

যে মানুষটা নিজের গোটা জীবনটা ইজিপ্টকে দিয়েছিলেন ১৮২৮ সালে সেই শাম্পোলিয়ন মিশরে যান। সেই প্রথম আর শেষ বারের মতো। অবাক হয়ে দেখেছিলেন গিজার পিরামিড। আর আবু সিম্বেলের সেই মন্দির যার গায়ের হায়রোগ্লিফের ছবি টুকুই শুধুমাত্র তার কাছে ছিল।

কিন্তু এত বছর ধরে নিজের শরীরের ওপরে করা অযত্নের মাশুল দিতে হল শাম্পোলিয়নকে। ৪ঠা মার্চ ১৮৩২ সালে ব্রেন স্ট্রোকে মারা গেলেন শাম্পোলিয়ন। তার আগে ভুগেছিলেন ডায়াবেটিস, গাউট, কিডনির রোগে। ওঁর শেষ কাজ ছিল হায়রোগ্লিফের ব্যাকরণের বই। যেটা বেরোয় ও মারা যাওয়ার পরে।

একটানা এতটা বলে ভবেশদা দ্বিতীয় রাউন্ডের চা-টা একটা লম্বা চুমুকে শেষ করল। আমি আর পিজি হাঁ করে দারুণ একটা মানুষের অধ্যবসায়ের গল্প শুনছিলাম এতক্ষণ ধরে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এবারে করতেই হত।

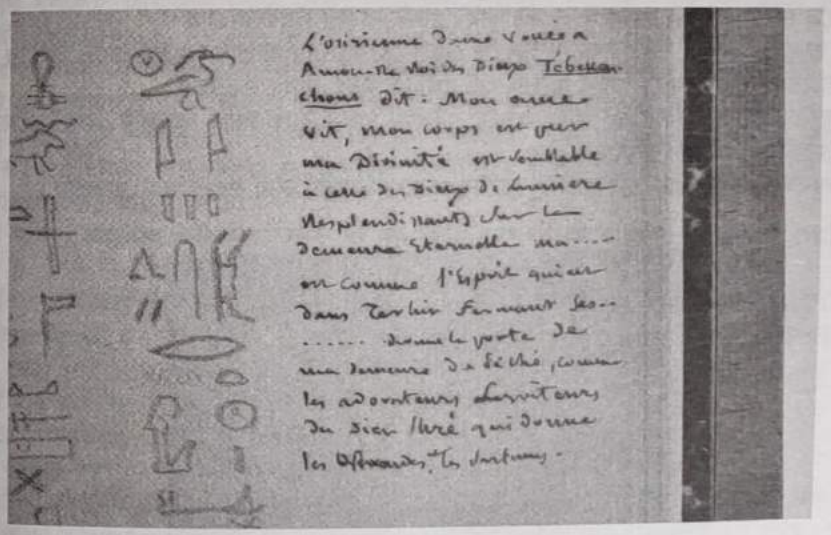

শাম্পোলিয়নের নোটবইয়ের পাতা

- ভবেশদা একটা কথা বলুন, হায়রোগ্লিফের মানে আবিষ্কারের ইতিহাস তো শুনলাম। কিন্তু হায়রোগ্লিফ কী করে পড়তে হয় সেটা তো বললেন না।

- বলব ভায়া। আমি যতটুকু জানি না হয় বলব। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল তো।
পিজি বলল,
- এখনই তো সাড়ে এগারোটা বাজে। কি করবেন আর বাড়ি গিয়ে। একটা ফোন করে বলে দিন আজ আর ফিরবেন না। ব্যস মিটে গেল।

- বাড়িতে প্রাণী বলতে তো আমি একাই ভাই। ফোন করার দরকার নেই।
- বাহ! তাহলে তো খুব ভাল! আমাদের সাথে মেসে খেয়ে নিন। আপনি না হয় রাতে আমার খাটে শুয়ে পড়বেন। আমি আর স্পন্দন একটা খাট শেয়ার করে নেব। নো চাপ।
মেস থেকে খেয়ে এসে আমরা যখন আবার বসলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা। গোটা মেসটাই তখন একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়ছে।
আর তখনই আমরা সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো একটা ভাষা শেখা শুরু করলাম।

ফিজেক শহরের শাম্পোলিয়নের মিউজিয়ামে রোসেটা স্টোনের বিশাল রেপ্লিকা

১২

ঈশ্বরের লিপির রহস্য (দ্বিতীয় পর্ব)
হায়রোগ্লিফে লিখতে শেখা

- হায়রোগ্লিফ শিখতে তোমাদের বেশি সময় লাগবে না, তোমাদের জেনারেশনটা ওইদিকেই এগোচ্ছে.. না না এগোচ্ছে না, বলা ভাল পিছিয়ে যাচ্ছে।
মেস থেকে ডিনার করে ঘরে ফিরে পিজির টেবিলে রাখা হাজমোলার শিশিটা খুলে দুটো ট্যাবলেট মুখে পুরে ছিল ভবেশদা। পুরেই ডান চোখ কুঁচকে মুখে টাক্ করে একটা শব্দ করল। তারপরে পিজির খাটটায় বসতে বসতে বলল কথাগুলো।
আমি বললাম,
- সুযোগ পেলেই আমাদের খোঁটা দেন। কিন্তু হায়রোগ্লিফিক বোঝার সাথে এই জেনারেশনের মিল নেই কোনো।
- কে বলল মিল নেই! আলবাত আছে! হায়রোগ্লিফের গোটাটাই হল ছবি দিয়ে কথা বলার চেষ্টা। তোমরা তো আজকাল তাই করছ। হোয়াটস্যাপে ফেসবুকে দেখি এখন ইমোজির ছড়াছড়ি। 'দুঃখ পেলাম' এই দুটো শব্দ না লিখে এখন স্যাড ফেস পাঠাও। 'ভাল লাগল' এইটা বলতে কষ্ট হয়, লাইক করো। দিনকে দিন দেখছি আবেগগুলো ন্যারো হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তো ওই প্রাচীন যুগেই ফিরে যাচ্ছ একটু একটু করে।
অকাট্য যুক্তি। অতএব এই নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভাল। পিজিও মনে হয় বুঝতে পেরেছিল সেটা,
- আপনি কোলবালিশটা টেনে নিয়ে ভাল করে বসুন ভবেশদা। আরেকটা হাজমোলা খাবেন?
- অত অয়েলিং না করলেও চলবে, তোমার মুখে এমন কথা শুনলেই আমার ভয় লাগে। হায়রোগ্লিফ শিখবে তো? একটা কাগজ পেন নিয়ে এসে বসো।
বসলাম সব গুছিয়ে,
- এবারে মোবাইলে একটা ছবি বার করো দেখি, সার্চ দাও - মেরেরিজ স্টেলা।
- এটা আবার কি?
- মেরেরি ছিল মিশরের দানদেরা অঞ্চলের পুরোহিতদের নেতা গোছের। এই স্টেলাটা হল ওর কবরে থাকা হায়রোগ্লিফ খোদাই করা পাথর। এখন স্কটল্যান্ডের একটা মিউজিয়ামে আছে। তবে নেটে পেয়ে যাবে ছবিটা।
- হুমম এই তো, এটার কথা বলছেন কি?
- দেখি, হ্যাঁ এটাই, এবারে এই ছবিটাকে ভাল করে দেখো তো জগাই মাধাই, দেখে বলো কী

বুঝতে পারছ।
আমরা দুজনে মিলে ছবিটাকে বড় করে বেশ খুঁটিয়ে দেখলাম। কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকল না।
- অনেকগুলো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তো।

- হুমম, তার মধ্যে কটাকে চিনতে পারছ?
- বেশ কয়েকটাই। একটা মানুষ বাঁ হাতে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সিংহ, একটা প্যাঁচা, একটা গরু, দুটো বসে থাকা লোক, একটা কোয়েলের মতো পাখি, একটা হাত, একটা চোখ।
- ঠিক বলেছ, বাঁ দিকের লোকটার ছবিটাই সব চেয়ে বড় তাই না? তার মানে এতে নিশ্চয় ওই লোকটাকে নিয়েই কিছু লেখা আছে, তাই তো?
- এই লোকটাই মেরেরি?
- হ্যাঁ, মেরেরিকে নিয়ে কয়েকটা ভাল ভাল কথা লেখা আছে এখানে। এবারে ব্যাপারটা হল সেটা পড়া যাবে কি করে। খেয়াল করে দেখ স্টেলাটাতে চারটে কলাম, প্রথম আর দ্বিতীয় কলামটাকে ভাগ করা আছে মেরারির হাতের লাঠিটা দিয়ে।
- হ্যাঁ এটাও লক্ষ্য করলাম।
- চারটে কলামেই বাকি ছোট ছোট ছবিগুলো সাজানো আছে ওপর থেকে নিচে।
- ওহ, তার মানে হায়রোগ্লিফ ওপর থেকে নিচেতে পড়তে হয়?
- না তা নয়। হায়রোগ্লিফের খুব বেসিক কটা নিয়ম বলে দিই শোনো আগে,
এক নম্বর, হায়রোগ্লিফে কোনো অ্যালফাবেট নেই, মানে এ বি সি ডি বা অ আ ক খ বলে ওদের কিছু ছিল না। এই প্রত্যেকটা চিহ্ন আসলে এক একটা উচ্চারণকে বোঝায়। মানে এগুলো ফোনেটিক সাইনস। যেমন প্যাঁচাটা হল 'ম' উচ্চারণের জন্য, যেমনটা হয় আম, মা এই

শব্দ গুলোতে।
দুনম্বর, হায়রোগ্লিফে লেখার সময় ভাওয়েলের দিকে কেউ খেয়াল রাখত না। যেমনটা এখন তোমরা মেসেজ করার সময় করো। যেমন ধরো তুমি লিখলে 'ppl cn rd ths'। মানে people can read this তাই তো?
- হ্যাঁ, টেক্সট করার সময়, চ্যাট করার সময় তো এরকমই করি।
- হায়রোগ্লিফেও তাই হতো। ভাওয়েল গুলো বাদই থাকত। কিছু কিছু ভাওয়েলের উচ্চারণের হায়রোগ্লিফিক চিহ্ন আছে যদিও। যেমন অ, আ,ই, উ। দাঁড়াও এবারে বেসিক হায়রোগ্লিফিক সাইন গুলো লিখে দি।
এই বলে ভবেশদা সামনে রাখা খাতাটাতে পেন দিয়ে লিখতে বসল, একটা জায়গাতে 'ইশ, ভুল হয়ে গেল' বলে কেটে আবার লিখল। লিখে আমাদের খাতাটা দিয়ে বলল,
- এই হল একদম বেসিক লেভেলের হায়রোগ্লিফের কয়েকটা অক্ষর। এবারে এগুলোর সাথে মেরারির স্টেলার চিহ্নগুলো মিলিয়ে দেখো তো কটা মিলছে,

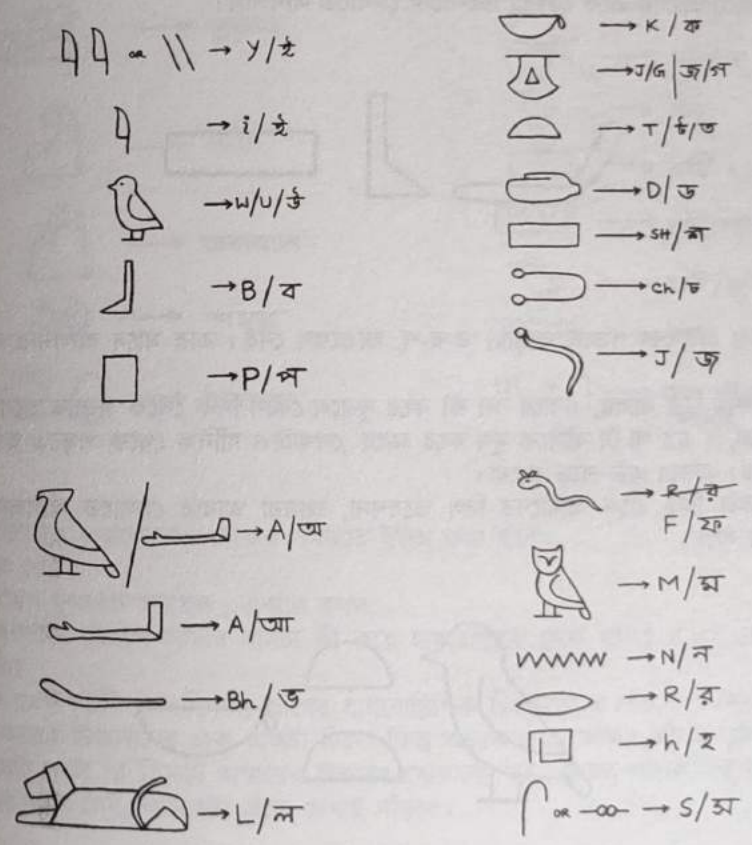

- বাহ! অনেকগুলোই চিনতে পারছি তো এবারে, ই, ন, র, ম, ড, চ, ট !
- খুব ভাল, এবারে তাহলে তিন নম্বর নিয়মটা বলি,
হায়রোগ্লিফ এমন একটা ভাষা যেটা যেমন ডান দিক থেকে লেখা যায় তেমন বাঁ দিক থেকেও লেখা যায়। আবার ওপর থেকে নিচেও লেখা যায়।
- ওরে বাবা, তাহলে পড়ার সময় বুঝব কী করে কোন দিক থেকে শুরু করব?
ভবেশদা এবারে মুচকি হেসে বলল,
- সেটা বোঝা খুব সোজা, মেরারির স্টেলাতে দেখ কলাম আছে, মানে ওপর থেকে নিচেই যে লেখা সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। পাশাপাশি লেখা থাকলে খেয়াল করতে হবে কোনও জন্তু, পাখির বা শরীরের কোন অংশের ছবি থাকলে তার ফেস বা মুখ কোন দিকে আছে। যেদিক থেকে লেখা শুরু হবে সব কটা চিহ্নের ফেস সেই দিকে থাকবে। যেমন ধরো এই লেখাটা, আমার এঁকে দেওয়া ছবিগুলো মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করতো দেখি,
বলেই ভবেশদা খসখস করে একটা কিছু এঁকে আমাদেরকে দেখালো, দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আঁকাটার সাথে আগের এঁকে দেওয়া চিহ্নগুলো মেলাতে লাগলাম।

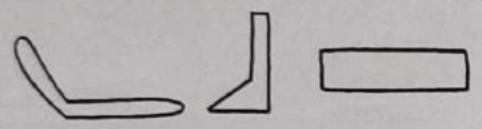

- আরিব্বাস! এই তো পড়তে পাড়ছি! ভ-ব-শ, ভাওয়েল নেই। তার মানে আপনার নাম এটা! ভবেশ!
- বাহ! একদম ঠিক বলেছ, এবারে বল কী করে বুঝলে কোন দিক থেকে পড়তে হবে।
- খুব সোজা, ব এর পা টা বাঁদিকে মুখ করে আছে ,লেখাটাও বাঁদিক থেকে পড়তে হবে।
- ভেরি গুড। এবারে এটা পড়ে দেখো।
আবার একটা কিছু এঁকে আমাদের দিল ভবেশদা, আমরা আবার মেলাতে লাগলাম আগের চিহ্নগুলোর সাথে।

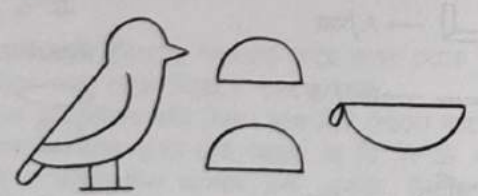

- পাখির মুখ ডানদিকে, তার মানে ডান দিক থেকে পড়তে হবে। তাহলে হল- ক,ট,ট,উ। কুট্টু লিখলেন নাকি! এটা তো আমার ডাকনাম!
নিজের নাম হায়রোগ্লিফে দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।
- একদম ঠিক বলেছ। বেশ ঝটপট বুঝে গেলে তো ব্যাপারটা। এবারে তাহলে চার নম্বর নিয়মটা বলি,
চার নম্বর, কোন কোন হায়রোগ্লিফে লেখা শব্দের সাথে আরো একটা এক্সট্রা চিহ্ন থাকে। একে বলে ডিটারমিনেটিভ, মানে এই চিহ্নগুলোও বুঝতে হেল্প করবে যে কী লেখা আছে শব্দটাতে। যেমন ধরো একটা বসে থাকা ছেলে বা মেয়ে বোঝায়, শব্দটা রেস্পেক্টিভলি একটা ছেলে বা মেয়েকে বোঝাচ্ছে। আবার একটা বসে থাকা ছেলের মুখে দাড়ি মানে ভগবানের নাম লেখা আছে। তেমন আর কয়েকটা চিহ্ন এঁকে দি দাঁড়াও।

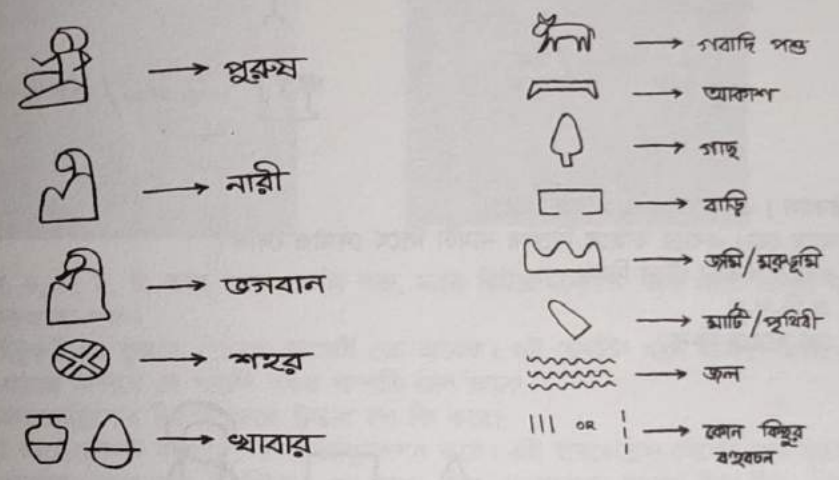

- আচ্ছা, তাহলে এগুলোকেও লেখার সময়তে ইউজ করা যাবে।
- হ্যাঁ যাবে তো ।
পিজি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল , এবারে বলল,
- কিন্তু ভবেশদা তাহলে আমার নামটা কী করে হায়রোগ্লিফে লেখা যাবে? প্র-এর কোনো চিহ্ন আছে নাকি?
- এই কথাতেই আমি আসছিলাম, আগের হায়রোগ্লিফিক চিহ্নগুলোতে তোমাদের দেখালাম এক একটা অক্ষরের উচ্চারণের এক একটা চিহ্ন। কিন্তু অনেক সময় আবার একটা হায়রোগ্লিফিক সাইন দিয়েই দুটো বা তিনটে অক্ষরের উচ্চারণ বোঝানো যায়। তেমন অনেক চিহ্ন আছে, সব কটা আমার মনে নেই, কয়েকটা এঁকে দেখাই দাঁড়াও।

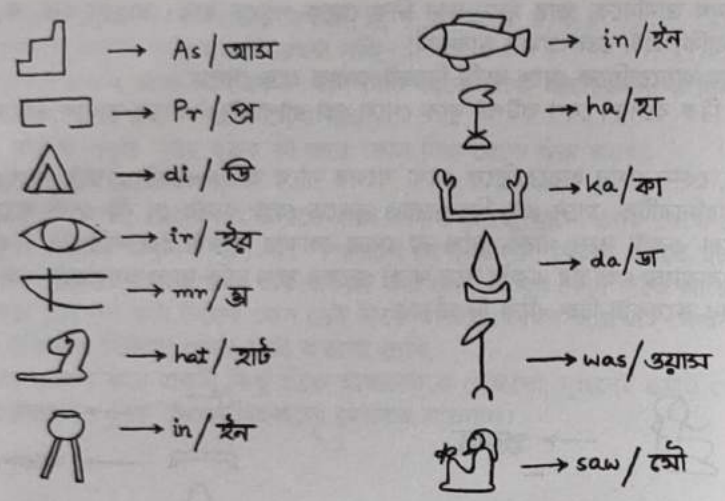

- আরিব্বাস ! এই তো প্র এর চিহ্ন আছে!
- হ্যাঁ আছে তো। এবারে তাহলে নিজের নামটা লিখে দেখাও দেখি।
পিজি এবারে খাতাটা টেনে নিল।
- হুম, প্র-দি-প-ত
দেখুন তো হয়েছে কিনা?

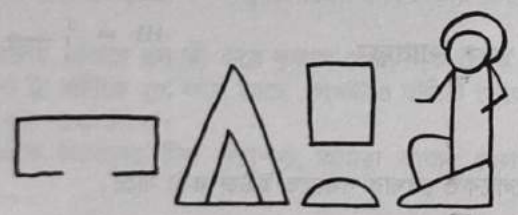

- এই তো, একদম পারফেক্ট হয়েছে! এবারে মেরারির পায়ের কাছে কী লেখা আছে পড়ার চেষ্টা করো তো দেখি।
- এই তো, লেখা আছে ম্র-র-র-ই। মানে মেরারিরই নাম কি?
- বাহ! একদম ঠিক ধরেছ!
- তাহলে কি এবারে গোটা স্টেলাতে লেখা সব হায়রোগ্লিফের মানে পড়তে পারব?
- দেখো চেষ্টা করে।

আমরা এতক্ষণের জ্ঞান সম্বল করে আবার মেরারির স্টেলাটা পড়ার চেষ্টা করলাম।
- না ভবেশদা পারছি না তো এখনো। অনেকগুলো চিহ্নই চিনতে পারছি কিন্তু মানে বেরোচ্ছে না তো তার কোনও।
- সেটা বেরোবার কথাও না ভাই। একটা জিনিস তোমরা ভুলে যাচ্ছ। এইটা লেখা আছে কিন্তু বাংলায় বা ইংরাজীতে নয়, প্রাচীন মিশরীয় ভাষায়। যেমন ধরো দুনম্বর কলামের এই জায়গাটা। বল দেখি কী লেখা আছে,

- এই তো, চ, ন, ট, ট, তার পরে একটা গরু, মানে ডিটারমিনেটিভ, তার আগে তিনটে দাগ, মানে অনেকগুলো গরু।
- বাহ! এইটুকুই যে বুঝতে পেরেছ তাতেই তো অনেক। ওই 'চনটট' মানে মন্দির। মানে এই শব্দটা বোঝাচ্ছে মন্দিরে যে গবাদি পশুর সম্পত্তি ছিল তাকে।
- তাহলে হায়রোগ্লিফের লিপির মানে উদ্ধার হল কি করে?
- এটা তো আগেরদিনই বললাম, ব্যাক ক্যাল্কুলেশন করে। এই হায়রোগ্লিফ থেকেই জন্ম হয়েছিল আরেকটা ভাষার। তার নাম কোপ্টিক। এর সাথে গ্রীক ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক মিল ছিল। মিশরে আরবদের শাসনের আগে সবাই এই ভাষাতেই কথা বলত। তাই প্রাচীন হায়রগ্লিফ জানা মানুষ হারিয়ে গেলেও রিলেটিভলি নতুন এই ভাষাটা হারায় নি। অনেকেই এই ভাষা জানতো। তাই ওই কোপ্টিক ভাষার হেল্পেই এই হায়রোগ্লিফিক ইনস্ক্রিপসনগুলোর মানে বার করা গিয়েছিল।
- বাহ! একটা হারিয়ে যাওয়া ভাষা লুকিয়ে ছিল নতুন আরেকটা ভাষার মধ্যে!
- একদম তাই। মেরারির স্টেলাতে যেটা লেখা আছে তা হল, মন্দিরের গভর্নর মেরারি, যে কি না পুরোহিতদের প্রধান এবং মন্দিরের গবাদি পশুর অভিভাবকও বটে, সে পুজো দিচ্ছে দেবতা ওসাইরিসকে। একদম ডানদিকের কোণের ছবিটা দেখ, ওটা ওসাইরিসের চিহ্ন।
আমি এবারে বললাম,
- বুঝছি ভাষাটা মোটেই সহজ কিছু নয়।
- একদমই সহজ নয়। আমি তোমাদের যেটুকু শেখালাম সেটুকু টিপ অফ দা আইসবার্গ বলতে পারো। বাকিটা আমি নিজেও ভাল ভাবে জানি না। তবে এইটুকু জ্ঞান দিয়ে তোমরা টুকটাক কটা শব্দ হায়রোগ্লিফে লিখে ফেলতেই পারবে। যাই হোক, অনেক খাটালে আজ তোমরা আমাকে।

কটা বাজে দেখো তো।
সময় যে কোথা থেকে গড়িয়ে গেল খেয়ালই করিনি। মোবাইলের স্ক্রীনে এবারে দেখলাম ভোর চারটে ! সেদিনের মতো আড্ডাটা ওখানেই বন্ধ রেখে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন অবশ্য হোস্টেলে আমরা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম। হায়রোগ্লিফে সবার নাম লিখে দিচ্ছিলাম যে!

১৩

পৃথিবীর শুরু

- আচ্ছা একটা কথা বল দেখি, ডিম আগে না মুরগি আগে?
কলেজের সেমিস্টার একজাম চলছিল, তাই বেশ কয়েক সপ্তাহ ভবেশদার সাথে দেখা হয়নি আমাদের। কাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে সন্ধের দিকে আমি আর পিজি বেনুদার দোকানে গিয়েছিলাম চা খেতে। দেখি ভবেশদা বসে আছে। আমাদের দেখে বলল,
- আরে মানিকজোড় যে, অনেকদিন পরে। পরীক্ষা কেমন হল?
আর পরীক্ষা, সে কেমন হয়েছে নিজেরাই ভাল জানি না। তাই আমি আর পিজি যেভাবে মাথা নাড়লাম তার মানে ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। তবে ভবেশদা মনে হয় না সেটা খেয়াল করেছে বলে, আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল,
- ডিমের অমলেট চলবে নাকি? অনেক খাটনি গেছে তোমাদের, চলো আজকে আমিই খাওয়াই। বেনুউউউ....
সবার জন্য ডবল ডিমের অমলেট এল, আর এক কাপ করে চা। তারপর চামচ দিয়ে অমলেটের একটা টুকরো কেটে মুখে পুরতে পুরতে কথাটা বলল ভবেশদা।
ডিম আগে না মুরগি আগে?
- এতো খুব বোকা বোকা ধাঁধা ভবেশদা। এর কোনও ঠিক উত্তর হয় নাকি?
- বোকা বোকা বলছ? এই ধাঁধার জনক কে জানো? গ্রীক ফিলোসফার প্লুটার্ক। এখন প্লুটার্ক কে সেটা জানতে চেয়ে তোমাদের লজ্জা দেব না। অমলেটটা দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই প্রশ্নটা করলাম। আমি যদি বলি ডিম আগে তাহলে বিশ্বাস করবে?
ভবেশদার ট্রেডমার্ক হাসিটা দেখেই বুঝলাম একটা দারুণ গল্প শুরু হল বলে। পিজির মনেও নির্ঘাত এটাই এসেছিল। পাশ থেকে বলল,
- কে বলল এরকম?
- কে আবার বলবে, হিন্দুরাই এমন বলে গেছে। প্রাচীন ইজিপশয়ানরাও বলেছে। পৃথিবীর সৃষ্টিই তো হল ওই ভাবে।
- তাই নাকি!
- হুম, ইজিপশিয়ানদের গল্পটা শোন তবে, সব কিছু শুরুর আগে কিছুই ছিল না। আলো, বাতাস, মাটি, আকাশ কিচ্ছু না। ছিল শুধু জল। তার গভীরতা কেউ জানে না। কেউ জানে না কোথায় সেই জলের শেষ। এর নাম ছিল নান, একদিন এই জলেই ভেসে উঠল একটা ডিম। আর হঠাৎ করে ডিমের খোলসটায় চিড় ধরল, এই চিড় ধরার আওয়াজই হল প্রথম শব্দ। ডিমটা ফেটে যেতেই

তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল জীবনের প্রথম স্পন্দন। দেখা গেল সেই ডিমের মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠছে একটা মাটির ঢিবি। তার ওপরে বসে আছেন একজন পুরুষ। ইনিই প্রথম দেবতা। এর নাম আতুম। যে নিজেই নিজেকে তৈরি করল।

- স্বয়ম্ভু!

- বাহ স্পন্দন ভাই! এই নামটা কোথা থেকে শুনলে?

- ছোটবেলায় দাদুর কাছে শুনেছিলাম, ব্রহ্মার আরেকটা নাম। যে নিজেই নিজেকে তৈরি করেছে।

- ঠিক বলেছ। মৎস্যপুরাণে আছে মহাপ্রলয়ের কথা, যার পরে চারিদিকে শুধু অন্ধকার ছিল। তারপর সৃষ্টির আদি বীজ ধারণ করে তৈরি হল একটা ডিম, যার নাম হিরণ্যগর্ভ। এই ডিম থেকে জন্ম নিলেন স্বয়ম্ভু। দুটো মিথোলজির মধ্যে কী অদ্ভুত মিল তাই না!

- কিন্তু এরকম মিল কী করে হতে পারে ভবেশদা? অত হাজার বছর আগে কি দুটো সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ছিল?

- ভারতবর্ষ আর মিশরের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয় যীশুর জন্মের ১৪০০ বছর আগে। কিন্তু বেদের বয়স আরো বেশি। কিভাবে দুটো মিথোলজি এতটা এক হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে বুঝলে। হয়ত কোনওদিন কেউ এই রহস্যের সমাধান করতে পারবে। যাই হোক, হিন্দু দেবদেবীদের গল্প তো আগেও অনেক শুনেছ। এবারে মিশরের ঈশ্বরদের কথা শোন, আতুমের কথায় ফিরে আসি।

ডিম ফেটে জন্ম নেওয়ার পরে আতুমই তৈরি করলেন সূর্যকে। সেই থেকে সৃষ্টি হল আলোর। এরপরে আতুমেরই শরীরের রস থেকে জন্ম নিল ওর দুই সন্তান শু আর তেফনুত। শু হল শুকনো বাতাসের দেবতা আর তেফনুত হল আর্দ্রতার দেবী। এরা তিন জনে মিলে সেই মাটির ঢিপির পৃথিবীতে বেশ ভালই ছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে শু আর তেফনুত ঢিপি থেকে পড়ে গিয়ে তলিয়ে গেল নান-এর জলের গভীরে।

দেবতা আতুম তার চোখকে পাঠালেন যমজ সন্তানদের খুঁজে আনতে। আতুমের চোখ নানের অতল থেকে তুলে আনল শু আর তেফনুতকে। সন্তানদের খুঁজে পাওয়ার খুশিতে আতুমের চোখ দিয়ে যে জল পড়ল তা থেকে তৈরি হল পুরুষ আর নারীর। এরপরে শু আর তেফনুতের সন্তান হল...

- অ্যাঁ! বলেন কি? ভাই বোনের মধ্যে...

- হ্যাঁ, এতে অবাক হওয়ার তো কিছু নেই। আগেও তো বলেছিলাম। মিশরের পুরাণে এমন ইন্সেসচুয়াস রিলেশনের ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ আছে। ফারাওরা নিজেরাই নিজেদের বোনেদের বিয়ে করতেন। সে কথা পরে বলব'খন। এখন এই গল্পটা শোন।

শু আর তেফনুতের সন্তান হল গেব আর নুত। গেব হল পৃথিবীর দেবতা আর নুত হল আকাশের দেবী। গেবের শরীরেই জন্ম হল নীল নদের, তার পাঁজর থেকে তৈরি হতে থাকল শস্য। গেব খুব জোরে হেসে উঠলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়, গেবের রাগে তৈরি হয় খরা। এই গেব আর নুতেরও অনেক সন্তান ছিল। সেই সন্তানেরা ছিল আকাশের তারা। একদিন খুব খিদের মাথায় নুত ওর সন্তান দের খেয়ে ফেলল। স্বাভাবিক কারণেই গেব গেল রেগে। গেবের রাগ কমানোর জন্য তখন নুত গেবের ওপরে ছাতার মতো উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। ওর দুই হাত আর দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করে থাকল উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব আর পশ্চিম দিক। যাতে এরা দুজনে ঝগড়া না করে তাই এবারে শু দুজনের মাঝে হাঁটু গেড়ে বসল। তাই পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে আকাশ। আর এই দুইয়ের মাঝে আছে বাতাস। নুত হাসলে বাজ পড়ে আর কাঁদলে বৃষ্টি হয়।

- বাহ্! দারুণ ভাল গল্পটা কিন্তু!

- সবই মানুষের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ভায়া।

- আচ্ছা, আতুমকে দেখতে কেমন ছিল?

- গুগলে আতুম লিখে সার্চ করো।

তাই করলাম, বেশ কয়েকটা ছবি এল।

- পেলে?

- হুমম, কিন্তু এটা তো একটা মানুষের ছবি।

- হ্যাঁ তাই তো হওয়ার কথা। মিশরের বেশিরভাগ দেব দেবীর আকারই একদম মানুষের মতো। মাথা বা শরীরের কোন অংশ কখনও কখনও অন্য পশু বা পাখির হয়। যেমন এই ছবিটায় দেখো। এটা আতুমের মানুষের রূপ। মাথায় মিশরের ফারাওয়ের মুকুট পরে বসে আছেন। কারণ ফারাওরা নিজেদের দেবতার অবতার বলে মনে করতেন। তাই ছবি আঁকার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ফারাও আর ভগবান মিলেমিশে এক হয়ে যেত। মুকুটের কালো অংশটাই যদি কেউ পরে থাকে তার মানে সে শুধু দক্ষিণ মিশরেরই রাজা। এর নাম ছিল দেশরেত। আর কেউ যদি শুধু সাদা অংশটা পরে থাকে তার মানে সে শুধু উত্তর মিশরের রাজা। এর নাম হেদজেত। এখানে দেখ আতুম দুটোই পড়ে আছে। এই মুকুটটার নাম হলে শেন্ত। মানে আতুম গোটা দেশটারই সম্রাট।
- আর হাতে এগুলো কি?
- লম্বা লাঠির মতো যেটা, সেটা হল রাজদণ্ড। দেশ শাসনের ক্ষমতা যে তার হাতেই এটা বোঝানোর জন্য। একে বলে 'ওয়াস'। ওয়াসের হায়রোগ্লিফিক সাইনও দেখবে এঁকেছিলাম আগের দিন। এরকমই দেখতে। আর অন্য হাতে চাবির মতো যেটা আছে তার নাম 'আঁখ'। এটা হল জীবনের প্রতীক। এই আঁখ হাতে থাকলেই সে অমর হবে। মৃত্যুর পরের জীবনেও তার শরীরে প্রাণ আসবে। তাই অনেক দেবতার পাশাপাশি ফারাওদেরও দেখবে এই 'আঁখ' ধরে আছে। তবে আতুমের কিন্তু আরো অনেক রকমের রূপ হয়, শরীরটা মানুষের থাকলেও মাথাটা বদলে হয়ে যেতে পারে সাপ, ছারপোকা বা পাহাড়ি ভেড়ার।

আঁখ

- অ্যাঁ ছারপোকা!
- ঠিকই শুনেছ, কেন সেটা একটু পরেই বলছি। প্রথমের দিকে মিশরের মানুষ সূর্যদেব হিসাবে আতুমেরই পুজো করত। পরে তার জায়গাতে এল 'রে' বা 'রা'।

- হ্যাঁ এই 'রে' এর নাম তো শুনেছি।
- হ্যাঁ, বাইরের জগতে মিশরের যে কয়েকজন দেবতা খুব পপুলার তাদের মধ্যে 'রে' একজন। সূর্যের তিন দশার জন্য তিনজন দেবতা তৈরি হয়। আতুম হয়ে যায় অস্তমিত সূর্য, রে হয় মাঝ আকাশের গনগনে সূর্য, আর ভোরবেলার সূর্যের নাম হয় খেপরি। এই খেপরির অবতার ছিল ছারপোকা। আরো ভাল করে বলতে গেলে বলতে হয় স্কারাব প্রজাতির বিটল। এদের আমাদের দেশেও দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের প্রতীক ছারপোকা হওয়ার কারণটা এবারে বলি শোন।

স্কারাব বিটল গোবরের ছোট ছোট বল বানিয়ে মাটির ওপর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। ওই গোবরের বলের মধ্যে থাকে ওদের নিষিক্ত ডিম, সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসে আর উড়ে যায়। মিশরীয়রা এটা জানত না যে এই বিটলদের ছেলে মেয়ে দুরকমেরই ভাগ হয়। ওরা ভাবত ছারপোকাগুলো শুধু পুরুষ প্রজাতিরই হয়। তারা নিজেরাই বাচ্চা তৈরি করে। আর গোবরের বল গুলো অনেকটা সূর্যের মতো গোল। ব্যাস, অমনি ছারপোকারা জাতে উঠল। নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করে। তাই ছারপোকা হয়ে গেল সূর্যদেবের প্রতীক।

স্কারাব বিটলের ছবি দেওয়া অ্যামুলেট

- বোঝো ঠ্যালা।
- আরো কয়েকটা মজার গল্প শোন তাহলে, আতুমের চোখের কথা বললাম না একটু আগে, যাকে আতুম পাঠিয়েছিল..
- হ্যাঁ হ্যাঁ বললেন তো, শু আর তেফনুতকে খুঁজে আনতে পাঠিয়েছিল।
- ঠিক, এই চোখ আতুমের শরীরের অংশ, তাই এ আবার আতুমের মেয়েও। আতুমের এই চোখ শু আর তেফনুতকে খুঁজে নিয়ে বাবার কাছে এসে দেখল যে বাবা তার জায়গায় অন্য একটা নতুন চোখ লাগিয়ে নিয়েছে। ব্যস, সে তো রেগে কাঁই। আতুম তাই মেয়েকে ঠান্ডা করার জন্য ওকে একটা কোবরার রূপ দিল। সেই কোবরার মিশরীয় নাম হল ইউরেয়াস। এই সাপের ঠাঁই হল আতুমের কপালে, দুই চোখের মাঝখানে। অনেক ফারাওয়ের মুকুটে দেখবে এই সাপ আছে। তুতানখামেনের সোনার মুখোশে দেখতে পাবে ইউরেয়াসকে। আবার অন্য একটা গল্পতে বলা আছে যে এই চোখ রেগে গিয়ে একটা সিংহীর রূপ ধারণ করে, সে তখন একের পর এক মানুষকে মারতে থাকে আর খেতে থাকে। এই সিংহকে বাগে আনে ওর ভাই শু, তাকে সাহায্য করে দেবতা থথ। তারপরে নীলনদের জলে চুবিয়ে ওর মাথা ঠান্ডা করা হয়।

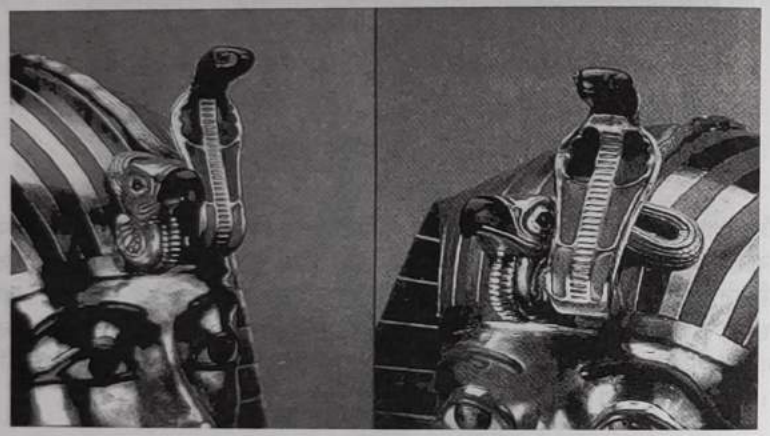

ইউরেয়াস

- থথ? ইনি কোন দেবতা?
- থথ হল জ্ঞান আর জাদুর দেবতা। থথই নাকি ইজিপশিয়ানদের লিখতে শিখিয়েছিলেন। থথের শরীরটা মানুষের হলেও মাথাটা ছিল আইবিস পাখি বা বেবুনের। তোমাদেরকে 'রা'এর নৌকার কথা বলেছিলাম মনে আছে। থথ এই নৌকার একদিকে দাঁড়িয়ে থাকে।
- আচ্ছা, বুক অফ দি ডেড এও থথের কথা ছিল না?
- বাহ তোমার মনে আছে দেখছি পিজি ভাই। ঠিকই বলেছ। মৃতের যখন বিচার হয় তখন থথ দাঁড়িপাল্লার পাশে বসে সেই বিচারটা প্যাপিরাসে লিখে রাখে। এই থথের একটা গল্প বলে আজকের আড্ডাটা শেষ করব।

থথ

তেফনুত যে আর্দ্রতার দেবী ছিলেন সেটা আগেই বললাম তোমাদের। এই তেফনুত একবার বাবা 'রা' এর ওপরে রাগ করে মিশর ছেড়ে চলে গেল। তার ফলে গোটা দেশ শুকিয়ে গেল। তেফনুতকে ফিরিয়ে আনার জন্য রা পাঠালেন থথকে। থথের সাথে যখন তেফনুতের দেখা হল তখন তেফনুত একটা ভয়ঙ্কর সিংহীর রূপ ধরে আছে, অনেকটা সেই আতুমের চোখের মতো গল্পটা। যাইহোক, থথ বুঝল যে তেফনুতের সঙ্গে শক্তিতে পারা যাবে না। তাই কথা দিয়ে থথ তেফনুতকে ভোলাতে শুরু করল। এইভাবে তেফনুতকে বশ মানিয়ে থথ ওকে মিশরে ফিরিয়ে আনল, দেশে আবার জল ফিরে এল। থথ তেফনুতকে অনেকগুলো গল্প বলেছিল, তার একটা শুধু বলি তোমাদের।
একটা জঙ্গলে একটা বিশাল বড় সিংহ থাকত। তার প্রবল পরাক্রম। সবাই তাকে ভয় পেত। একদিন একটা পাহাড়ের নিচে সিংহর সাথে দেখা হল একটা চিতাবাঘের। আধমরা হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের চামড়া কেউ একটা ছাড়িয়ে নিয়েছে। সিংহ ওকে জিজ্ঞাসা করল, কে করল এমন তোমার সাথে?
চিতাবাঘ কোন রকমে জবাব দিল, মানুষ।
মানুষ?
হ্যাঁ, মানুষ, খুব ধূর্ত এরা, তুমি কখনো ভুলেও ওদের পাল্লায় পড়ো না।
সিংহর তো মাথা গেল গরম হয়ে। এই মানুষকে দেখতে পেলেই শায়েস্তা করতে হবে। এই ভেবে সিংহ আর কয়েক পা এগিয়েছে, দেখা হল একজোড়া গাধার সাথে , ওদেরকে একটা জোয়াল দিয়ে কেউ বেঁধে দিয়েছে।
কে করল এরকম?

মানুষ।
মানুষ!
হ্যাঁ ওরা ভয়ানক প্রানী! ভুলেও ওদের সামনে এসো না!
সিংহর রাগ তো আরোই বেড়ে গেল। ও সব জায়গায় মানুষকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সেই সময় আরো বেশ কিছু জানোয়ারের সাথে দেখা হল ওর। একটা ষাঁড় আর একটা গরু যাদের নাকে ফুটো করা, একটা ভল্লুক যার নখগুলো কাটা, একটা অন্য সিংহ যার একটা পা একটা গাছের ফাঁকে আটকানো। সবই নাকি সেই মানুষের কীর্তি।
এই মানুষ নামের জীবকে হাতে পেলে মেরেই ফেলব, এই ভাবল সিংহ।
একদিন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সিংহ হাঁটছে, এমন সময় একটা ছোট ইঁদুর এসে ওর সামনে পড়ল। সিংহ থাবা উঁচিয়ে ইঁদুরটাকে মারতে যাবে এমন সময় ইঁদুরটা বলল,
দয়া করে আমাকে মারবেন না। এই এতটুকু শরীরটা খেয়ে তো আপনার খিদে মিটবে না। কিন্তু আপনি যদি আমাকে না মারেন তাহলে ভবিষ্যতে কখনো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। এইটুকু একটা প্রাণী আর কী বা সাহায্য করবে, এই ভাবল সিংহ। কিন্তু দয়া পরাবশ হয়ে ইঁদুর টাকে ছেড়েও দিল।
সেই দিনই সিংহ একটা শিকারীর ফাঁদে পড়ল। জাল জড়িয়ে গেল ওর গোটা শরীরে। অনেক চেষ্টা করেও আর নিজেকে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। এমন সময় সেই ইঁদুরটা ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। সিংহর এই অবস্থা দেখে ও এগিয়ে এল। তারপরে দাঁত দিয়ে জাল কেটে সিংহকে মুক্ত করল। সিংহ জাল থেকে বেরিয়ে বুঝল মানুষের সাথে পেরে ওঠা যাবে না। এই ভেবে জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে গেল।
আমি আর পিজি চুপ করে গল্পটা শুনছিলাম, পিজি এবারে প্রায় বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠল,
- আরিব্বাস! এই সিংহ আর ইঁদুরের গল্পটা অনেকটা ঈশপের গল্পটার মতো না!
- হ্যাঁ ভাই, ঈশপ কে ছিল বলত?
- সেটা তো জানি না।
- ঈশপ ছিল একটা গ্রীক ক্রীতদাস। সে নাকি গল্প গুলো মুখে মুখে বলত। ঈশপ যে সময়কার মানুষ সেই সময় গ্রীসের সাথে মিশরের সম্পর্ক বেশ শক্ত পোক্ত ছিল। তাই এটা একেবারেই অসম্ভব নয় যে মিশরের পুরাণের গল্পগুলোই ঈশপের মুখে ফিরে এসেছে। তবে তোমাদের ডাক্তারির সাথেও কিন্তু ইজিপশিয়ান মাইথোলজি জড়িয়ে আছে।
- বলেন কী!
ভবেশ দা এবারে একটা ভ্রু তুলে বলল,
-একটা এমন চিহ্ন, যেটাকে তোমরা বার বার দেখেছ। তবুও কখনো ভাবনি এটা এল কোথা থেকে। দেখো গুগল করে কিছু পাও কিনা। কাল সন্ধ্যের দিকে দোকানে এসে উত্তরটা বলে দিয়ে যেও।

১৪

হোরাসের চোখ

সেইদিন রাতেই বাড়ি ফিরে আমি আর পিজি গুগল ঘাঁটতে বসেছিলাম। ভবেশদা কোন হিন্টও দেয়নি, তাই কোথা থেকে খোঁজাটা ঠিক শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তবে রাত এগারোটা নাগাদ পিজি হঠাৎ মিল গয়া মিল গয়া বলে ঘরের মধ্যে লাফাতে আরম্ভ করল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বলল এখন বলব না, কালকেই দেখতে পাবি। বুঝলাম, এবারে ব্যাটা ভবেশদার কাছে গিয়ে বেশ ঘ্যাম দেখাবে।
পরেরদিন সন্ধ্যেবেলায় হাজির হলাম ভবেশদার দোকানে। পিজি একটা বেশ জ্ঞানী সুলভ মুখ নিয়ে ভবেশদাকে বলল,
- ইজিপ্ট নিয়ে আপনার নলেজ কিন্তু ইমেন্স। আমি সেটা বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে।
- হুঁ, তুমি বুঝতে পেরেছ আমি এতে অনার্ড ফিল করছি। কয়েক মাস আগে তো মিশর মানে লিজ টেলর বুঝতে।
- ভাল কথা আপনাকে বলতে নেই তাই না? ওইটা ছাড়াও আরো অনেক কিছুই জানতাম আমি, নেহাত কম কথা বলি তাই বুঝতে পারেন না আপনি।
এবারে আমি আর ভবেশদা দুজনেই হেসে ফেললাম। সেটাতে আরো বিরক্ত হয়ে পিজি বলল,
- যাইহোক, কালকে আপনি ডাক্তারীর সাথে ইজিপ্সিয়ান মাইথোলজির যে মিলটার কথা বললেন, ওইটাও আমি আগে থেকে জানতাম, গুগল থেকে শুধু সেটাকে একবার কনফার্ম করে নিলাম। বলি?
- হুমম, শুনি কী জানো তুমি?
-'আর এক্স' এর কথা বলছেন তো আপনি? মানে যেটা আমরা প্রেসক্রিপশন লেখার সময়তে লিখি।

- আমি এখনই কিছু বলব না, তুমি শেষ করো আগে, নাহলে আবার বলবে সেটাও জানতে, আমি বলতে দিই নি তোমাকে।
- সেতো অনেক সময়তেই দেন না, সত্যিটা মানতে এত কষ্ট কেন হয় আপনার বুঝি না। যাই হোক, এই 'আর এক্স' এর 'আর'টা আসলে এসেছে ল্যাটিন শব্দ রেসিপি থেকে। যার মানে টু টেক। অর্থাৎ ডাক্তার এখানে রুগীকে কিছু নিতে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন। সেটা ওষুধই, আগেকার দিনে ডাক্তাররাই তো ফার্মাসিস্টও ছিলেন। ওরাই ওষুধও বানাতেন। তাই সেই ওষুধই রুগীকে নিতে বলার জন্যই আর এক্স লেখার শুরু। সেটাই এখনও চলে আসছে।
- আর এর সাথে মিশরের মিল কোথায়?
- দেবতা হোরাসের চোখ ! সেটার ছবি দেখলেই বোঝা যাবে যে তার সাথে এই আর এক্স চিহ্নের অদ্ভুত মিল!
এবারে আমি বললাম,
- আই অফ হোরাস কেমন দেখতে? আমি তো আগে দেখিনি।
ভবেশদা একটা কাগজের টুকরোতে ঝটপট এঁকে ফেলল একটা চোখ, তার নিচের দিকে দুটো দাগ নেমে গেছে। একটা সোজাসুজি, আরেকটা বাঁকা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেকটা আরের মতোই।

- হোরাসের কথা একবার বলেছিলাম তোমাদের, মনে আছে?
- হ্যাঁ, সেই মমির গল্প বলার সময় বলেছিলেন তো। মৃত ওসাইরিসের শরীরে প্রাণ আসার পরে ওসাইরিস আর ওর স্ত্রী আইসিসের এক সন্তান জন্মায়। সেই হল হোরাস।
- ঠিক! কিন্তু হোরাসের চোখের থেকেই ডাক্তারির ওই চিহ্ন কেন তৈরি হল জানো?
এবারে পিজি পড়ল ফ্যাসাদে। ওর মুখ দেখেই বুঝলাম ভবেশদার এই প্রশ্নের উত্তর ওর কাছে নেই। কিন্তু হার মানবার ছেলে তো ও নয়, বলল,
- হ্যাঁ এটাও জানতাম এক কালে, কিন্তু এখন ভুলে গেছি। আপনি আরেকবার বলে দিন তো তাহলে ফের মনে পড়ে যাবে।
- হুমম, এবারে আমি শুরু করি তবে, দেখো তোমার মনে পড়ে কি করে। এত কম বয়সে কি করে এত ভোলো সেটা বুঝিনা।
প্রথম কথা ওই চিহ্নতে আর অক্ষরটা থাকলেও তার লেজে যে আড়াআড়ি কাটা দাগটা আছে সেটা

এক্স না। হোরাসের চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই আঘাতের দাগই ওটা।
- হোরাসের চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল! কে নিয়েছিল!?
- দেবতা সেথ।
- সেথ? মানে ওসাইরিসের ভাই, যে ওকে খুন করেছিল?
- হ্যাঁ ভাই এই সেই সেথ, কেন চোখ উপড়ে নিল সেই গল্পটাই বলি শোনো।

হোরাস

সেথ

ওসাইরিসকে খুন করে দেবতাদের সিংহাসনে বসেন সেথ। অন্যদিকে আইসিসের জাদুতে ওসাইরিসের মৃত শরীরে প্রাণ এলেও তিনি আর বাকি দেবতাদের দলে জায়গা পেলেন না। তাকে চলে যেতে হল মিশরের পশ্চিমে। যেখানে মৃতদের কবর দেওয়া হত। ওসাইরিস হলেন মৃতদের দেবতা। সেথ কিন্তু রাজা হয়েও শান্তি পাননি, খবর পেয়েছিলেন যে আইসিসের এক সন্তান হয়েছে ওসাইরিসের ঔরসে। তাকে মারার জন্য উঠে পড়ে লেগেও ছিলেন।
বুদ্ধিমতী আইসিস হোরাসের জন্ম দেওয়ার পরেই সদ্যোজাত শিশুকে তুলে দেন দেবী হাথোরের হাতে। নীল নদের অববাহিকাতে প্যাপিরাস গাছে ভরা জলাভূমিতে বেড়ে উঠতে থাকলেন হোরাস। হোরাস যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তখন আইসিস ওকে নিয়ে এলেন দেবতাদের দরবারে। যাতে হোরাস সিংহাসনে ওর যোগ্য অধিকার দাবী করতে পারেন। কিন্তু সেথ সিংহাসন ছাড়তে রাজী হলেন না। তখন দেবতারা ঠিক করল সেথ আর হোরাস দুজনকেই একবার করে সুযোগ দেওয়া হোক এইটা বলার যে কেন সেই সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদার
প্রথমে সেথ বলতে উঠলেন, বললেন, আমি দেবী নুতের সন্তান, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রতিদিন আমিই রা এর নৌকাতে থাকি, প্রতিরাতে আমিই তাকে সাহায্য করি আপেপ

হাথোর

নামের সাপকে হত্যা করার জন্য। আর কেউ তো এই কাজ করতে পারবে না। তাই আমিই এই সিংহাসনে বসার যোগ্য।

এরপরে হোরাসের সুযোগ এল, কিন্তু তিনি শুধু বললেন, ওসাইরিসের সন্তান আমি, এই সিংহাসন রাজ ওসাইরিসের ছিল, তাই এখন তার অনুপস্থিতিতে এর ওপরে আমারই অধিকার। সেথ আমাকে ঠকাচ্ছেন।

দেবতাদের মধ্যে এবারে মতপার্থক্য দেখা দিল , কিছু জন যদিও ভাবলেন যে হোরাসকেই সিংহাসনে বসতে দেওয়া হোক বেশিরভাগেরই মত ছিল সেথের দিকে। কারণ সেথ অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং সাহসী। দেবতাদের পাল্লা সেথের দিকে ভারী বেশি দেখে হোরাস সেথকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসলেন। দুজনেই দুটো জলহস্তীর আকার ধারণ করে ঝাঁপ দিলেন নীল নদের জলে। আইসিস এই সময় ছলনার আশ্রয় নিলেন। সেথকে আহত করার জন্য তীর ছুঁড়লেন জলের মধ্যে। কিন্তু সেই তীর গিয়ে লাগল হোরাসের পায়ে। আহত হোরাসকে জল থেকে উঠে আসতেই হল। সে লুকিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সেথও ধাওয়া করলেন ওকে।

সন্ধ্যের দিকে সেথ খুঁজে পেলেন প্রায় অচৈতন্য হোরাসকে। একটা গাছের নিচে শুয়ে আছেন। সেথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন হোরাসের ওপরে। দুর্বল হোরাস সেই আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। সেই সময়তেই সেথ হোয়ারসের দুটো চোখই উপড়ে নিলেন। এরপরে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন হোরাসকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব তিনিই রাজা।

-হোরাস তাহলে মারা গেলেন!

-আরে এখানেই তো ট্যুইস্টটা। মৃতপ্রায় হোরাসকে খুঁজে পান ওর পালিকা মা হাথোর। হাথোর এক বন্য হরিণকে ধরে তার দুধ দুয়ে নেন। তারপরে সেই দুধ একটু একটু করে ঢালেন হোরাসের দুই চোখের গহবরে। হাথোরের জাদুতে হোরাস ফের তার দৃষ্টি ফিরে পান। তারপরে আরো

অনেক যুদ্ধ, বাকবিতণ্ডা পেরিয়ে সেথকে হারিয়ে হোরাস রাজার সিংহাসনে বসেন। হোরাসের চোখের চিকিৎসা করেছিলেন হাথোর। তাই ইজিপ্সিয়ানদের বিশ্বাস ছিল এই চোখের জাদু ক্ষমতা আছে। মিশরীয় চিকিৎসকেরাও ওষুধের সাথে সাথে হোরাসের চোখের আকারে বানানো তাবিজ পরতে বলতেন। এইভাবেই হোরাসের চোখ মিশে গেছে ডাক্তারির ধ্যানধারণার সাথে।

পিজি এবারে আবার মুখ খুলল,

- ইয়েস! আমি জানতাম এই গল্পটার কথা! আমার ন'দাদু বলেছিল ! মনে পড়ে গেল সব। আমি আর তারপরে থাকতে পারিনি, ওর মাথায় একটা গাঁট্টা মারতেই হল। গুল দেওয়ারও তো একটা লিমিট আছে নাকি!

১৫

ফারাও

- স্পন্দন।
- হুঁ।
- স্পন্দন, শুনছিস?
- হুঁ, বল।
- কীরে? মোবাইলটা থেকে মুখ তুলে শোন আমি কী বলছি।
পিজির জন্য গেমটা হারলাম। বিরক্ত মুখে ওর দিকে তাকাতেই ও বলল,
- আমার না ভবেশদাকে কেমন একটা সন্দেহ হয় বুঝলি।
- কেন সন্দেহ হওয়ার কী আছে?
- কী আছে! তুইই বল, আজকে ব্যাঙ্কে আসার কী মানে?
- মানে আবার কী? মানুষ তো ব্যাঙ্কে আসতেই পারে। এতে অবাক হওয়ার কী আছে?
- তোর মাথাটা ওই কমিউনিটি মেডিসিন পড়ে পড়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। অন্য কোনও ব্যাঙ্কে এলে কথা ছিল না। কিন্তু একেবারে স্টেট ব্যাঙ্কের মেন অফিসে? ফরেন ট্রান্সাকশনের উইংয়ে ! একটা কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের গুমটির মালিকের এখানে আসার কী মানে? কে কী পাঠাচ্ছে বিদেশ থেকে? নাকি নিজেই বিদেশে...
পিজির কথা শেষ হওয়ার আগেই এন.আর.আই উইংয়ের দরজা খুলে ভবেশদা বেরিয়ে এল। হাতে দেখলাম সেই ক্যাটক্যাটে লাল রঙের ফাইলটাই আছে, যেটা নিয়ে ঢুকেছিল।
- যাক কাজটা মিটল। থ্যাঙ্কিউ পিজি ভাই, তোমার মামা এই ব্রাঞ্চে ছিলেন তাই কাজটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল।
- আরে এটা কোনো ব্যাপারই না ভবেশদা। তা আপনার এখানে দরকারটা কি ছিল? মানে যদি..
- তেমন কিছু নয়। আসলে আমার এক মামাতো ভাই থাকে ইংল্যান্ডে। তো ওর কটা কাজ আমাকে করতে দিয়েছিল। হয়ে গেছে। বাঁচা গেছে। চলো এবারে তোমাদের সেই দারুণ জিনিসটা খাওয়াব!

।।

গত সপ্তাহে ভবেশদাকে নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্ট্র্যান্ড রোডের ব্রাঞ্চে। যেটাকে সবাই সমৃদ্ধি ভবন বলে। ভবেশদার নাকি ওখানেই কি একটা কাজ ছিল। পিজির মামা ওখানে চাকরি করে। কেউ চেনা শোনা থাকলে একটু সুবিধা হয়, তাই পিজির আসা ভবেশদার সাথে। তবে আমার আসার কারণটা ছিল অন্য।
স্কুপ!

ব্যাঙ্কের কাজ ঠিকঠাক ভাবে হয়ে গেলেই আমাদের স্কুপে খাওয়াবে ভবেশদা। এই ছিল পিজির শর্ত। এতদিন স্কুপের নামই শুনে এসেছিলাম। দারুণ দারুণ আইসক্রিম পাওয়া যায় নাকি! আমি আর পিজি কেউই আগে আসিনি এখানে। স্ট্র্যান্ড রোডের স্টেট ব্যাঙ্কের অফিস থেকে মিনিট তিরিশের হাঁটা পথে স্কুপ। প্রিন্সেপ ঘাটের একটু আগেই। গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট রেস্টুরান্ট। দোতলা, ছিমছাম।
- আইসক্রিম তো খাওয়াবই, তার আগে তোমাদেরকে স্কুপের আরেকটা জিনিস খাওয়াই বরং।
- কী? মেনুতে তো দেখছি পিৎজাও আছে।
- না না , পিৎজা না, ওটা এখানে এমন কিছু বানায় না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই আগে চলো, এদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের কাছে ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি নস্যি।
দুটো বড় ঠোঙা ভর্তি করে ফ্রেঞ্চফ্রাই কিনে আমরা এসে বসলাম গঙ্গার ধারে। তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে চারটে। রোদের চড়া ভাবটা গায়ে লাগছিল না আশে পাশের গাছগুলোর জন্য। একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগছিল মুখে চোখে। স্কুপের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সত্যি খুব ভাল, কি একটা মশলা দিয়েছে, তাতে টেস্ট আরও খোলতাই হয়েছে, মুচমুচেও বেশ। মনের সুখে পা ছড়িয়ে বসে ফ্রেঞ্চফ্রাই খাচ্ছিলাম এমন সময় পিজি লাফিয়ে উঠল। দেখি এক পা তুলে নাচছে।
- উফফ! কী জোর কামড়েছে রে! একদম ফুলে গেল!
পিজি যেখানটায় বসেছিল সেখানে দেখি লাল ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল, একেবারে গিজগিজ করছে, গাছের নিচে পড়ে থাকা শুকনো পাতার আড়ালে ছিল তাই বুঝতে পারেনি। পিজি কীসব বিড়বিড় করতে করতে আর পা চুলকোতে চুলকোতে জায়গাটা বদলে বসল।
- খুব রাগ ধরছে না পিজি ভাই? এই পিঁপড়েরাই কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগে মিশরের রাজাদের কামড়াত। তোমার একটু গর্ব করাও উচিৎ ।
ততক্ষণে পিজি আবার মুখে এক গাদা ফ্রাইজ পুরেছে, স্বর বেরোনোর জায়গা নেই। তাই আমিই বললাম,
- মিশরের রাজা?! মানে ফারাওদের কথা বলছেন?
- হ্যাঁ, এই পিঁপড়ে গুলোকে বলে ফারাও অ্যান্ট। প্রাচীন মিশরেই নাকি এদের সবচেয়ে বেশি দেখা যেত, তাই এরকম নাম।

- আপনি কিন্তু খুফু ছাড়া বাকি ফারাওদের নিয়ে আমাদের কিছু বলেননি।
- বলাই যায়, হাতে সময় আছে তো?
- হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় তো অঢেল। কাল তো রবিবার, কলেজের চাপ নেই।

- ওকে। তাহলে বলাই যায়। তবে ফারাও শব্দটা কিন্তু খুব পুরনো নয়।
- মানে?
- মানে মিশরের রাজাদের সব সময় ফারাও বলা হত না। প্রথম যে রাজাকে ফারাও বলে সম্বোধন করা হয় সে হল আখেনাতেন। সময়টা মোটামুটি ১৩৫০ বিসি। কিন্তু মিশরের রাজাদের ইতিহাস আরো অনেক অনেক পুরনো। প্রথম যে রাজার হদিশ পাওয়া যায় সে হল নার্মার। যীশুর জন্মের একত্রিশ শো বছর আগের কথা এটা।
- তাহলে আগে রাজাদের কী নামে ডাকা হত?
- সেই সময়ে রাজাদের একটা না, তিনটে নাম থাকত বুঝলে।
প্রথমটা হল হোরাস নাম, মানে দেবতা হোরাসের সাথে নিজেকে মেলানো।
- মানে?
- মানে ধর এই নামগুলো- 'যোদ্ধা হোরাস' , 'শক্তিশালী হোরাস', 'সূর্যের সন্তান হোরাস' এরকম। হোরাস নামের পরে যে নাম আসত সেটা হল 'নেসুবিতি' নাম। মানে জন্মের সময় রাজার যে নাম ছিল।
আর নেসুবিতি নামের পরে আসত 'নেবতি' নাম, যে নামের মানে রাজা মিশরের উত্তর আর দক্ষিণ এই দুই ভাগেরই অধীশ্বর। এই নামে রাজাকে লিঙ্ক করা হত উত্তর মিশরের দেবতা নেখবেত আর দক্ষিন মিশরের দেবতা ওয়াজেতের সাথে।
পিজি এবারে বলল,
বাবারে! এত গুলো নাম একজনের!
- এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই ভাই। আমাদের রাজাদেরও তো এক গাদা উপাধি থাকত।
- হুমম, তা বটে। কিন্তু ফারাও নামটা এল কী করে?
- এর পিছনের গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং বুঝলে, মিশরীয়দের কাছে রাজাদের বিশাল প্রাসাদের উচ্চারণ ছিল 'প্র-ও'। রাজার হোরাস নাম লেখার সময় চৌকো রাজপ্রাসাদ এঁকে তার ভিতরে লেখা হত। এক সময় এই রাজ প্রাসাদই রাজার নামের সাথে মিশে যায়। পরে গ্রীকরা এই নাম উচ্চারণ করল পার-ও। আবার হিব্রু ভাষায় যখন ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখা হল তখন রাজার নাম হল পার-ওহ। সেখান থেকে ল্যাটিনে এল ফারাও। কোরানেও এই রাজাদের কথা লেখা আছে বুঝলে, আরবীতে উচ্চারণ ছিল ফিরা-ওন। সবশেষে ইংরাজীতে ল্যাটিন নামটাই চলে এল। তাই আজকে সবাই ফারাও নামটাই জানে।
- আচ্ছা ভবেশদা, একটা জিনিস মাথায় ঢুকল না, ফারাওরা নিজেদের সাথে ভগবানের নাম জুড়ত কেন? আমাদের কোনো রাজাকে এমনটা করতে দেখিনি।
- ফারাওদের তো নিজের নামের সাথে ভগবানের নাম জুড়তেই হত! সাধারণ মানুষের কাছে ওরাই তো হল ভগবানের প্রতিভূ। দেবী 'মাত' এর কথা বলেছিলাম মনে আছে?
- হ্যাঁ বলেছিলেন তো বুক অফ দ্য ডেড এর কথা বলার সময়।
- ঠিক, মাত ছিলেন ন্যায়ের দেবী। ফারাওদের প্রধান কাজটাই ছিল দেশ জুড়ে মাত বা ন্যায়কে বজায় রাখা। দেশের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। যা দেশের ব্যালান্স নষ্ট করে, তাই মাতের বিপক্ষে। তাই ফারাওদের যেমন বিদ্রোহ দমন করতে হত, বাইরের দেশের আক্রমণ প্রতিহত করতে হত তেমনই আবার দেশে খরা বা বন্যা হলে ফারাওদেরই দায়িত্ব ছিল ভগবানের উপাসনা করা। ভেবে দেখো একবার, কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। ফারাওদের প্রায় গোটা বছরটাই কাটত নীল নদে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ট্রাভেল করে। তার

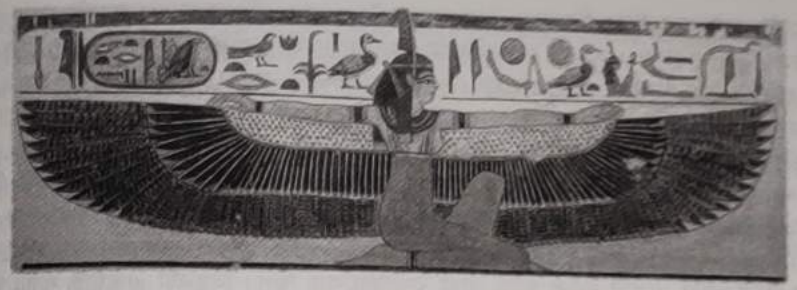

মাত

ওপরে কোথাও যুদ্ধ লাগলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হত। ক্ষমতার লোভে রাজ পরিবারের মধ্যেও খুন খারাপি কম হত না। তাই বেশিরভাগ ফারাওই ৩০-৪০ বছরের বেশি বাঁচেননি।
এবারে তোমরা একটা কথা বল দেখি, ফারাওদের ছবি দেখে চিনবে কি করে?
পিজি বলল, ছবি দেখেছি তো অনেক, মাথায় একটা কভারের মতো থাকে, মুখে আবার একটা লম্বা দাড়ি, এদিকে গোঁফ কামানো।
- হুমম, কিছুটা ঠিক বলেছ। তবে ফারাও বলতেই আমরা যার ছবির কথা ভাবি সেটা তুতানখামেনের মুখোস। কিন্তু ওই মাথার কভার আর দাড়ি ছাড়াও আরো অনেক কিছু বোঝার আছে। গুগুলে সার্চ দিয়ে তুতানখামুনের ছবিটা বার করো তো।
ছবিটা এতই বিখ্যাত যে খুঁজে পেতে দশ সেকেন্ডও লাগল না, আমার মোবাইলের স্ক্রিনের ওপরে ঝুঁকে এল ভবেশদা আর পিজি।
- ভাল করে দেখো ছবিটা,মাথার ওপরে সাপটা দেখতে পাচ্ছ? ওটা কি বলো তো?

- ইউরেয়াস? সেই দেবতা আতুম এর মেয়ে?
- বাহ! একদম ঠিক ধরেছ। সেই ইউরেয়াসই বটে। তবে এখানে এই সাপ হল দক্ষিন মিশরের সেই দেবতা ওয়াজেতের প্রতীক, আর তার পাশে দেখ , একটা শকুনের মাথা দেখতে পাবে।

- বুঝে গেছি, এটা হল উত্তর মিশরের অন্য আরেকটা দেবতা, কী যেন নাম বলেছিলেন?
- নেখবেত। তুতানখামুনের মাথার যে কভারটা, ওর নাম হল নেমেস। মিশরের প্রায় সব রাজার মূর্তি বা ছবিতে এই নেমেস দেখতে পাবে। কিছুর সাথে এই কভারটার মিল পাচ্ছ? দেখ কেমন কানের মাথার দুপাশ দিয়ে কাঁধের কাছে নেমে গেছে।
- অনেকটা সিংহের কেশরের মতো!
- ঠিক ধরেছ! সিংহের কেশরের মতো করেই নেমেসকে বানানো হয়েছিল। যাতে সিংহের মতো সাহস আর শক্তি যে রাজার মধ্যে আছে সেটা বোঝা যায়। এবারে দাড়িটার দিকে খেয়াল করো। মিশরে পুরুষদের গাল পরিষ্কার করে কামানো থাকত, গোঁফ বা দাড়ি রাখার চল ছিল না। কিন্তু ফারাওদের একটা নকল দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক ছিল। নিয়মটা এতটাই কড়া ছিল যে হাতসেপসুত নামের একজন রানী যখন নিজেকে ফারাও বলে ঘোষণা করেন তখন মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই ফলস দাড়ি লাগাতেই হয়। তুতানখামুনের দাড়ির নিচটা দেখ একটু সামনের দিকে বাঁকা, তাই না?
- হ্যাঁ।
- এবারে চট করে রামেসিস সেকেন্ড বলে সার্চ দাও তো। যে ফারাওয়ের মূর্তিটা আসবে সেটা ভাল করে দেখো।
রামেসিসের মূর্তিও চট করে পাওয়া গেল।

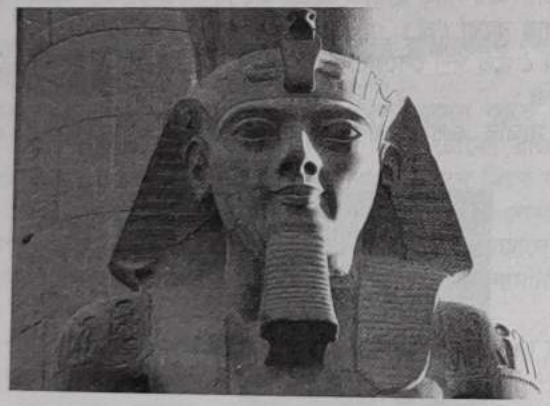

- মাথার ওপরের সাপ আর নেমেস টুপিটা তো দেখতেই পাচ্ছ। শকুনটা নেই, মানে সেই সময় রামেসিস শুধু মাত্র দক্ষিণ মিশরের রাজা ছিলেন। এবারে দাড়িটা খেয়াল করো। কোন তফাত আছে?
- আছে তো। এই দাড়িটা একদম সোজা নেমে গেছে দেখছি।
- হ্যাঁ , তার মানে যখন এই মূর্তি বানানো হয় তখন রাজা জীবিত ছিলেন।আর তুতান খামুনের মুখোসটা বানানো হয় ওর মারা যাওয়ার পরে। তাই দাড়িটাও সামনের দিকে বাঁকানো।
- বাহ, তাহলে শুধু মাথা দেখেই তো ফারাওয়ের ব্যাপারে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়!
- হ্যাঁ যায় তো। এবারে তুতান খামুনের হাতের দিকে খেয়াল করো। কী দেখতে পাচ্ছ?

- একটা হাতে একটা লাঠির মতো ধরা আছে, মাথার দিকটা গোল করে বাঁকানো। আরেক হাতে ধরা লাঠির মাথায় তিনটে ছোট ছোট কাঠি লাগানো আছে।
- পরের যে লাঠিটার কথা বললে সেটার বাংলা কোনও শব্দ নেই, ইংরাজীতে একে ফ্লেইল বলে। এইটা দিয়ে মেরে মেরে শস্য ঝাড়াই করা হত। এর মানে ফারাও দেশের শস্যেরও রক্ষাকর্তা। আর প্রথমের যে লাঠিটার কথা বললে সেটা হল রাজদন্ড বা স্কেপটার । এটা সব সময় নেতার হাতে দেখবে। যেমনটা আগের দিন দেবতা আতুমের হাতে ছিল। এই মাথার কাছে বাঁকানো স্কেপটারের নাম হল হেকা। আবার আতুমের হাতে থাকা স্কেপটারের নাম হল ওয়াস। একটা মজার জিনিস দেখাই তোমাদের, মোজেসের একটা ছবি খুঁজে বার করো দেখি।
বেরলো সেই ছবি।

এবারে ভাল করে দেখো তো মোজেসকে।
- হুমম, লম্বা দাড়িওলা, এক হাতে কমান্ডমেন্টস লেখা স্ল্যাব ধরে আছে, আরেক হাতে... আরে ! সেই লাঠি! মাথাটা বাঁকানো ! হেকা!
- ঠিক ধরেছ। বাইবেলের শুরুই তো মিশরে। মোসেসের এক্সোডাস মনে আছে? সেটা হয়েছিল ফারাও দ্বিতীয় আমেনহোতেপের সময়। ইংরাজী টেন কম্যান্ডমেন্টস সিনেমাটাতে যদিও দেখিয়েছিল দ্বিতীয় রামেসিসকে। সেটা একটা বেশ বড় ভুল।
গল্প করতে করতে কখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ফুরিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। পিজি এবারে ডাস্টবিনে ঠোঙাটা টিপ করে ফেলে বলল,
- একটা কথা বললেন না ভবেশদা। হায়রোগ্লিফ শেখার সময় খেয়াল করেছিলাম শুধু ফারাওদের নাম গুলো কেমন একটা চ্যাপ্টা চাকতির মতো জিনিসে কভার করা।
- ও আচ্ছা। কার্তুজের কথা বলছ?
- অ্যাঁ? ওগুলোকে কার্তুজ বলে?
- হ্যাঁ তাই বলে তো। তবে প্রথমে কিন্তু এমনটা ছিল না বুঝলে, এটা ছিল একদম গোল। নাম ছিল শেন। আকারটা গোল ছিল কারণ এর কোনও শুরু বা শেষ নেই। তাই ফারাওদের অমরত্ব

প্রমাণ করার জন্য ওদের নাম লেখা হত শেনের মধ্যে। তবে এতে একটা মুশকিল হল। ভাল করে গুছিয়ে ফারাওয়ের নামটা শেনের মধ্যে লেখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই শেনের আকার আসতে আসতে বদলে লম্বাটে হয়ে গেল।

- তাহলে কার্তুজ, এমন নাম কেন? এটাও কি ইজিপ্সিয়ান নাম।

- ধুস, একদমই ইজিপ্সিয়ান নয়। ফ্রেঞ্চ।

- বলেন কী! ফ্রেঞ্চ?

- হ্যাঁ। নেপোলিয়নের সেনারা ইজিপ্টে আসার পরে চারিদিকের মন্দিরে, কবরের দেওয়ালে এই লম্বাটে চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু তখনও তো হায়রোগ্লিফের মানে কেউ জানতই না। তাই কী লেখা আছে ওতে সে ব্যাপারে কোন ধারণাই হয়নি ওদের। চিহ্নটা দেখতে অনেকটা বন্দুকের গুলির মতো ছিল। যার ফরাসি নাম কার্তুজ। তাই ওরকম নাম হয়ে গেল।

কার্তুজ

- আচ্ছা ভবেশদা, আপনি ফারাওদের গল্প জানেন? মানে আমরা তো যেটুকু জানি তা ওই তুতানখামুনেরই।

- হ্যাঁ, তুতানখামেন তো ওয়ান অফ দি মোস্ট ইন্সিগ্নিফিক্যান্ট ফারাও ছিলেন। রামেসিস, হাতসেপসুত, আখেনাতেন ,সেতি এদের গল্প বললে অবাক হয়ে যাবে! আমি জানি কিছু কিছু , আরো কিছু পড়ছি এখনো। বলব তোমাদের এক এক করে। তবে ফারাওদের গল্পটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবরে শুরু বুঝলে।

- কবরে? মানে ঠিক বুঝলাম না।

- অধিকাংশ ফারাওদেরই তো জীবদ্দশায় লেখা কোনও জীবনী পাওয়া যায় নি। সেই সময় রাজদরবারে হওয়া কাজ কর্মের রোজনামচা লিখে রাখারও কোন চল ছিল না। তাই ফারাওদের সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা ওই ফারাওদের প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরের গায়ে অথবা ওদের কবরের গায়ে লিখে রাখা লিপি থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সেগুলো অনেক বাড়িয়ে বলা, রাজাকে গ্লোরিফাই করার জন্য। তবে ওইটাই আমাদের এক মাত্র সম্বল । সেই সব কবর আর

মন্দির আবিষ্কার করার গল্পও দারুণ ইন্টারেস্টিং! তাই ফারাওদের গল্প বলতে গেলে তার সাথে জড়িয়ে থাকা আর্কিওলজিস্টদের গল্পও চলে আসবে।

- যেমন হাওয়ার্ড কার্টার!

- শুধু কার্টার না, বেলজোনি, বুর্কার্ট, জাহি হাওয়াস এমন অনেকের কথা বলতে হবে। এখন চলো স্কুপে ফেরা যাক। আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প করা যাবে না হয়।

১৬

বেলজোনি

১৮০৩ সালের লন্ডন শহরের ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের কাছে সার্কাস বসেছে। কাপড় দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় থিক থিক করছে লোক। মাঝের ফাঁকা গোল অংশে খেলা দেখানো চলছে। তবে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে শেষ খেলাটার জন্য। এই জন্যই এত ভিড়। খেলাটার নাম 'হিউম্যান পিরামিড' ! সাতফুট লম্বা একজন মানুষ স্টেজের মাঝে এগিয়ে আসে। চওড়া কাঁধ, লম্বা চুল, নীল চোখের মণি। হারকিউলিসের মতো চেহারা। সেই লোকটার দুদিকে ছড়িয়ে রাখা হাতের ওপর ভর দিয়ে একে একে কাঁধে উঠে পড়ে বারো জন মানুষ!

- অ্যাঁ! বারোজন!

মুখের কাছে আইসক্রিমটা চামচে করে এনে হাঁ হয়ে রইল পিজি।

- হ্যাঁ, বারোজন। কি রকম শক্তিশালী মানুষ খালি ভাবো। ওই পিরামিডের চুড়ো তৈরি করত একটা সুন্দরী মেয়ে। সে নাকি আবার এই দৈত্যের স্ত্রী। সার্কাসের রিং-এ এই লোকটার গাল ভরা নাম 'প্যাটাগোনিয়ান স্যামসন'। তবে মিশরের আর্কিওলজির ইতিহাসে ও অমর হয়ে আছে ওর আসল নামে। জিওভান্নি বাতিস্তা বেলজোনি।

- জিওভান্নি? নামটা শুনে ইতালিয়ান মনে হচ্ছে তো।

- ইতালিয়ানই তো। ১৭৭৮ এ ইতালির পাদুয়া নামের একটা ছোট্ট শহরে জন্ম হয়েছিল বেলজোনির। বাবা ছিল গরীব নাপিত। খুব ছোট বয়স থেকেই ও বাবার দোকানে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু ওই কাজ ওর কোনদিনই ভাল লাগত না। তাই ১৬ বছর বয়সে দাদা ফ্রাঞ্চেস্কোর সাথে পালিয়ে এসেছিল রোমে। ১৭৯৭তে রোম দখল করল ফ্রেঞ্চরা। জোয়ানদের তখন ফ্রেঞ্চ আর্মিতে নাম লেখাতেই হবে। জিওভান্নি তাই পালিয়ে গেল হল্যান্ডে। সেখানে হাইড্রলিক মেশিনের কাজ শিখল বেশ কয়েক বছর। তার পরে গন্তব্য লন্ডন। আশা ছিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাবে। কিন্তু কেউ ওকে কাজ দিতে রাজী হল না। অতঃপর জিওভানি বেলজোনির জায়গা হল লন্ডনের সার্কাস।

- কিন্তু একজন সার্কাসে খেলা দেখানো লোক আর্কিওলজিস্ট হয়ে গেল কী করে?!

- ডেস্টিনি স্পন্দন ভাই, ডেস্টিনি। সার্কাসে খেলা দেখিয়ে রোজগার মন্দ হত না । কিন্তু তাতে তো সম্মান ছিল না। ন'বছর বিলেতে কাটাবার পরে তাই একদিন বেলজোনি সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিজের ভাগ্য বদলাবার জন্য। সাথে ওর স্ত্রী সারা আর খাস চাকর জেমস কার্টিন। অন্যদিকে মিশরে তখন একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছেন তখনকার শাসক পাশা মহম্মদ আলি। লজ্জায় প্রায় নাক কাটা যাবার উপক্রম বলতে পারো।

পিজি বলল, কি কেস?

- কেস খুব জন্ডিস তখন বুঝলে। মামলুক লিডারদের সরিয়ে আলি পাশা মিশরের মসনদে বসার পরে ঠিক করেন দেশটাকে ভাল করে সাজাতে হবে। সেই মত নতুন নতুন প্রাসাদ গড়ে উঠতে লেগেছিল কায়রো আর তার চার পাশের শহর গুলোতে। তবে শুধু শহর গড়লেই তো আর হবে না। দেশে জলের অভাব বরাবরই ছিল। চাষবাসের জন্য বা শহরের রোজকারের কাজে লাগাবার জন্য নীলনদ থেকে জল তুলে আনতে হবে। তার জন্য চাই ভাল কোয়ালিটির পাম্প। এদিকে সেই

পাম্প বানানোর মতো ইঞ্জিনিয়ার গোটা দেশে নেই। যেটুকু জল ওঠে সেটা ষাঁড়ে টানা সাক্কিয়া নামের একরকমের প্রাগৈতিহাসিক নকশার দুর্বল পাম্পে। ভাল পাম্প কেনার জন্য তাই পাশাকে তাকাতে হল ইউরোপের দিকে। প্রথম সুযোগেই ব্রিটিশরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা বলল আমরা একটা দারুণ পাম্প আপনাকে দিতে পারি। যার কারিগরী সবচেয়ে আধুনিক। পাশা রাজী হয়ে গেলেন। একটা পাম্প কিনতে আলি পাশার খরচা হল তখন কার দিনের মুদ্রায় ১০,০০০ পাউন্ড। মানে প্রায় নব্বই হাজার টাকা। এখনকার হিসাবে সেটা প্রায় তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা হবে।

- বলেন কি! অত টাকা দিয়ে একটা পাম্প! ব্রিটিশরা বেশ ভাল লেভেলে বোকা বানিয়ে ছিল তো দেখছি পাশাকে।

- দাঁড়াও দাঁড়াও, শুধু এখানেই বোকা বানানোর শেষ নেই। ব্রিটিশ পাম্প তো এসে পৌঁছল পাশার কাছে। কিন্তু সেই পাম্প চালানো শেখাবার জন্য কেউ এল না ইংল্যান্ড থেকে। একটা আদ্দামড়া মেশিন নিয়ে পাশা বোকার মতো বসে রইলেন।

- এ বাবা। একদম যা তা লেভেলে ঠকেছিলেন দেখছি আলি পাশা।

- তা আর বলতে? পাশা সেইজন্য নিজের খুব কাছের একজনকে পাঠিয়েছিলেন ইউরোপে। তার নাম ইসমায়েল জিব্রালটার। জিব্রালটারের কাজ ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে পাশার কাছে নিয়ে আসা। এই জিব্রালটার যখন ইউরোপের উত্তর দিকের একটা ছোট্ট দ্বীপ মালটাতে ঘুরছেন তখন ওর সাথে আলাপ হল একজন ইতালীয়র। কে বলোতো লোকটা?

আমি আর পিজি দুজনেই ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলাম।

- আচ্ছা কয়েকটা হিন্টস দিচ্ছি। ইতালীয় হলেও সে থাকত ইংল্যান্ডে। লম্বা চওড়া চেহারা, গালে দাড়ি। চোখের মণি নীল। ইসমায়েলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। সার্কাসে খেলা দেখানোর কথা থোড়াই কেউ নিজের সিভিতে রাখে !

- বেলজোনি!

- একদম ঠিক ধরেছ। ইংল্যান্ড ছেড়ে বেড়িয়ে এসে পর্তুগাল, স্পেন, সিসিলি হয়ে বেলজোনি এসে পৌঁছয় মালটাতে। ইসমায়েল পাম্প চালাবার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছে জানতে পেরে নিজেই আলাপ জমান। এদিকে ইসমায়েলও বেলজোনিকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ১৮১৫ সালের ১৯শে মে জিওভান্নি বাতিস্তা বেলজোনি ওর স্ত্রী আর চাকরকে নিয়ে এসে পৌঁছল মিশরে। তখনও বেলজোনির কোন ধারণাই ছিল না যে ওর গোটা জীবনটাই বদলে যেতে চলেছে।

বেলজোনি পাশার সাথে দেখা করেই জানিয়ে দিল যে ব্রিটিশ কোম্পানির দেওয়া পাম্প সে চালাতে জানে না। কিন্তু অনেক কম খরচে এমন একটা পাম্প ও বানিয়ে দিতে পারবে যেটা সাক্কিয়া পাম্পের থেকে ঢের ভাল কাজ করবে। এক বছর ধরে বেলজোনি সেই মেশিন বানালো। গোল ড্রামের মত দেখতে একটা অংশকে একটা ষাঁড় ঘোরাবে। আর তার থেকে তৈরি হওয়া এনার্জিতেই জল উঠবে। ডেমনস্ট্রেশনের দিন সেই পাম্প বেশ ভালই কাজ করল। ছটা সাক্কিয়া পাম্প যে পরিমাণ জল তোলে তার সমান জল তুলে দেখালো বেলজোনির মেশিন। পাশা তো খুব খুশি। কিন্তু বেলজোনির এই সাফল্য পাশার দরবারের অনেকের সহ্য হল না। আগে থেকেই তারা একটা প্ল্যান বানিয়ে রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজন পাশাকে বলল আচ্ছা ষাঁড়ের বদলে যদি মানুষই ড্রামটাকে ঘোরায় তাহলে কি হবে। মজা দেখার আশায় পাশা রাজীও হলে গেল। ষাড়টাকে সরিয়ে ১৫ জন মানুষকে দাঁড় করানো হল সেই জায়গায়। তাদের মধ্যে বেলজোনির চাকর জেমসও ছিল। ড্রাম আসতে আসতে ঘুরতে লাগল। হঠাৎই জেমসকে ছেড়ে দিয়ে বাকি চোদ্দজন সরে দাঁড়ালো। বিশাল বড় আর ভারী ড্রামটা ভারসাম্য না রাখতে পেরে পড়ল জেমসের

ওপরে। ওটা জেমসকে পিষেই ফেলত, যদি না বেলজোনি নিজের অতিমানবিক শক্তি দিয়ে ড্রামটাকে সামলে না রাখত। কিন্তু ততক্ষণে বেচারা জেমসের থাইয়ের হাড় হয়ে গেছে দুটুকরো। প্রথম কাজ করার দিনেই এই মেশিনে একজন আহত হল। অতএব এই মেশিন অপয়া। আলি পাশা এমনটাই মনে করলেন। বাতিল হয়ে গেল বেলজোনির মেশিন। এক বছরের পরিশ্রম জলে গেল। তার সাথে বন্ধ হয়ে গেল রোজগারের পথও।

পিজি এতক্ষণ ধরে মন দিয়ে গল্প শুনতে শুনতে খেয়াল করেনি যে ওর ভাগের সানডিটা গলে জল হয়ে গেছে। মুখ ব্যাজার করে একটা চুমুকে সেটা সাবাড় করল প্রথমে। তারপরে ভবেশদাকে বলল,

- দেখলেন তো , আপনার গল্প শোনার চক্করে আমার আইসক্রিমটাই গলে গেল। এদিকে আপনার বেলজোনির এখনও আর্কিওলজিস্ট হয়ে ওঠা হল না।

বাইরে তখন সন্ধে হচ্ছে। আমরা স্কুপের দোতলায় বিশাল বড় কাঁচের জানলাটার পাশের টেবিলে বসেছিলাম। সেকেন্ড ব্রিজের জ্বলে ওঠা আলোতে নদীটাকে দেখতে দারুণ সুন্দর লাগছিল। মন চাইছিল না উঠতে ওখান থেকে। এদের ওয়েটারগুলোও ভাল। একদম তাড়া লাগায় না। আমি পিজিকে বললাম,

- তোর টুটিফুটি নিয়ে দুঃখ তো? ওকে আমি খাওয়া...

- আরে তুমি কেন? আমিই খাওয়াচ্ছি। আজকে প্রদীপ্তর জন্য এত বড় একটা কাজ হল আমার। আর একটা আইসক্রিম খাওয়াতে পারব না? চলো আরেক রাউন্ড করে হয়ে যাক।

পিজি আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে আসার পরে ভবেশদা আবার গল্প বলা শুরু করল,

- মিশরে থাকতে থাকতেই বেলজোনির আলাপ হয়েছিল একজন সুইস আর্কিওলজিস্টের সাথে। নাম জোহান লাডউইগ বুর্কার্ড। বুর্কার্ডই সম্ভবত প্রথম ইউরোপিয়ান, যে ইজিপ্ট দেশটার এমাথা থেকে ওমাথা চষে ফেলেছিলেন । এই বুর্কার্ডই আবু সিমবেলের মন্দির খুঁজে বার করেছিলেন। সেই গল্পটাও দারুণ। তবে সেটা অন্য আরেকদিন হবে'খন। আজকে বেলজোনির কথাই বলি। বুর্কার্ডের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বেলজোনিকে খুব টানত। সেই সময় আবার বুর্কার্ড প্ল্যান করছেন একটা ক্যারাভানে করে সাহারা মরুভূমি পেরিয়ে টিমবাকটু যাওয়ার। সেই অভিযানে তিনি একাই যাবেন, আর কাউকে নেওয়ার ইচ্ছা নেই। তবে বুর্কার্ড বেলজোনিকে একটা অন্য ঐশ্বর্যের খবর দিলেন।

নীলনদের পশ্চিম পাড়ের কাছে থাকা একটা জায়গার নাম গুর্না। লাক্সর শহরের কাছেই। গুর্নাতে নাকি একটা ভাঙা মন্দির আছে। পরিত্যক্ত জায়গা, কেউ যায়না সেখানে। কিন্তু সেখানেই বেলজোনি একটা দারুণ জিনিসের খোঁজ পেয়েছেন। মসৃণ গ্রানাইট পাথরের তৈরি একটা বিশাল বড় ফারাওয়ের মূর্তি। ৯ ফুট লম্বা, ওজন প্রায় ৭ টন। মানে প্রায় ৬,৫০০ কিলো! মাথাটা অক্ষত থাকলেও বুকের নিচের অংশ থেকে ভেঙে গেছে। সেই সময় ইজিপ্টের এদিকে ওদিকে ফেঞ্চ আর ব্রিটিশরা টুকটাক যা পাচ্ছে তুলে নিয়ে দেশে যাচ্ছে। এই মূর্তিটার কথাটাও অনেকেই জানতো। কিন্তু এত বড় একটা কিছুকে হস্তগত করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। মূর্তিটাকে টেনে নীলনদের পাড়ে নিয়ে আসাটাই তো প্রায় অসম্ভব। সেই সময় তো ফারাওয়ের নাম কেউ বুঝতে পারেনি। ইউরোপিয়ান এক্সপ্লোরাররা এর নাম দিয়েছিল কম বয়সের মেমনন। মেমনন ছিল ইলিয়াডের একটা চরিত্রের নাম। তবে তার আগেও গ্রীকরা এঁকে অন্য নামে ডাকত। অজিমেন্দিয়াস।

বেলজোনির মনে হল ওর জন্যই যেন পাথরের টুকরোটা অপেক্ষা করে আছে। তাই আরেকবার বেলজোনি আলি পাশার দরবারে হাজির হল। এবারে ইচ্ছাটা অন্যরকম, মূর্তিটাকে ও তুলে

ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চায়।
- কিন্তু ওই সাড়ে ছ'হাজার কিলোর পাথর টানা তো অসম্ভব ছিল বললেন।
- হুঁ, আলি পাশাও সেরকমই ভেবেছিলেন। বেলজোনির কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ ভেবে ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যস, ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে বেলজোনিকে দেখা গেল নীলনদের পশ্চিম তীরে, গুর্নাতে।
পাথরের মূর্তিটার বেশ খানিকটা মাটির নিচে গেঁথে ছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যরা এর আগে চেষ্টা করেছিল একে তুলে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার। ওরা ভেবেছিল গানপাউডার দিয়ে মূর্তিটার কাঁধ থেকে মাথাটাকে আলাদা করে দেওয়া যাবে। তাহলে শুধু মুন্ডুটাকে বয়ে নিয়ে গেলেই হল। তাই জন্য ডানকাঁধে ড্রিল করে গর্তও বানিয়েছিল। কিন্তু সেই গানপাউডারের ব্লাস্টের চোটে মুর্তির মুখেও ক্ষতি হতে পারে, তখন অতটা বিস্ফোরকের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই ভেবে রণে ভঙ্গ দেয় ওরা।
ব্রিটিশ কনসাল জেনেরাল হেনরি সল্টকে খুব বুদ্ধি করে রাজি করায় বেলজোনি। সল্টের ওপরেই তখন দায়িত্ব ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইজিপ্টের প্রত্নতত্ত্বগুলোকে নিয়ে যাওয়ার। সল্ট দেখল বেশ ভাল সুযোগ, ওকে খাটতেও হবে না। খাটবে এই দানবের মতো চেহারার লোকটা। এদিকে মুর্তিটাকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর জন্য ওর বেশ নামও হয়ে যাবে। তাই সল্টও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সল্টের কাজ মুর্তিটাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর থেকে ইংল্যান্ডে পাঠানো। আর বেলজোনির কাজ ওটাকে লাক্সর থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসা।
বেলজোনির সামনে দুটো চ্যালেঞ্জ ছিল। তার প্রথমটা অবশ্যই মূর্তিটাকে টেনে নীলনদের পাড়ে নিয়ে আসা। আর পরেরটা হল মরশুম। সামনেই আসছে বর্ষাকাল। নীলনদে বন্যা আসবে। দুই পাড়ই ভেসে যাবে। মূর্তিটা চলে যাবে জলের তলায়। জল নামলেও কাদামাটির মধ্যে থেকে মূর্তিটাকে তোলা অসম্ভব একটা কাজ হয়ে যাবে। অতএব হাতে সময় কম।

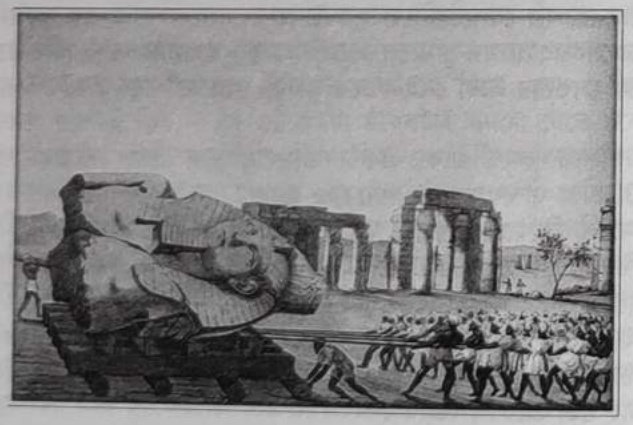

কাঠের লিভার বানিয়ে মুর্তিটাকে মাটি থেকে তোলা গেল। তারপরে ওটাকে বসানো হল একটা বেশ বড় কাঠের পাটাতনে। সেই পাটাতনের নিচে লাগানো হল চারটে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি। এবারে কাঠের পাটাতনটা চাকা লাগানো স্লেজ গাড়ির মত দেখতে হল বেশ। এই

স্লেজকে টানতে লাগল আশি জন মানুষ। বেলজোনি নিজেও হাত লাগালো। টানা ষোলদিন ধরে অমানুষিক পরিশ্রমের পরে যুবক মেমনন পৌঁছল নীলনদের তীরে। তারপরে মাস কয়েকের মধ্যেই সেটা পৌঁছল লন্ডনে। যেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মূর্তিটাকে বসানো হল সেদিন গোটা লন্ডন শহর ভেঙে পড়ল দূর দেশ থেকে আনা সেই আশ্চর্যকে দেখার জন্য। সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন একজন কবিও, নাম পার্সি শেলি। নাম শুনেছ?
- মেরি শেলির নাম শুনেছি, 'ফ্রাঙ্কেস্টাইন' যার লেখা।
- হ্যাঁ, পার্সি শেলি ওর স্বামী ছিলেন, সেই সময়কার বেশ নাম করা কবি, কিন্তু স্ত্রীয়ের খ্যাতির কাছে ওর নাম চাপা পড়ে যায়। এই শেলি সেই মূর্তিটাকে দেখে একটা কবিতা লেখেন। ইংরাজী সাহিত্যে সেই কবিতা বেশ বিখ্যাত। এর নাম 'অজিমেন্দিয়াস'।
- হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নামের একটা কবিতার কথা শুনেছিলাম বটে। তবে এইটাই যে তার পিছনের গল্প, সেটা জানতাম না।
গলার স্বরটা ভারী করে বলল পিজি। আমি ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই বলল,
- কী হয়েছে? আমি এটা জানতে পারি না? আমার মাসতুতো দিদি ইংরাজীতে এম.এ করছে। ও বলেছিল।
- তোর আবার মাসি আছে নাকি? আমি তো জানতাম শুধু এক মামা, যে চুঁচড়োতে..
- তোকে কি সব বলতে যাব নাকি? এই মাসি মায়ের জাঠতুতো বোন। এবারে হয়েছে? দেখুন ভবেশদা ভাল আলোচনাটার কেমন তাল কাটছে স্পন্দন। ওকে এবার থেকে আর এসব গল্পের মধ্যে ডাকবেন না।
ভবেশদা মুখে কিছু না বলে পিজির দিকে তাকিয়ে শুধু বাঁকা হাসল। কিন্তু ছেলেটা সেটাকে অগ্রাহ্য করে ভবেশদাকে এবারে বলল,
- আচ্ছা, তাহলে অজিমেন্দিয়াস আর যুবক মেমনন একই মূর্তির দুটো নাম এটা বুঝলাম। কিন্তু ফারাওয়ের আসল নামটা তো বললেন না। এতদিনে নিশ্চয়ই জানা গেছে।
- সে তো গেছেই। এই একমাত্র ফারাও যে নব্বই বছর বেঁচেছিল। গোটা ইজিপ্ট জুড়ে বানিয়েছিল নিজের মন্দির। ইজিপ্টোলজিস্টরা একে বলে দি ফারাও অফ প্রপাগান্ডা। এই সেই দ্বিতীয় রামেসিস! যার আবু সিম্বেলের মন্দির আবিষ্কার করেছিল জোহান বুর্কার্ড।

রামেসিসের সেই মূর্তি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

- আরিব্বাস! রামেসিসের গল্পটাও বলবেন তো!!
- বলতেই পারি, যদি তোমাদের এনার্জি থাকে তো। বেলজোনির গল্পও তো অনেক বাকি এখনও। দুটো করে আইসক্রিম সাঁটিয়ে আমাদের এনার্জি তুঙ্গে ছিল। আর ভবেশদার মুখে এই সব গল্প গুলো ছাড়া যায় নাকি!

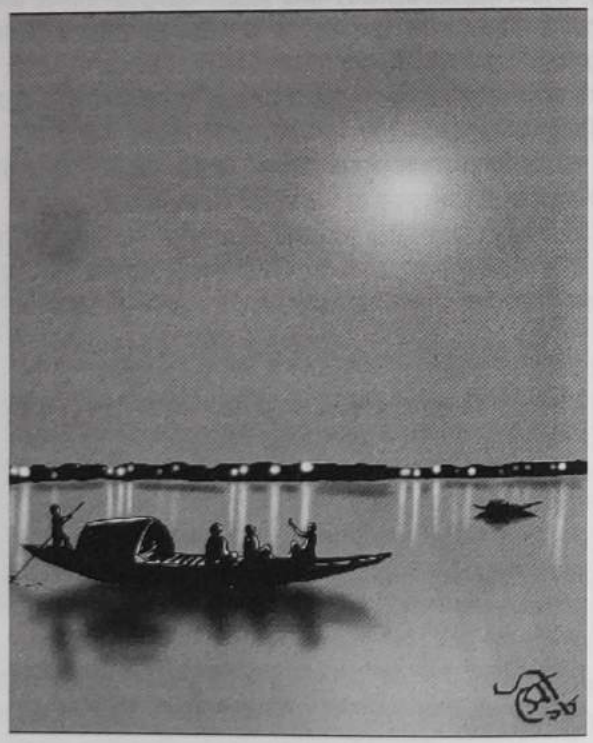

১৭

আবু সিম্বেলের মন্দির

স্কুপ থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে সাতটা বেজেছিল। একগাদা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর দুটো সানডি খাওয়ার পরে আমাদের কারোর পেটেই আর জায়গা ছিল না। রেস্ট্যুরেন্টের বাইরের রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ভুঁড়িটায় হাত বোলাতে বোলাতে ভবেশদা বলল,
- এই দিকটায় এলাম, কিন্তু একটা কাজ করা বাকি রয়ে গেল।
পিজি বল, কী করবেন? চক্ররেলে চড়ার কথা ভাবছেন নাকি? ওতে কিন্তু খুব একটা ভাল গঙ্গার ভিউ পাওয়া যায় না, আমি একবার...
- ধুস, ওটার কথা বলছি না। গঙ্গাকে দেখার জন্য শুধু গঙ্গার পাশ দিয়ে গেলেই হবে নাকি?
মিনিট কুড়ির মধ্যেই ভবেশ সামন্তর সাথে নৌকাতে উঠতে দেখা গেল এই অধম আর পিজিকে। রাতের অন্ধকারে গঙ্গার বুকে ভেসে থাকতে দারুণ লাগে। নদীর দুটো পাড়ে কোলকাতা আর হাওড়া শহরের আলোগুলো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল কোনও অচেনা জগতে বসে আছি। ঠান্ডা হাওয়াতে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ভবেশদা বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে ছিল। তারপরে যেই না গুনগুন করে কি একটা গান শুরু করার উপক্রম করেছে অমনি পিজি বাধ সাধল তাতে,
- বলছি রামেসিসের গল্পটা...
- আগে গান হবে।
এই বলে বেসুরো গলায় আমি যামিনী তুমি শশী হে দুলাইন গেয়ে পরের লাইনগুলো গুলিয়ে ফেলে থামল ভবেশ দা। তারপরে বলল,
- হ্যাঁ রামেসিসের যে গল্পটা বলব বলছিলাম,
আমরা এবারে একটু নড়েচড়ে বসলাম।
- দ্বিতীয় রামেসিস ছিল নাইন্টিন্থ ডাইনেস্টির ফারাও। এই ধরো যীশুর জন্মের সাড়ে বারোশো বছর আগের কথা। মিশরের দক্ষিণ দিকে ছিল হিটাইট প্রজাতির রাজত্ব। রামেসিসের মনে হল এই হিটাইটদের জব্দ করতেই হবে। দেশের ফারাওকে মানবে না এ কেমন কথা! যেমনি ভাবা তেমনি কাজ, রামেসিস ২০০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরোলেন। সমান চার ভাগে ভাগ করা হল সেই সৈন্য দলকে। দলগুলোর নাম দেওয়া হল দেবতাদের নামে। আমেন, রে, তাহ আর সেথ। ফারাও ওদের নিয়ে একমাস ধরে পাহাড়, মরুভূমি ডিঙিয়ে এসে পৌঁছলেন কাদেশ নামের এক শহরের কাছে ওরন্তেস নামের নদীর তীরে। সেখানে ওর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গেল দুই হিটাইট গুপ্তচর। ওদেরকে জেরা করে রামেসিস জানতে পারলেন যে হিটাইটদের রাজা

মুওয়াতালিস ফারাওয়ের ভয়ে আরো একশো মাইল দূরে পালিয়েছে।
রামেসিস ভাবলেন বাহ্ তাহলে তো হাতে সময় পাওয়া গেল। এই ভেবে শুধুমাত্র আমেন দলের সৈন্যদের নিয়ে ওরন্তেস নদী পার করে ঘাঁটি গাড়লেন কাদেশ শহরের প্রান্তে। রে দলের সৈন্যরাও নদী টপকাল, আর আমেন দলের থেকে একটু দূরে থেকে তাঁবু ফেলল। বাকি দুটো দল রয়ে গেল নদীর অন্য পাড়েই। রামেসিসের প্ল্যান ছিল শান্তিতে রাতটা কাটিয়ে সকাল বেলায় কাদেশ আক্রমণ করা যাবে খন। মুয়াতালিস তো কাপুরুষের মতো পালিয়েছে, শহর দখল করতে বেশি বেগ পেতে হবে না।
রামেসিস যেটা বুঝতে পারেননি সেটা হল সেই হিটাইট গুপ্তচরদের মুয়াতালিস নিজেই পাঠিয়েছিল।
- বলেন কী? নিজেই নিজের লোককে ফারাওয়ের কাছে পাঠাল?
- হ্যাঁ, মিথ্যেটাকে সত্যি করে বলার জন্য।
- মিথ্যে!
- হুম, মুয়াতালিস মোটেই পালিয়ে যাননি। নিজের বিশাল সৈন্যদল নিয়ে লুকিয়েছিলেন কাদেশ শহরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ের আড়ালে। রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করলেন রামেসিসের তাবুতে।
হঠাৎ হওয়া আক্রমণের চোটে রামেসিসের দুটো দলই ভয় পেয়ে গেল। অর্ধেক মারা পড়ল হিটাইট সেনাদের হাতে, বাকি অর্ধেক নিজের প্রাণের মায়ায় ফারাওকে একা ফেলে রেখে পালাল। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন রামেসিসের পাশে শুধু ওর পতাকা বাহক মেনা। ওর রথকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে হিটাইট সৈন্যরা। মৃত্যু আসন্ন।
এমন সময় রামেসিস স্মরণ করলেন কাদেশ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে থেবসের মন্দিরে থাকা দেবতা আমেন-রে কে। আমেন-রে রামেসিসের ডাকে সন্তুষ্ট হয়ে ওকে আশীর্বাদ দেন। ফারাও হয়ে ওঠেন দেবতার মতো শক্তিশালী। একাই প্রবল বিক্রমে হিটাইটদের মারতে থাকেন। রাজার সেই সাহস দেখে চার দলের সৈন্যরাও ফিরে আসল। হিটাইটদের তারপরে খুব সহজেই হারিয়ে দিল রামেসিস।

রথের ওপরে দ্বিতীয় রামেসিস

এই যুদ্ধজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই মিশরের দক্ষিণে আবু সিম্বেলের মন্দির বানান রামেসিস। আকারে আর সৌন্দর্যে সে মন্দির ছিল অতুলনীয়। একটা নয়। দুটো মন্দির বানান রামেসিস।

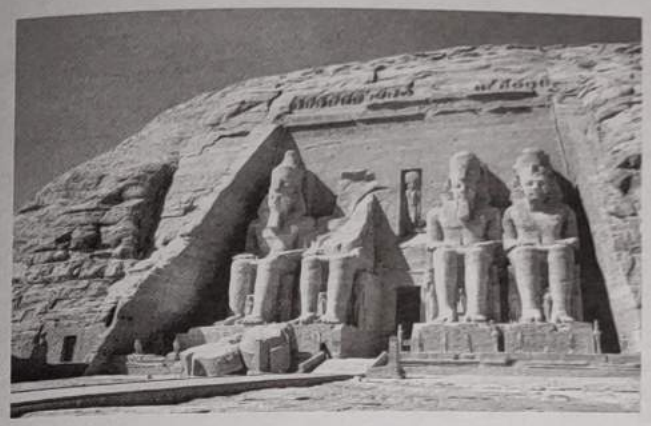

আসল মন্দিরটা ছিল উচ্চতায় তিরিশ মিটার, লম্বায় পঁয়ত্রিশ মিটার। মন্দিরের ঢোকার দরজার দুপাশে দুটো করে মোট চারটে বিশাল মূর্তি ছিল রামেসিসের। প্রায় কুড়ি মিটার লম্বা! বছর তিনেক আগে দেশপ্রিয় পার্কে যে দুর্গা বানানো হয়েছিল প্রায় তেমন বড়!
- বলেনকি! এমন বড় মূর্তি ওরা বানালো কী করে!
- রামেসিস গোটা দেশ জুড়ে নিজের প্রায় পঞ্চাশটা মূর্তি বানিয়েছিলেন। বেলজোনি যে মূর্তির টুকরোটা লাক্সর থেকে লন্ডনে নিয়ে যায় সেটাও তার মধ্যে একটা, তাই এত বড় একটা কিছু বানানো মিশরীয় স্কাল্পচারদের কাছে খুব একটা শক্ত কিছু ছিল না। একটাই পাহাড়ের গায়ে তৈরি হয়েছিল আবু সিম্বেলের মন্দিরটা। সেই পাহাড়ের পাথর খোদাই করেই রামেসিসের মূর্তিগুলো

মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা কাদেশের যুদ্ধের ছবি

বানানো হয়। মূর্তির পায়ের কাছে ছিল ওর স্ত্রী আর সন্তানদের ছোট ছোট মূর্তি। মন্দিরের ভিতরের প্রথম ঘরটা লম্বা আয়তাকার। আটটা পিলার সেখানে। প্রতিটা পিলারেই আবার রামেসিসের মূর্তি খোদাই করা। এখানে ফারাও ওসাইরিসের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ঘরের দেওয়াল জুড়ে সাহসী আর শক্তিশালী ফারাওয়ের যুদ্ধ জয়ের ছবি খোদাই করা।
মন্দিরের একদম ভিতরে যে ছোট গর্ভগৃহ ছিল সেখানে পাশাপাশি বসে থাকতেন দেবতা রা, আমুন, তাহ আর রামেসিস নিজে।

মিশরীয়দের অ্যাস্ট্রোনমি আর আর্কিটেকচারের জ্ঞান যে কত গভীরে ছিল সেটা এই গর্ভগৃহ থেকেই বোঝা যায়। প্রতি বছরের ২২শে ফেব্রুয়ারি আর ২২শে অক্টোবরেই মন্দিরের দরজা থেকে প্রায় দু'শো মিটার গভীরে এই ছোট্ট ঘরটায় সূর্যের আলো এসে ঢুকত। অদ্ভুত ভাবে সেই আলো রা, আমুন আর রামেসিসকে আলোকিত করলেও দেবতা তাহ অন্ধকারেই থেকে যেতেন। কারণ তিনি মাটির নিচের জগতের ভগবান।
- আরেকটা তাহলে কি জন্য বানানো হয়েছিল?

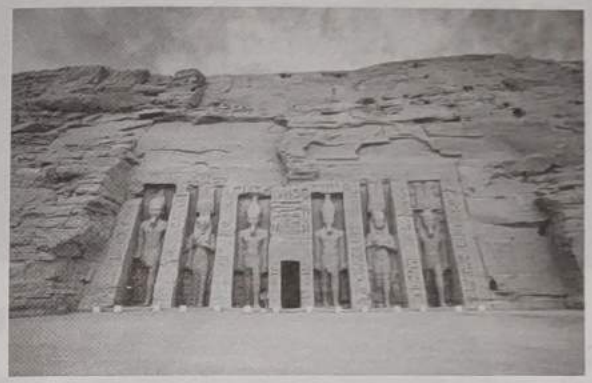

- অন্য মন্দিরটা আকারে একটু ছোট ছিল বুঝলে। এটা রামেসিস বানিয়েছিলেন ওঁর স্ত্রী নেফারতারির জন্য। এই মন্দিরের দেওয়ালেও প্রায় ১০ মিটার লম্বা ছয়টা স্ট্যাচু, চারটে রামেসিসের আর দুটো নেফারতারির। সমান আকারের। ফারাও নিজের স্ত্রীকে নিজের সমান সম্মান দিয়েছিলেন। মন্দিরের ভিতরে দেবী হাথোরের পুজো হত। সেই দেবীরই মূর্তি খোদাই করা আছে পিলারের গায়ে।

নেফারতারি

- এই মন্দিরই তাহলে আবিষ্কার করেন জোহান বুর্কার্ড?
- হ্যাঁ, এটাই সেটা। রামেসিসের পরের ফারাওদের কাছে এই মন্দির অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। হাজার বছরের ধরে একটু একটু করে মরুভূমির বালির নিচে হারিয়ে যায়। ১৮১৩ সালে বুর্কার্ড আবার খোঁজ পায় এর। পেট্রার নাম শুনেছ? হারিয়ে যাওয়া শহর?
- হ্যাঁ শুনেছি তো! 'ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দা লাস্ট ক্রুসেড' সিনেমাটায় দেখিয়েছিল না! পিজি বলল।
- হ্যাঁ একদম ঠিক, সেই পেট্রা শহর আবিষ্কার করেন এই জোহান বুর্কার্ডই। এই মানুষটার জীবন ইন্ডিয়ানা জোন্সের থেকে কিছু কম নয়। চার বছর ধরে সিরিয়াতে থেকে আরবিতে লিখতে পড়তে শেখেন। তারপরে শেখ ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ ছদ্মনাম নিয়ে এই জার্মান ভদ্রলোক ঘুরে বেড়িয়েছেন জর্ডান, ইজিপ্টে। পেট্রা আবিষ্কার করেছেন। ইনিই আবার প্রথম ইউরোপিয়ান যে মক্কা মেদিনাতে পা রাখেন। কিন্তু মাত্র ৩২ বছর বয়সে ডিসেন্ট্রিতে মারা যান বুকার্ড। বেঁচে থাকলে আরো কত শত কীর্তি যে করতেন কে জানে। এই দেখো কথায় কথায় আবার বেলাইন হয়ে যাচ্ছি। আবু সিম্বেলে ফিরে আসি।

জোহান বুর্কার্ড

১৮১৩ সালের মার্চ মাসে বুকার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মিশরের দক্ষিণে। সেই সময় এক বছর দশেকের ছোকরার কাছে একটা অদ্ভুত গল্প শোনেন। নীল নদের তীরে নাকি সে একটা মানুষের বিশাল বড় মাথা দেখতে পেয়েছে। পাথরের তৈরি। সেই ছেলেকে গাইড বানিয়েই ওই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছন বুকার্ড। দেখেন সত্যি মরুভূমির বালির মধ্যে জেগে আছে সেই পাথরের মূর্তি। মাথাটুকুই যা বাইরে। তখনও কিন্তু বুকার্ড বুঝতে পারেননি এর নিচে কী আছে। তবে বড় মন্দিরের পাশে

ছোট নেফারতারির মন্দিরটা বালি খুঁড়ে বার করতে সক্ষম হন বুকার্ড। তার থেকেই ওর ধারণা হয় যে ওই মূর্তির চারপাশের বালি সরাতে পারলেই নিশ্চয় আরেকটা মন্দির বেরোবে। তবে সেই কাজ করার জন্য যে পরিমাণ লোকবল লাগবে তা বুকার্ডের ছিল না। শেষমেশ বালির ভিতর থেকে রামেসিসের মন্দিরকে কে বার করেন জানো? প্যাটাগোনিয়ান স্যামসন।
- জিওভান্নি বেলজোনি! স্কুপে যার কথা বলছিলেন!

- হ্যাঁ। বেলজোনি বুকার্ডের কাছে এই মন্দিরের কথা যে শুনেছিলেন সেটা তো তখনই বললাম। লাক্সর নীল নদের তীরে রামেসিসের মূর্তি যখন আলেকজান্দ্রিয়াতে ট্রান্সপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে তখন বেলজোনি আর সময় নষ্ট না করে চলে আসেন নুবিয়াতে। ঠিক যেখানে বুর্কার্ড ওর খুঁজে পাওয়া মন্দিরের কথা বলেছিলেন। তিনবারের চেষ্টার পরে ১৮১৭ সালের অগাষ্ট মাসে বেলজোনি মন্দিরের দরজাটা খুঁজে পেলেন! বালির পাহাড় আর দরজার মাঝে যেটুকু ফাঁক ছিল তার মধ্যে দিয়েই বুকে ভর দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়েন বেলজোনি। ঢুকেই অবাক হয়ে যান। ওর সামনে তখন দাঁড়িয়ে আছে আটখানা দৈত্যাকার পিলার। প্রত্যেকটাতে খোদাই করা আছে ফারাও রামেসিসের মূর্তি। দেওয়াল জুড়ে রামেসিসের কীর্তি। গর্ভগৃহে বসে থাকা চারজন দেবতা। বেলজোনি বুঝতে পেরেছিলেন এমন কোনও মন্দির এর আগে কেউ কখনো খুঁজে পায়নি। গোটা মন্দিরটার শরীর থেকে বালি সরাতে লাগে আরো এক বছর।

- এরকম একটা মন্দির থেকে বেলজোনি কোনও ঐশ্বর্য খুঁজে পাননি!
- পেয়েছিলেন তো! তবে সেগুলো কি, সেটা আজও কেউ জানে না। সেই সময়তে তো আর আর্কিওলজিকাল ডিসকভারির ওপরে কোন কড়া নিয়ম কানুন ছিল না। বেলজোনি আবু সিম্বেলের মন্দিরে যা কিছু পেয়েছিলেন সেসব নিজের করায়ত্ত করেন। তার মধ্যে অনেক কিছু বেচে দেন ইউরোপের ধনকুবেরদের। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। সেই ঐশ্বর্যের খুব সামান্যকেই পরে উদ্ধার করা গেছে। সেগুলো ইংল্যান্ডের কয়েকটা মিউজিয়ামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখন। তবে আবু সিম্বেলের মন্দিরের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য হল মন্দিরটা নিজেই। একটা আর্কিটেকচারাল মার্ভেল বলতে পারো। ভাবতে পারছ অত হাজার বছর আগেকার একটা মন্দির। যার গায়ের সব কটা কারুকার্য নিখুঁত। যার গর্ভগৃহে সূর্যের আলো বছরের দুদিন একদম নিয়ম মেনে এসে ঢুকত। যে মন্দির এমন এক সম্রাটের বানানো যে তাঁর স্ত্রীকে সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেই সময়ের মিশরে যা প্রায় দুর্লভ।
পিজি এতক্ষণ ধরে গল্প শুনতে শুনতেই মোবাইলে আবার খুটখাট করতে লেগেছিল। এইটাই ওকে নিয়ে মুশকিল। নিজের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু সেটা ঢাকবার জন্য বারবার গুগলকে হাতিয়ার করে। ও এবারে ভবেশদাকে বলল,
- ভবেশদা। আবু সিম্বেলের মন্দির কিন্তু এখন আর সেই আগের জায়গাতে নেই। অনেকটা সরে এসেছে।
- সরে আসেনি। আনানো হয়েছিল। প্রায় দু'শো মিটার।
- বলেন কী! দু-দুটো মন্দিরকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল! এটা সম্ভব নাকি!
- বিজ্ঞানের কাছে তো কিছুই অসম্ভব নয় স্পন্দন ভাই। সরিয়ে না আনলে আবু সিম্বেলের মন্দির আজকে জলের তলায় থাকত।

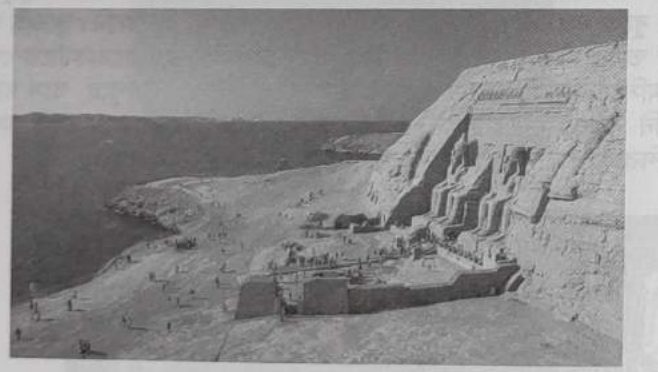

১৯৬০ সালে আসওয়ান শহরের কাছে নীলনদের ওপরে একটা বিশাল বড় বাঁধ তৈরি করার কাজ শুরু হয়। এই বাঁধ তৈরির সময়তেই নীল নদের উদ্বৃত্ত জল ধরে রাখার জন্য একটা লেক বানানো হয়। ইজিপ্টের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসেরের নামে এর নাম দেওয়া হয় নাসের লেক। এটা হল মানুষের তৈরি পৃথিবীর অন্যতম বড় একটা হ্রদ। মুশকিল হল এই যে,

এই হ্রদ বানাবার পরে দেখা গেল যে আসওয়ানের বাঁধ যখন পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে তখন এই হ্রদের জলের লেভেল অনেক বেড়ে যাবে। সেই জলে ডুবে যাবে আবু সিম্বেলের মন্দির। এই সময়তে এগিয়ে আসে ইউনেস্কো। এমন একটা প্রাচীন স্থাপত্য হারিয়ে যাবে এটা তো হয় না। যেভাবেই হোক এটাকে বাঁচাতেই হবে। অন্যদিকে আসওয়ানের বাঁধটাও তৈরি হওয়াটা খুব দরকারী। তাই একটাই উপায় ছিল হাতে। মন্দির দুটোকে সরিয়ে আনা।

এই কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। ইজিপ্সিয়ান গভর্নমেন্টের ক্ষমতা ছিল না তার যোগান দেওয়ার। কিন্তু ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেই সময় এগিয়ে এসেছিল ১১৩টা দেশ। ১৯৬৪ সালে শুরু হল কাজ। দুটো মন্দিরকেই কয়েক হাজার টুকরোতে ভাগ করা হল। প্রতিটা টুকরোর গায়েই একটা নম্বর দেওয়া থাকলো। তারপরে নাসের লেক থেকে ৬৫ মিটার ওপরে আর দুশোমিটার দূরে কংক্রিটের কাঠামো তৈরি করে সেটা ঢাকা দেওয়া হল পাথর দিয়ে। তার গায়েই এবারে একে একে টুকরো গুলো জোড়া লাগানো হল। নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে।
- এতো একদম জিগশ পাজলের মতো কাজ।

- ঠিক। এই পৃথিবীতে এত বড় জিগশ পাজল সলভ আর কেউ করেনি। আবুসিম্বেলের মন্দির সরানো শেষ হয় ১৯৬৮তে। এখন প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ আসেন এই মন্দিরকে দেখতে।
- কিন্তু ভবেশদা। এই মন্দির সরিয়ে একটা মুশকিল তো নিশ্চয় হয়েছিল। মন্দিরের জায়গা বদলে গেল। তাহলে তো আর আগের মতো বছরে দু'বার সূর্যের আলো এসে মন্দিরের ভিতরে ঢুকবে না।

ভবেশদা এবারে মুচকি হেসে বলল,

- ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞান এত বড় একটা কাজ করল আর এই ট্র্যাডিশনটা বাঁচিয়ে রাখবে না এটা হয় নাকি। মন্দিরকে এমন ভাবেই বসানো হয়েছিল যে আজও একইভাবে মন্দিরের ভিতরে সূর্যের সেই আলো এসে পৌঁছয়। এখনো প্রতি ২২শে ফেব্রুয়ারি আর ২২শে অক্টোবর সূর্যের প্রথম আলোটা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে। আলোকিত হয়ে ওঠেন তিন দেবতা। অন্ধকারে রয়ে যান 'তাহ'।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম এখন ইরাকে,সিরিয়াতে একের পর একে মন্দিরকে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা। কত না জানা গল্প মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। যে মানুষ ষাট বছর আগে একটা ইতিহাসকে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে বাঁচিয়েছিল, সেই মানুষই আজকে তাকে কবর দিতে ব্যস্ত।

১৮

সাকারার সেরাপিয়াম

আগের শুক্রবারের কথা, বাবা মা পুরী বেড়াতে গিয়েছিল বলে বর্ধমানের বাড়ি ফাঁকা। তাই আমিও হোস্টেলেই রয়ে গিয়েছিলাম। বিকেলবেলা ক্লাস শেষ হওয়ার পরেই পিজি চান টান করে সেন্ট মেখে বাবু সেজে বেরিয়ে গেল। ব্যাটা নতুন প্রেম করা শুরু করেছে। তাই প্রায়দিনই সন্ধ্যেবেলায় তিনি ছোটেন রাধানাথ বোস লেনে কোলকাতা ইউনিভার্সিটির লেডিজ হোস্টেলের দিকে। তার প্রেমিকাটি ওখানেই থাকেন কি না। আমার এদিকে একটাও ভালবাসার পাত্রী জোটেনি এখনও অবধি। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা নাগাদ তাই একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বড়বাজারে আমার এক পিসি থাকেন। প্ল্যান ছিল তার সাথেই দেখা করে আসব।

আমাদের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটে এসে পড়লেই উল্টোদিকের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মোড়ে একটা বেশ বড়সড় শিব মন্দির আছে। হোস্টেল থেকে বেরোলেই মন্দিরটাতে ঢুকে টিপ করে একটা প্রনাম করা যেন অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে। সেদিনও তাই ঢুকেছিলাম। বেরোতে যাব এমন সময় ভবেশদার গলা,

- কী হে স্পন্দন ভাই, খবর কী?
- আপনি এদিকে! দোকান বন্ধ করে দিলেন নাকি?
- হ্যাঁ, আজকের মতো বন্ধ, তো তুমি একা কেন? সাগরেদ কোথায়?
- সে এখন অ্যাপোতে গেছে। আমি এই একটু পিসির বাড়িতে..
- ফিশ ফ্রাই খাবে?
- অ্যাঁ?
- অ্যাঁ আবার কি? আজ সকাল থেকে কেন জানি না ফিশ ফ্রাই খেতে ইচ্ছা করছিল, এসব জিনিস আবার একা একা খেলে ভাল টেস্ট পাই না। চলো কালিকায়। ফিশ ফ্রাই হয়ে যাক। আমি খাওয়াচ্ছি।
- কিন্তু পিসির বাড়ি?
- আরে পিসি তো আর পালাচ্ছেন না?

সত্যি কথা, পিসি পালাবে না। কিন্তু ফিশ ফ্রাইয়ের হাতছানিতে সাড়া না দেওয়াটা পাপ। তাই দু'জনে মিলে চললাম কালিকার দিকে।

দোকানের সামনেটা খুব ভীড় থাকে সবসময়তেই। ফ্রাইয়ের অর্ডার দিয়ে দুজনে একটু দূরে এসে দাঁড়ালাম। এমন সময় ভবেশদা বলল,

- এই যে শিবমন্দিরে প্রণাম করে এলে, মন্দিরের চৌকাঠের কাছে একটা ষাঁড়ের মূর্তি আছে

খেয়াল করেছ? ওইটা কে বলো তো?
- নন্দী তো।
- হ্যাঁ, এই নন্দীই আবার মিশরে গিয়ে হয়ে গেল এপিস।
- ইজিপশিয়ানরা গরুর পুজো করতেন বলেছিলেন। হাথোর। ষাঁড়ও দেবতা ছিল?
- ছিল ভাই, ছোটখাটো দেবতা না। মেমফিসে তার নামে ছিল এক বিশাল মন্দির। সেরাপিয়াম অফ এপিস বুলস। সেখানে ষাঁড়ের মমি বানিয়ে রাখত মিশরীয়রা।
- একটা গোটা ষাঁড়ের মমি!!
গরম ফিসফ্রাইয়ের একটা কোনা কাসুন্দিতে ডুবিয়ে হালকা কামড় দিয়ে শুরু করল ভবেশদা।

||

- দ্বিতীয় রামেসিসকে মনে আছে তো?
- হ্যাঁ যার সেই বিশাল বড় পাথরের মূর্তি আর আবু সিম্বেলের টেম্পলের কথা বলেছিলেন।
- হ্যাঁ, এই দ্বিতীয় রামেসিসের সময়ে আরেকজন দেবতার পুজো হতো বুঝলে। তার নাম ছিল তাহ। এই তাহ ছিল আর্ট আর ক্রাফটের দেবতা। আবার ওর ইচ্ছাতেই নাকি নীলনদে বন্যা আসত, জমিতে শস্য ফলত। তাই তাহ-এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

তাহ

এই তাহ-এর পার্থিব রূপ ছিল একটা ষাঁড়। এরই নাম এপিস। ষাঁড় অনেক শক্তিশালী, সাহসী, এর প্রজনন ক্ষমতাও অনেক বেশি। তাই মিশরের ফারাওদের ইতিহাসের প্রথম থেকেই এপিসের পুজো হয়ে আসছিল। রামেসিসের সময় এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছয়। জ্যান্ত ষাঁড়কেই তাহ-এর অবতার ধরে নিয়ে পুজো করা হত। তবে আবার যে সে ষাঁড় হলে চলত না। কিছু স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করতে হত।
- যেমন?

- যেমন যে গরু সেই ষাঁড়ের জন্ম দিয়েছে তার আগে কোনও সন্তান থাকলে চলবে না। আবার ষাঁড়ের শরীরেও কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকতেই হবে। হেরোডোটাস বর্ণনা দিয়ে গেছেন এর। সেই বুল হবে একদম সাদা, শুধু পিঠের দিকে থাকবে কালো দাগ, সেটাও আবার উড়ন্ত চিলের আকারের হতে হবে, আর কপালে থাকবে ডায়মন্ড আকৃতির কালো ছোপ। লেজের চুল হতে হবে বিজোড় সংখ্যার, জিভের তলায় থাকতে হবে স্কারাব ছারপোকার মতো আরেকটা দাগ।

এপিস বুল

- হা হা, লেজের চুল গুনতো ওরা বসে বসে?! তাছাড়া চাপের কী আছে? ইভেন নাম্বারের চুল পেলে একটাকে উৎপাটিত করলেই তো ঝামেলা মিটে যেত।
- তুমিও দেখছি পিজির মতো ফচকেমি করছ আজকাল, আমি যা পড়েছি সেটাই বললাম, সত্যি ওরা গুণে দেখত কিনা থোড়াই জানি নাকি!
- সরি সরি, আপনি চটবেন না, আর কিছু বলছি না। আপনি এগোন।
- হুঁ, তো এই ষাঁড় বেশ রাজকীয় ভাবে থাকত বুঝলে মন্দিরের মধ্যে। শুধু এর দেখভাল করার জন্য আলাদা করে প্রিস্ট রাখা হত। যারা সারাদিন ধরে ওর প্রতিটা মুভমেন্ট ফলো করত, লিখে রাখত। সেইগুলো থেকেই নাকি দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ হত। এপিস ষাঁড়ের শ্বাস নাকি ছিল খুব পবিত্র। সপ্তাহে একটা দিন তিনি আবার নাকি মন্দিরের জানলা দিয়ে ভক্তদের দর্শন দিতেন। বেশ কিছু গরু নিয়ে তৈরি একটা হারেম থাকত ওর জন্য। অন্যদিকে যে গরু সেই ষাঁড়ের জন্ম দিয়েছে তাকেও পুজো করা হত আলাদা ভাবে। দেবতা তাহ বিদ্যুতের রূপে এসে নাকি তাকে গর্ভবতী করেছে।
- এ তো একদম এলাহি আয়োজন দেখছি!

- তা আর বলতে ! স্বয়ং ফারাও এই ষাঁড়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোনও শুভ কাজ শুরু করতেন না। তবে এপিস বুল যেদিন মারা যেত সেদিন দেশ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসত। অনেক যত্ন নিয়ে ওর শরীরটাকে মমি বানানো হত। শরীরে সোনার অলঙ্কার, মুখে সোনার মুখোশ পরিয়ে কবর দেওয়া হত ওঁকে। মারা যাওয়ার পরে নাকি এপিস একাত্ম হয়ে যাবে মৃত্যুর পরের দেবতা ওসাইরিসের সাথে। তখন ওর নাম হবে ওসাইরাপিস। যখন একটা এপিস ষাঁড়কে মমি বানানো হচ্ছে তখনই দেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু হত আরেকটা এমন ষাঁড়ের।

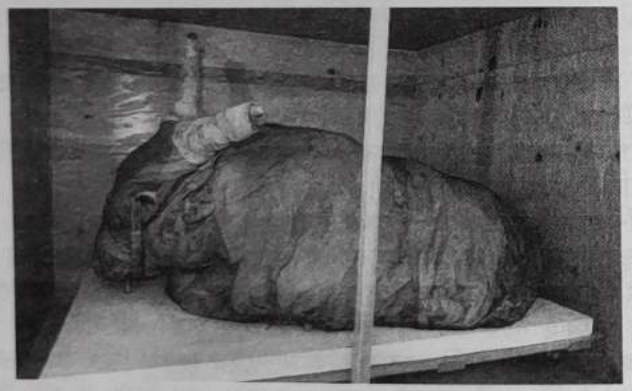

এপিস বুলের মমি

দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকালে এমন দুটো ষাঁড় মারা যায় বুঝলে। তাদেরকে মমি বানিয়ে সাকারার মরুভূমিতে কবর দেওয়া হয়। তবে ওর সন্তান খায়েমওয়াসেত যখন ফারাও হয়ে আসেন তখন একটা খুব বড় সিদ্ধান্ত নেন।

যত এপিস বুল মারা যাবে তাদের সবার জন্য তৈরি করা হবে একটা বিশাল সমাধি। তার গোটাটাই হবে মাটির তলায়। একটা লম্বা গ্যালারি বানিয়ে তার দুইপাশে তৈরি করা হবে অনেক গুলো ঘর। প্রতিটা ঘরে থাকবে একজন এপিস বুলের সমাধি। আর মাটির ওপরে তৈরি করা হবে একটা বিশাল বড় মন্দির।

ফারাও যেমন ভেবেছিলেন ঠিক তেমনটাই করা হল। তারপর থেকে ইজিপ্টের ফারাওদের রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত এই মন্দিরের জৌলুস অটুট ছিল। যীশুর জন্মের একশো বছর আগে স্ট্রাবো নামের এক গ্রীক ঐতিহাসিক এই তাক লাগানো মন্দিরের কথা লিখে গিয়েছিলেন। সাকারার এই সেরাপিয়াম থেকে মেমফিসের তাহ-এর মন্দির অবধি ছিল পাঁচ কিলোমিটার লম্বা একটা রাস্তা। সেই রাস্তার দুপাশে রাখা ছিল অজস্র স্ফিংস।

- তাহলে এই মন্দির এখনো আছে?

- না ভাই, সেটা তো আর নেই। ৩৮৪ সালে রোমানদের হাত ধরে মিশরে খ্রীষ্টান ধর্ম আসে। সাথে সাথেই সব পেগান ধর্মের চিহ্ন মিটিয়ে ফেলতে শুরু করে তারা। তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই সাকারার সেরাপিয়াম।

- আচ্ছা আপনি এই মন্দিরটাকে বারবার সেরাপিয়াম বলছেন কেন বলুন তো?

- সেরাপিয়াম তো গ্রীক শব্দ। এর মানে সেরাপিসের মন্দির। ফারাওদের ইতিহাসের শেষের তিনশো বছরের সব রাজা ছিলেন গ্রীক। ওদেরকে বলা হত টলেমি। মনে করে দেখো, রোসেটার পাথরের কথা বলার সময় এদের কথা বলেছিলাম। টলেমিরা এপিস আর ওসাইরিসকে মিলিয়ে নিজেদের এক দেবতা বানান, তারই নাম সেরাপিস। সেরাপিসকে কিন্তু দেখতে ছিল মানুষেরই মতো। তার সাথে থাকত তিন মাথাওয়ালা একটা কুকুর। নাম কারবেরাস। যাই হোক, টলেমিরা কিন্তু সাকারার এপিসের মন্দিরের আকারের কোন অদল বদল করেননি। শুধু দেবতার নাম টুকুই বদলে যায়।

- ওহ, এবারে বুঝলাম ব্যাপারটা। এবারে বলুন খ্রীষ্টানরা এই মন্দিরের কী করেছিল।

সেরাপিস

- ওরা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল সেরাপিয়ামকে। শুধু মাটির নিচের এপিস ষাঁড়ের কবরখানা আর সেই স্ফিংসের পথ রয়ে গিয়েছিল। পরের দেড় হাজার বছরে সেটাও চলে গিয়েছিল মরুভূমির বালির নিচে।
- তাহলে ফের খুঁজে পাওয়া গেল কী করে !!
- সেটা সম্ভব হয়েছিল এক ডাক্তারের জন্য বুঝলে। ফিলিবার্তো মনক্যালেরি ছিল ইতালিয়ান। কায়রোতেই ডাক্তারি করছিলেন। কিন্তু ছিল টুকটাক আর্কিওলজির শখ। তো এই ডাক্তারবাবু একসময় দেখলেন খোঁড়াখুঁড়ি করে যা আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাচ্ছে তা বিক্রি করে ডাক্তারির থেকে বেশি উপার্জন করা যায়। ব্যস, অমনি তিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ফুল টাইম আর্কিওলজিস্ট হয়ে গেলেন।

১৮৩২ সালে সাকারার সেই বিখ্যাত স্টেপ পিরামিডের উত্তরে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কাজ করছিলেন ফিলিবার্তো। তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ে ওঁর। বালির মাঝখান থেকে জেগে আছে একটা পাথরের মাথা। আশেপাশের বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল স্ফিংসের গোটা শরীর। চারপাশের আরো বালি সরাতে সরাতে সামনে আসতে থাকল একের পর এক আরো স্ফিংসের মূর্তি। যেন একটা রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে রাখা আছে ওদের।
- এটাই কি সেই রাস্তা যেটা সাকারার সেরাপিয়ামের সাথে জুড়ত মেমফিসের তাহ-এর মন্দিরকে !
- একদম ঠিক ধরেছ। ফিলিবার্তো আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন অ্যাভিনিউ অফ স্ফিংস। কিন্তু শখের এই আর্কিওলজিস্টের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা বিশেষ ছিল না। তাই বুঝতে পারেননি যে এটাই সেরাপিয়ামে যাওয়ার রাস্তা। তিরিশটা মতো স্ফিংসের মূর্তি ওখান থেকে তুলে নিয়েই ফিলিবার্তো খুশি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই তিরিশটা স্ফিংসের ১২ খানা কিনে নিয়েছিলেন ইজিপ্টের বেলজিয়ান কনসাল জেনারেল সেসিনা পাশা। ৬ টা মূর্তি কিনেছিলেন দেশেরই কিছু ধনকুবের। ১৮৪৪ এ আর বাকি ১২টা মূর্তি কিনেছিল ব্রিটিশ সরকার।
- তাহলে এপিস বুলের সমাধির কি হল?
- আসছি সেই কথাতেই। ১৮৫০ সালে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম থেকে একজন তরুণ আর্কিওলজিস্টকে পাঠানো হয় মিশরে। লক্ষ্য ছিল কোপটিক ভাষায় লেখা কিছু প্যাপিরাস মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে আসা। লম্বা চওড়া চেহারার মুখে হালকা দাড়িওয়ালা এই আর্কিওলজিস্টের নাম ছিল অগাস্ট মারিয়েতে।

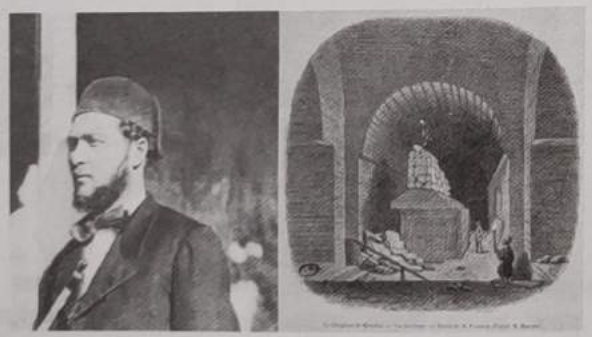

অগাস্ট মারিয়েতে

মারিয়েতে ইজিপ্টে এসে মাস কয়েক কাটানোর পরেই বুঝলেন যে কোপ্টিক প্যাপিরাসের সন্ধান কেউ দিতে পারছে না। এদিকে দেশে খালি হাতে ফেরাটাও বোকামির কাজ হবে। এমন সময় একদিন ওর ভাগ্য গেল খুলে।
সেসিনা পাশার প্যালেসে একদিন ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল মারিয়েতের। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় পাশার বাগানে ঘোরার সময়তে ওর নজর পড়ে বাগানে রাখা ১২ টা স্ফিংসের ওপরে। একটু ভাল করে পরীক্ষা করেই মারিয়েতে বুঝতে পেরে যান এই স্ফিংস সাকারার হারিয়ে যাওয়া সেরাপিয়ামের রাস্তারই। পাশার থেকে ফিলিবার্তোর ঠিকানা নিয়ে দেখা করেন ওর সাথে। তারপরে ১৮৫০ সালের পয়লা নভেম্বর খোঁড়া শুরু করলেন ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে ফিলিবার্তো খুঁজে পেয়েছিল প্রথম স্ফিংসের মূর্তি।
এক মাসের মধ্যে মারিয়েতে খুঁজে পেয়ে গেলেন সেরাপিয়ামের ভিত! আর তার নিচেই ছিল এপিস বুলের সমাধি!

মারিয়েতে এখানে একটা ভুল করেন বুঝলে। তাড়াহুড়ো করে সমাধির ভিতরে ঢোকার জন্য এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সমাধির বাইরের দরজা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে সমাধির ভিতরের সিলিংয়ের একটা অংশ ভেঙে পড়ে। দেওয়ালের অনেক কারুকার্য খসে পড়ে। মারিয়েতে সমাধিতে ঢোকার পরে লম্বা সেই গ্যালারির দুই পাশে মোট চব্বিশটা ঘর খুঁজে পান। প্রতিটা ঘরে রাখা ছিল একটা করে বিশাল পাথরের তৈরি কফিন। যার এক একটার ওজনই প্রায় ১০০ টন! কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিল এই যে প্রতিটা কফিনই ছিল ফাঁকা।
- অ্যাঁ! ফাঁকা!! ষাঁড়ের মমি গায়েব!
- হ্যাঁ ভাই। মিশরের অন্যান্য সমাধির মতো এতেও তো বহুবার ডাকাতি হয়। ডাকাতরা কফিন গুলো থেকে চেচে পুঁছে সব নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময়তেই খুব সম্ভবত মমিগুলোকেও বার করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলে। তোমাকে আগে বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়, যে অনেক সময়তেই মমিগুলো ডাকাতদের মশালের জ্বালানীর কাজ করত। এপিস বুলের মমিরও সেই হাল হয়েছিল খুব সম্ভবত। তুমি এখন যেমন হতাশ হলে শুনে ঠিক তেমনই হতাশ হয়েছিলেন অগাস্ট মারিয়েতে। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। আর তার পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

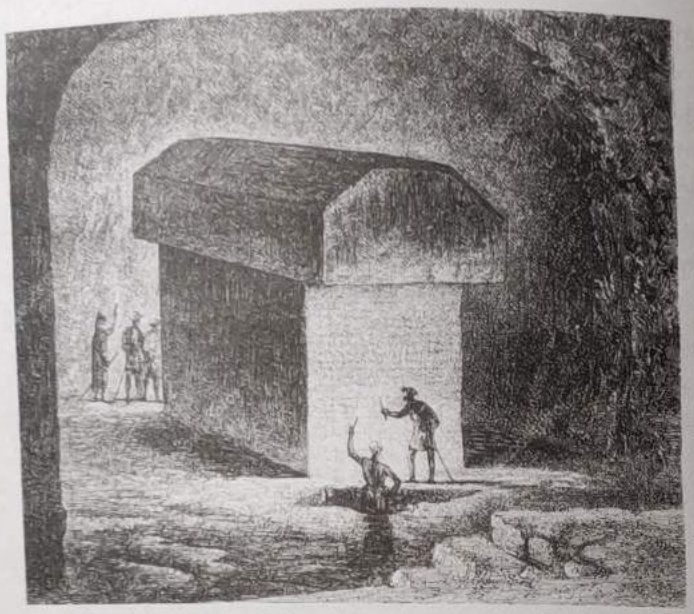

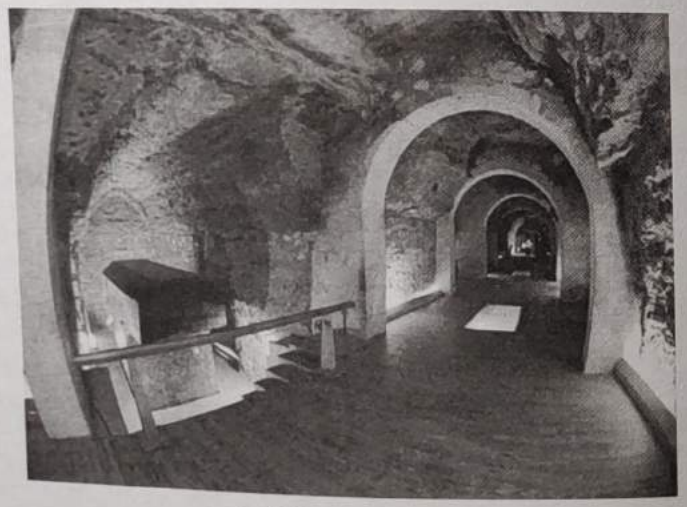

সেরাপিয়াম, এখন যেমন

সমাধির একদম শেষ প্রান্তে এসে একটা লুকানো করিডোরের মধ্যে একজোড়া অক্ষত ষাঁড়ের মমি খুঁজে পান মারিয়েতে। সেখানে ডাকাতদের হাত পড়েনি। সেই জায়গায় ঢুকেই চমকে ওঠেন তিনি। কবরের মাটিতে বালির ওপরে পায়ের ছাপ। তিন হাজার বছর পুরনো। খুব সম্ভবত যারা মমি দুটোকে সমাধিস্থ করার জন্য এনেছিল তাদেরই। সেই এপিস বুলেদের মমির গায়ে ছিল

সোনার অলঙ্কার, পরজন্মে এদের সুবিধার জন্য বড় বড় জারে রাখা ছিল শস্য। কবরের দেওয়ালে খোদাই করা ছিল ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস আর খায়েমওয়াসেতের নাম। এই মমিগুলো এখন রাখা আছে কায়রোর এগ্রিকালচার মিউজিয়ামে। মারিয়েতে এপিস বুলের একটা বিশাল বড় পাথরের মূর্তি নিয়ে যান দেশে। সেটা এখনো ল্যুভর মিউজিয়ামে রাখা আছে।

- ফ্যাসিনেটিং স্টোরি সত্যি!

- তা আর বলতে, মিশরের ইতিহাসে এমন আরো কত কত গল্প যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে আরো ফ্যাসিনেটিং একটা কথা বলি তোমায়। ডাক্তার ফিলিবার্তো ১২ টা স্ফিংস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বিক্রি করেছিলেন মনে আছে?

- হ্যাঁ বললেন তো।

- তার একটাও কিন্তু ইংল্যান্ডে পৌঁছয়নি।

- তাহলে কোথায় গেল?

ভবেশদা এবারে সেই ট্রেডমার্ক হাসিটা হেসে বলল,

- ভারতে স্যার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওগুলোকে এ দেশে পাঠায়। আরো ভাল করে বলতে গেলে পাঠায় দেশের রাজধানীতে।

- রাজধানীতে? তখন তো রাজধানী... কলকাতা!!

- ঠিক ভাই। তার একটা স্ফিংসই এখন দেখতে পাবে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে গেলে।

- তাহলে বাকি এগারোটার কী হল?

- সেটাই তো রহস্য ভায়া। বাকি এগারোটার কী হল সেটা কেউ জানে না!

১৯

রাজাদের উপত্যকা

দিন পনেরো ভবেশদার কোনও খবর ছিল না। একদম বেপাত্তা! দোকান বন্ধ, ফোন স্যুইচড অফ। সেই সময়তেই খেয়াল করেছিলাম যে আমরা ভবেশদার বাড়িটা আসলে কোথায় সেটাই জানি না! অথচ সেই মানুষটার সাথে এতগুলো মাস কাটালাম, এত আড্ডা মারলাম। আমার আর পিজির দুজনেরই চিন্তা হচ্ছিল, কলেজস্ট্রিটে ওর দোকানের আশেপাশের দোকান গুলোতে জিজ্ঞাসা করেও খুব একটা সুবিধা হল না। সবাই চেনে ভবেশদাকে। কিন্তু বাড়ি কোথায় সেটা কেউ জানে না।

দুদিন আগেই যদিও ভদ্রলোক হঠাৎ করে উদয় হলেন। একেবারে আমাদের রুমের দরজায়। দিনটা ছিল শুক্রবার। বিকেলের দিক । সদ্য মেডিসিনের ক্লাস শুরু হয়েছে , আমি পিজিকে পেশেন্ট বানিয়ে বিছানায় শুইয়ে ক্লিনিকাল একজামিনেশন প্র্যাকটিস করছিলাম আর পিজি "এই আমার পেটে হাত দিস না, কাতুকুতু লাগছে" বলে বারবার লাফিয়ে উঠছিল। এমন সময় নাকে এল চেনা বিড়ির গন্ধ, পিছনে ঘুরে দেখি আমাদের মমিদা দাঁড়িয়ে আছে। ভবেশদার এই নামটা পিজির দেওয়া, যদিও ভুলেও কখনো ওকে এই নামে ডাকি না। ভবেশদার কাঁধে সেদিন আবার একটা গাঢ় নীল রঙের ঢাউশ একটা ব্যাগ ছিল।

- কী ব্যাপার মানিকজোড়? কোনও খবর নেই তোমাদের, তাই দেখা করতে চলে এলুম।

- খবর তো আপনার নেই। একদম হাওয়া হয়ে গেছিলেন। আর এখন এসে আমাদের বলছেন। কোথায় ছিলেন এতদিন?

- আরে কোথায় আবার থাকব, বাড়িতেই ছিলাম। একটু পড়াশোনা করছিলাম।

- আপনি আবার কী পড়ছিলেন?

ভবেশদা কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল,

- রাজাদের উপত্যকার কথা। অদ্ভুত একটা জায়গা, যেটা পাঁচশ বছর ধরে ফারাওদের কবর খানা ছিল।

পিজিকে দেখলাম ক্যান্টিনে ফোন করে টুক করে চা আর ঘুগনির অর্ডার দিয়ে দিল, আড্ডা যে জমে যাবে সেটা দুজনেই ভাল বুঝছিলাম।

হাচিসনের ক্লিনিকাল মেথডের বইটাকে বন্ধ করে রাখতে রাখতে আমি বললাম, রাজাদের উপত্যকা? মানে ভ্যালি অফ দ্য কিংসের কথা বলছেন?

- হুঁ, আরবীতে জায়গাটার নাম ওয়াদি আবওয়াব আল মুলুক, মানে ভ্যালি অফ দ্য গেটস অফ দ্য কিংস। সেটাই পপুলার কালচারে ভ্যালি অফ দা কিংস হয়ে গেছে।

- আচ্ছা এখানেই তুতানখামেনের সমাধি ছিল না!

- হ্যাঁ এখানেই ছিল তো। কেভি৬২। তবে তুতানখামেন ছাড়াও আরো ৬৩ খানা কবর আছে ভাই এখানে। এখনও লুকিয়ে থাকা নতুন নতুন কবরের খোঁজ পাচ্ছেন আর্কিওলজিস্ট রা। বছর দশেক আগেই একটা এরকম কবর পাওয়া গেল ওখানে। জায়গাটা কত রহস্য যে বুকে নিয়ে বসে আছে সেটা বই পড়ার আগে জানতেই পারতাম না।

পিজি এবারে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল,

- আমাদের আর বই পড়ে কী হবে। আপনিই আছেন তো।

- হুঁ, এত গল্প যে বলি সেগুলো মাথায় তো রাখতে পারো বলে মনে হয় না।

- কী বলছেন! স্পন্দন আপনার গল্পগুলো সব লিখে রাখে জানেন! ওর হেব্বি মেমোরি! অ্যানাটমিতে অনার্স এমনি এমনি পেয়েছিল নাকি!

- বল কী স্পন্দন ভাই। তুমি সব লিখে রাখছ! প্ল্যানটা কি?

- কিছুই প্ল্যান না, আপনার গল্পগুলো শুনতে ভাল লাগে। তাই লিখে রাখার চেষ্টা করি।

- আরিব্বাস! তাহলে একেবারে উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছি না কি বল?! ভ্যালি অফ দা কিংসের গল্পই হোক তাহলে।

চেয়ার থেকে নিজেকে পিজির বিছানাতে শিফট করে ভবেশদা শুরু করল,

- নীল নদের পশ্চিম পাড়ে, লাক্সর শহর, আগে যার নাম ছিল থেবস, তার কাছে এই উপত্যকা। দু'পাশে খাড়াই চুনাপাথরের পাহাড়। ভ্যালিতে ঢোকার রাস্তাটাও সরু। এখানেই পাহাড় কেটে বানানো হত রাজাদের কবর।

- কেন? ফারাওরা তো পিরামিড বানাতো, মাস্তাবা বানাতো। সেখানে এরকম পাহাড় কেটে সমাধি বানানোর কী মানে?

- মানে তো আছেই। ফারাওদের পিরামিড, মাস্তাবাগুলোর ঐশ্বর্য ডাকাতদের বারবার টেনে আনত। কবর খানার রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে, পিরামিডের মধ্যে ফলস দরজা তৈরি করেও ডাকাতির হাত থেকে কোনও রেহাই মেলেনি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিরামিড বানানোর সময় কাজ করা শ্রমিকই ডাকাত হয়ে ফিরে আসত। গুপ্ত দরজার হদিশ ছিল তাদের মুখস্থ। ফলত এক কণা সোনাও আর সেই সব সমাধিতে অবশিষ্ট ছিল না। সোনার লোভে ফারাওদের মমিও তছনছ করে ফেলত ওরা। সোনা গেলে যাক, কিন্তু মমি নষ্ট হলে তো ফারাওয়ের মৃত্যুর পরের জগতে যাওয়ার পথই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ১৫৩৯ বিসি থেকে ভ্যালি অফ কিংসে ফারাওদের নতুন সমাধি বানানো শুরু হতে লাগল।

প্রথম যে ফারাওয়ের সমাধি তৈরী হল সে হল প্রথম তুথমোসিস । যে আর্কিটেক্ট সেটা বানায় সে হল ইনেনি, ইনেনিই এই জায়গাটা খুঁজে বার করেছিল। ফারাওয়ের সমাধি বানানোর পরে ইনেনি গর্ব করে বলেছিল যে এমন জায়গায় কবরটা লোকানো আছে যেখান কার কথা কেউ কোনদিন শোনেনি, কেউ কোনদিন দেখেনি।

- কিন্তু সমাধি বানাতে নিশ্চয়ই বেশ কিছু লোক লেগেছিল। তারাই তো এর কথা বাইরে ফাঁস করে দিতে পারত।

- যাতে না পারে তার জন্য যে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। খুব কম সংখ্যক লোককেই এই কাজে লাগানো হয়েছিল। তাদের প্রত্যেককে কাজে যোগ দেওয়ার আগে শপথ নিতে হত। এদেরকে বলা হত সত্যের ভৃত্য। কোথাও মুখ খুললেই এদের মৃত্যু ছিল অনিবার্য। সবাই মোটা টাকা মাইনে পেত। কিন্তু প্রত্যেককেই ভ্যালির পাশেই দেইর এল মেদিনা নামের একটা জায়গায়

থাকতে হত পরিবার নিয়ে। সেই জায়গাটার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছিল। বাইরের জগতের সাথে কোনও সংস্পর্শেই আসতে দেওয়া হত না তাদের। ভ্যালিতে আবার যখন তখন সারপ্রাইজ ভিজিট চলত। যাতে কাজের গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে কিনা জানা যায়।

- আচ্ছা ভবেশদা, আপনি বললেন তুতানখামের টুম্বটা হল কেভি ৬২। এর কী মানে?

- কে ভি মানে হল কিংস ভ্যালি , ইজিপ্টলজিস্ট জন গার্ডনার উইলকিনসন এই নাম্বারিং সিস্টেম চালু করেছিলেন সমাধি গুলোর জন্য। রানীদের কবর দেওয়ার জন্য আলাদা একটা উপত্যকা ছিল বুঝলে। তার নাম ভ্যালি অফ দা ক্যুইনস। এখানকার টুম্ব গুলোর নাম্বারিং তাই কিউভি ১,২,৩... এরকম।

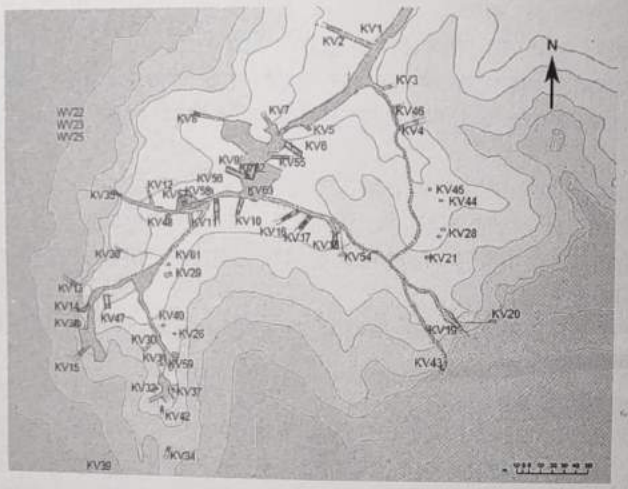

- তাহলে গার্ডনারই প্রথম ভ্যালি অফ দা কিংস খুঁজে পান?

- ধুস, এই জায়গাটার অস্তিত্বের কথা একসময় বাইরের জগতের সামনে চলেই আসে। রোমান সময়ে এটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট ছিল বলতে পারো। নেপোলিয়নের সময়তেও কিছু আর্কিওলজিস্ট এখানে এসছিল। তাদের মধ্যে এডয়ার্ড টেরেজ নামের একজন সাহেব তৃতীয় আমেনহোটেপের টুম্বও খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম যে আর্কিওলজিস্ট এখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করেন তিনি হলেন অন্য আরেকজন। কে বলো তো? আগেরদিন এর কথাই বললাম তো, যুবক মেমনন, আবু সিম্বেলের মন্দির...

- জিওভান্নি বেলজোনি! এখানেও!

- হ্যাঁ ভাই। এখানেও বেলজোনি। আবু সিম্বেল থেকে ফেরার পরে বেলজোনি নজর দেন ভ্যালি অফ কিংসের দিকে, খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে বেলজোনি খুঁজে পেয়েছিলেন ফারাও আই এর কবর, যে তুতানখামেনের পরে মসনদে বসেছিল। প্রথম রামেসিসের কবরও পাওয়া যায়। তবে দুটোতেই আশাপ্রদ তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। বেলজোনি কিন্তু একটুও না দমে কাজ চালিয়ে যান। তার ফলও পেলেন যদিও।

১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসের একটা দিন। বেলজোনি হঠাৎ করে খেয়াল করলেন একটা

পাহাড়ের গায়ে জল গড়িয়ে পড়ার নালী পথ। কোনও একসময়ে হয়ত এখান দিয়ে সত্যিই জল পড়ত, তাই জন্যই পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এরকম চ্যানেল তৈরি হয়েছে। কিন্তু বেলজোনি খেয়াল করলেন সেই চ্যানেল নিচের দিকে নামতে নামতে হঠাৎ করে ছোট ছোট পাথরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে হারিয়ে গেছে। তাহলে কী ওর পিছনে কিছু আছে!

কয়েক হাজার বছর ধরে জমে থাকা নুড়ি পাথরের স্তূপ সরানো খুব মুশকিলের হল। জায়গায় জায়গায় পাথরের টুকরোগুলো জমাট বেঁধে গেছে। বেলজোনি একটা খেজুর গাছের গুড়ি তুলে এনে শ্রমিকদের বললেন সেটাকে হরাইজন্টালি ধরে বারবার সেই পাথরের স্তূপে আঘাত করতে, যাতে পাথরের টুকরোগুলো আলগা হয়ে পড়ে।

- বুঝেছি ! ব্যাটারিং র‍্যাম! পদ্মাবতে দেখেছিলাম তো! তাছাড়া গেম অফ থ্রোনসে...
পিজির মুখের কথা শেষ হল না। ভবেশদার রক্তচক্ষু দেখে ওকে থামতে হল। ছেলেটার বাজে বকার অভ্যেসটা কোনদিন শুধরোবে না।
- তো যেটা বলছিলাম, বেলজোনির এই টেকনিকে কিন্তু ভাল কাজ হল। পাথর সরানো গেল বেশ খানিকটা। বেরিয়ে এল একটা বড় পাথরের দরজা। মানে একটা সমাধির দরজা। বেলজোনি এই সমাধি আবিষ্কার করার বেশ কয়েকবছর পরে জানা যায় যে সেই কবরটা ছিল ফারাও সেতির।
- সেতি?
- হ্যাঁ, ইনি ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিসের বাবা। ১৯তম ডাইনেস্টির রাজা। খুব জনপ্রিয় ফারাও ছিলেন সেতি। ওর সময়তেই দেশ জুড়ে রেশনের ব্যবস্থা চালু হয়। দেশের প্রতিটা মানুষের জন্য বরাদ্দ হয় রুটি, রোস্টেড মাংস, আর কিছু শাক সবজি। মাসে দুবার করে সবাইকে দু'বস্তা করে গমও দেওয়া হত। এ হেন জনদরদী রাজার কবরও ছিল দেখবার মতো।
সমাধির দরজার গায়ের ফাটল দিয়ে কোনরকমে ভিতরে ঢুকেই বেলজোনি অবাক হয়ে গেলেন ! একটা বিশাল হল ঘরে এসে পড়েছেন উনি। ওর চারিদিকের দেওয়ালে আঁকা রঙ্গীন ছবি। আর খোদাই করা আছে হায়রোগ্লিফের লিপি।
সেই বড় ঘর থেকে বেরতেই দেখা গেল মাটি নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সেই রাস্তায় হটাৎ করে একটা বড় কুয়ো। এতটাই গভীর যে মশালের আলোতেও তার তল পাওয়া গেল না। সামান্য অসাবধান হলেই এতে পরে মৃত্যু অনিবার্য ছিল । কুয়োর অন্য প্রান্তে উঠে গেছে একটাবড় দেওয়াল। সেই দেওয়ালের গায়ে একটা বেশ বড় গর্ত। তবে দেওয়ালে আরেকটা জিনিস দেখে বেলজোনি বেশ অবাক হলেন। দেওয়াল বেয়ে একটা বেশ মোটা দড়ি ঝুলছে।
- অ্যাঁ দড়ি এল কোথা থেকে?
- চোরের দলের লাগানো দড়ি।
- এখানেও! মানে ভ্যালি অফ কিংসেও ডাকাতি হয়েছিল!
- হয়েছিলই তো। এসব কথা কতদিন আর চাপা থাকে। তাও ৫০০ বছর জায়গাটা লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল ।
তারপরে ওদের হাল হয় সেই পিরামিড আর মাস্তাবার মতই। ডাকাতরা সবই লুট করে নিয়ে যায়।
- যাহ, তার মানে এই সমাধিতেও বেলজোনি কিছুই পাননি!
- তা কী আমি বলেছি? সবুর করো। বেলজোনি এখন কুঁয়োর পাশে দাঁড়িয়ে টপকাবার পথ ভাবছে। পরপর কটা খেজুর গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি পেতে ব্রিজ বানিয়ে কুঁয়োর অন্য প্রান্তে যাওয়া হল। অন্যদিকের দেওয়ালে লাগানো দড়ির টুকরোটাতে ঝুলে গর্তের ভিতর দিয়ে আরেকটা বড় ঘরে এসে পৌঁছলেন বেলজোনি। সেই ঘরের একপাশে আবার নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি শেষ হল আরেকটা বড় ঘরে, সেই ঘরের দেওয়াল জুড়ে মিশরীয় দেব দেবীদের ছবি। তাদের গায়ের রঙ তখনও অটুট আছে। ঘরের এক পাশ থেকে পাওয়া গেল বেশ কিছু উশাবতি।
- উশাবতি? মানে সেই পুতুলগুলো যাদের মমির সাথে রাখা হত। যাতে তারা মৃত্যুর পরের রাজ্যে ফারাওদের জন্য কাজ করে দেয়।
- বাহ! তোমার তো মনে আছে দেখছি। উশাবতিদের পেতেই বেলজোনি বুঝল ফারাওয়ের মমিও নিশ্চয় খুব কাছাকাছিই আছে! পাশের আরেকটা ছোট ঘরেই পাওয়া গেল ফারাওয়ের কফিন! প্রায় স্বচ্ছ অ্যালাবাস্টার পাথরের তৈরী। গায়ে বুক অফ দি ডেডের মন্ত্র খোদাই করা আছে।

ইজিপশিয়ান আর্টের মাস্টারপিস বলা যেতে পারে এই কফিনকে। এখন রাখা আছে লন্ডনের স্যার জন স্লোয়ান মিউজিয়ামে।

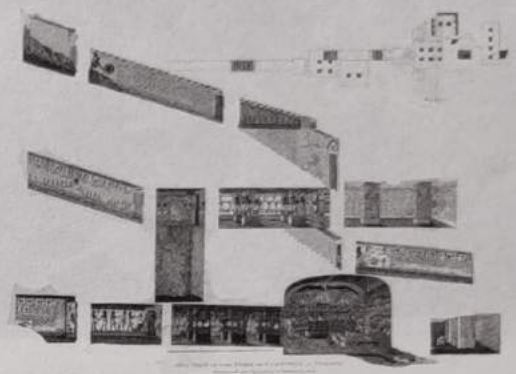

বেলজোনির আঁকা সেতির সমাধির ম্যাপ

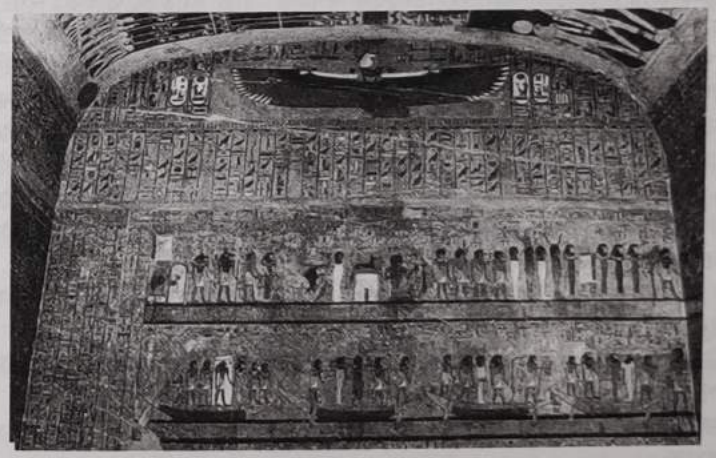

- কফিন খুলেই ফারাওয়ের মমি পাওয়া গেল!?
- ধুর, কফিন একদম ফাঁকা ছিল।
- মানেটা কী? মমি কোথায় গায়েব হয়ে গেল?
- শুধু সেতির টুম্বে না, ভ্যালী অফ দা কিংসের অন্য আর দুটো টুম্ব বাদ দিয়ে বাকিগুলোর একটাতেও কোনো মমি পাওয়া যায়নি!

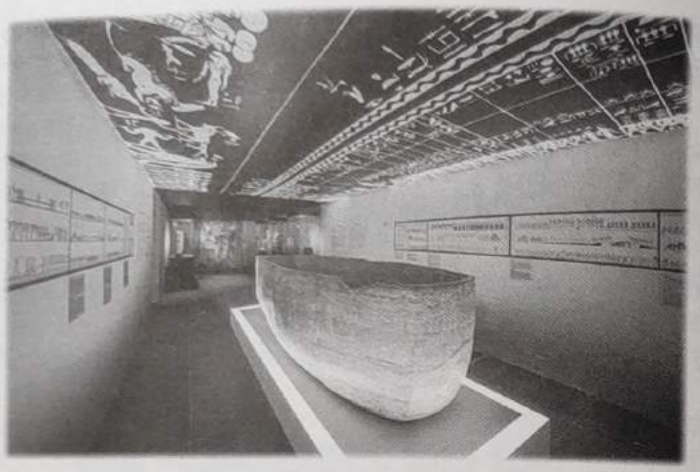

- বলেন কী? যার জন্য এত বড় কবরখানা বানানো সেই মমিই গায়েব!
- সেই সব মমিরা কোথায় গেল সেটা না হয় তোমাদের পরে আরেকদিন জিজ্ঞাসা করব। গুগল করে দেখে রেখো। বেলজোনি এই কবর আবিষ্কারের সাথে একটা বেশ মজার ঘটনা জড়িয়ে আছে বুঝলে, সেটা বলি আগে, না হলে আবার ভুলে যাব।
বেলজোনির সেতির কবর আবিষ্কারের খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। খবর তো আর খবর থাকে না, গুজবে বদলে যায়। সেই গুজব কানে গিয়ে পৌঁছল হামিদ আঘার কানে। হামিদ আঘা ছিল 'কেনা' নামের একটা শহরের মাতব্বর গোছের। সেতির কবরের মধ্যে নাকি একটা দারুণ ঐশ্বর্য পাওয়া গেছে! এটা শোনার সাথে সাথেই বেশ কয়েকটা পুলিশকে বগল দাবা করে আঘা ঘোড়া ছোটালো ভ্যালি অফ কিংসের দিকে।
গুপ্তধনের লোভে দুদিনের রাস্তা দেড়দিনে পার করে আঘা যখন সেতির সমাধির মধ্যে ঢুকল তখন বেলজোনি ওখানেই ছিলেন। সমাধির দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা দারুণ ছবিগুলোর দিকে আঘা একবার তাকিয়েই মন্তব্য করল, এসব মেয়েমানুষদেরই ভাল লাগবে।
কিন্তু যার জন্য এতটা পথ আসা সেটা কোথায়! সমাধি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। এবারে শুধু একদম ভিতরের ঘরটা দেখা বাকি।
সেই ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকেই আঘা দেখলেন বেলজোনি বসে আছে সেতির অ্যালাবাস্টার পাথরের তৈরি কবরের ওপরে।
গুপ্তধন কোথায়?!
কোন গুপ্তধন?
যেটা তুমি লুকিয়ে রেখেছ।
আমি এখানে কিচ্ছু পাইনি তো খুঁজে। একটা সোনার কণাও ছিল না।
ইয়ার্কি হচ্ছে! জানো আমি কে? আমার একটা আদেশে তোমার মাথা আলাদা হয়ে যাবে শরীর থেকে।

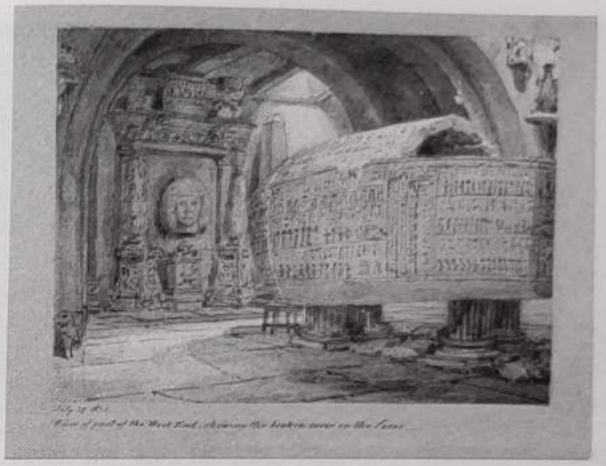

ভাল চাও তো বল সেই গুপ্তধনটা কোথায়?
কোন গুপ্তধনের কথাটা বলছেন সেটা তো বলুন আগে?!
আঘা এবারে বেলজোনিকে বলল তার কথা। যেটার লোভে ওর এতটা পথ উজিয়ে আসা। কিন্তু আঘার কথা শুনে বেলজোনি হাসি আর চেপে রাখতে পারলেন না। ওইটুকু ঘরটাতে হাসির চোটে গমগম করতে লাগল।
- সেকি? হাসির কী হল?
- হাসবে না? আঘা কোন গুপ্তধনের খোঁজে এসেছিল জানো?
- কী?
- আঘা শুনেছিল যে সেতির সমাধিতে নাকি একটা ইয়াব্বড় সোনার তৈরি পেনিস পাওয়া গেছে। সেটা আবার হীরে আর মুক্তোতে মোড়ানো! গুজবের লেভেল কোথায় যেতে পারে খালি ভাব! শেষে সোনার তৈরি পেনিস!! আমি আর পিজি দুজনেরই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। পিজি বলল,
- এই হামিদ আঘা তো হেব্বি গামবাট টাইপের ছিল! তো এরপরে কী হল?
- কী আবার হবে? বেলজোনির হাসির চোটে আঘা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ব্যাটা তখন ভালই বুঝতে পেরেছে নিজের বোকামিটা। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সুড়সুড় করে ওখান থেকে পালিয়ে আসে।
- আর বেলজোনি?
- সে ভদ্রলোকের ধৈর্য অপরিসীম বুঝলে। আলেকজান্ডার রিকি নামের এক ইতালিয়ান পেইন্টারের সাথে মিলে বেলজোনি সেতির কবরের দেওয়ালে আঁকা প্রতিটা ছবি কপি করতে থাকেন। কিছু পাতায় জলরঙে এঁকে। আর কিছুর মোমের ছাপ নিয়ে। সমাধির প্রচন্ড গরমে মোম বারবার গলে যেত। তাও সব মিলিয়ে ওরা প্রায় এক হাজার ছবি আর পাঁচশো হায়রোগ্লিফিক ইন্সক্রিপশনের কপি তৈরি করে।

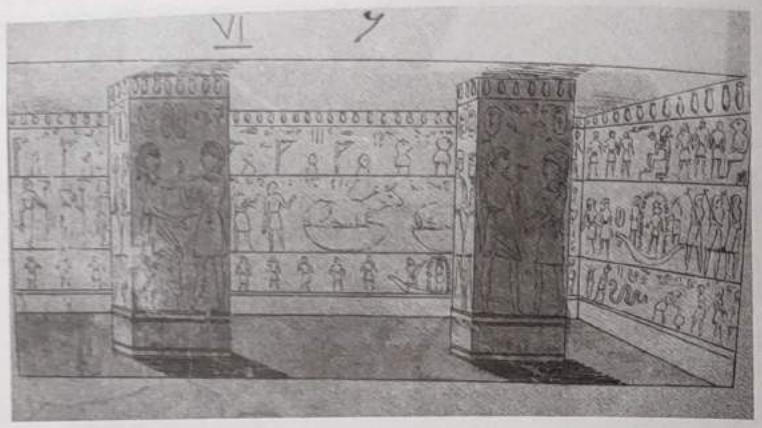

১৮২০ সালে জিওভান্নি বেলজোনি লন্ডনে ফেরত আসেন। গোটা দেশের সব কটা নিউজপেপারের প্রথম পাতায় তখন ওঁর ছবি আর ওঁর অ্যাডভেঞ্চারের কথা। ওঁকে নিয়ে লেখা বই ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়। সে এক হইহই ব্যাপার বুঝলে।

১৮২১ র মে মাসে বেলজোনি লন্ডনের পিকাডিলিতে নিজের একজিবিশন শুরু করে। প্রথমদিনেই মিশরের ঐশ্বর্য দেখতে ভীড় করেছিল ১৯০০ মানুষ! সেদিন সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বেলজোনি একটা নাম না জানা মমিও আনর্‌যাপ করেছিলেন। অবশ্যই একদম হাতুড়ে পদ্ধতিতে। সেইদিনই আবার বেলজোনি সেতির কবর থেকে পাওয়া ফারাওয়ের নাম লেখা দুটো কার্তুজ দান করেন একজন ইংরেজ ডাক্তারকে। কে বলোতো? থমাস ইয়ং।

লন্ডনে বেলজোনির একজিবিশন

- মানে যে সেই হায়রোগ্লিফের মানে বার করার কাজে লেগেছিলেন?

- ঠিক, এই সেই থমাস ইয়ং, বেলজোনির দেওয়া কার্তুজ থেকেই থমাস কয়েকটা হায়রোগ্লিফিক চিহ্নের মানে বার করতে সক্ষম হন। সেটা আবার শাম্পোলিয়নকে সাহায্য করে বাকি হায়রোগ্লিফের মানে বার করতে।

- বাপরে! বেলজোনি না থাকলে মিশরের ইতিহাসটাই অর্ধেক থেকে যেত তো।

- ঠিক তাই। একজন সার্কাসে খেলা দেখানো পালোয়ানের জন্য ইজিপ্টের কত অজানা ইতিহাস আজকে আমরা জানতে পারছি বলো। বেলজোনির নামে পরে কয়েন বেরোয়। ওর জন্মভূমি পাদুয়াতে ওর একটা স্ট্যাচুও আছে।

- আচ্ছা লন্ডনের একজিবিশনের পরে বেলজোনির কী হল?

- অন্য কোন লোক হলে অত নাম ডাক, প্রভাব প্রতিপত্তিতেই গা ভাসিয়ে দিত। কিন্তু এ যে বেলজোনি। ১৮২৩ সালে বেলজোনি আবার বেরিয়ে পড়েন অ্যাডভেঞ্চারে। এবারের লক্ষ্য পশ্চিম আফ্রিকার নিগার নদী ধরে এগিয়ে হারানো শহর টিকবাকটুকে খুঁজে বার করা। ঠিক যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন ওর গুরু জোহান বুর্কার্ড। অদ্ভুত ভাবে বেলজোনিও পারেননি সেই শহর খুঁজে বের করতে। বুর্কার্ডের মতোই বেলজোনিও ডিসেন্ট্রির কবলে পড়ে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে মারা যান। ১৮২৩ এর তেসরা ডিসেম্বর। একটা গাছের নিচে কবর দেওয়া হয় তাকে। যে মানুষটা নিজে এত কিছু আবিষ্কার করেছিলেন তার কবর আজ অবধি কেউ আর খুঁজে পায়নি।

- একটা দারুণ মানুষের গল্প বললেন সত্যি। শুধু বেলজোনির জীবন নিয়েই হলিউড একটা ব্লকবাস্টার সিনেমা বানিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ভবেশদা বেলজোনির পরে ভ্যালি অফ দ্য কিংসের কি হল?

- ভিক্টর লোরেট নামের এক ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি চালান ওখানে। সেই সময়তেই ফারাও তৃতীয় তুথমোসিস, দ্বিতীয় আমেনহোতেপের সমাধি পাওয়া যায়। তারপরে আরেক আর্কিওলজিস্ট থিওডোর ডেভিস এখানে কাজ করেন টানা ১২ বছর। একে একে আবিষ্কার হতে থাকে বাকি ফারাওদের সমাধিও। একটা সময় মোটামুটি সবাই ধরে নেয় যে ভ্যালি অফ দ্য কিংসের আর কিছু দেওয়ার নেই। সবই আবিষ্কার হয়ে গেছে। শুধু একজন মানুষ এই কথায় বিশ্বাস করেননি। আর এই অবিশ্বাসের জন্যই ইজিপ্টলজির ইতিহাসে আজকে সবার আগে তার নামটাই আসে মুখে।

ভবেশদা কার কথা বলছে সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না আমাদের।

হাওয়ার্ড কার্টার!!

তবে সেই গল্প শুরু হল মেস থেকে ডিনার করে আসার পরে।

২০

তুতানখামেন

যীশুর জন্মের প্রায় তেরোশো বছর আগেকার কথা। হঠাৎ করে রাজা আখেনাতেনের মৃত্যুর পরে মিশরের মসনদে যে নতুন রাজা এলেন তার বয়স মাত্র নয়। ওর জন্মের সময়তেই মা কিয়া মারা যান। বড় হয়ে ওঠা ধাইমা মাইয়ার কাছে। বালক রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব চালাতে লাগল মন্ত্রী আই। ছোটবেলা থেকেই সে ছেলে দুর্বল। লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারত না, বারবার ম্যালেরিয়াতে ভুগত। নিজেরই সৎ বোন আনখেসেনামেনকে বিয়ে করে সে। দুজন সন্তান হয়, কিন্তু তাদের দুজনেই মারা যায় গর্ভাবস্থাতেই। রাজা নিজেও হঠাৎ করেই মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারা যান। সাথে সাথেই তড়িঘড়ি করে তাকে সদ্য সদ্য বানানো একটা ছোট্ট সমাধিতে শুইয়ে নিজের দায়িত্ব সারেন মন্ত্রী 'আই'। তারপরেই নিজেকে মিশরের ফারাও বলে ঘোষণা করেন। যেখানে যেখানে এই বালক রাজার নাম লেখা ছিল তা মুছে ফেলা হয়। মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা ছবি নষ্ট করে দেওয়া হয়। আই চেয়েছিলেন যাতে এই ফারাওকে কেউ না আর মনে রাখে। কিন্তু ইতিহাসের মজাটা এমনই যে আজকে আইকেই কেউ মনে রাখেনি। অন্যদিকে হেন মানুষ নেই যে সেই অতিসাধারণ রুগ্ন ফারাওয়ের নাম শোনেনি। তার নামের মানে ছিল সূর্যদেবতা আমেনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আমরা ওকে চিনি তুতানখামেন বলে।

- তার মানে বলছেন তুতানখামেন একজন খুব ইনসিগনিফিক্যান্ট ফারাও। তাহলে এত বিখ্যাত কেন?

- বিখ্যাত হওয়ার কারণটা তো খুবই সহজ স্পন্দন ভাই। একমাত্র তুতানখামেনই সেই ফারাও যার কবর প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সেই কবরের ঐশ্বর্যে তাক লেগে যায় গোটা পৃথিবীর। সাথে এসে বসে একটা মিথ। ফারাওয়ের অভিশাপের ! ব্যস, এর পরে মানুষ আর কিং তুতকে ভুলতে পারেনি।

পিজি বলল,

হ্যাঁ পড়েছিলাম বটে যে তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের সাথে যে অভিশাপটার কথা আগে বলা হত তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

- ঠিক বলেছ, একদমই নেই। তবে রহস্য জড়িয়েই আছে। আর আছে রাজনীতি। যে ব্যাপারে অনেকেই কথা বলেনা।

- রাজনীতি? সেটা কীভাবে?

ভবেশদা এতক্ষণ একটা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে কথা বলছিল, মেসের মৌরির টুকরো আটকে গিয়েছিল মনে হয়। এবারে টুথপিকটাকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল,

-তাহলে একদম গোড়া থেকেই গল্পটা বলি শোন,

১৮৯১ সালের মে মাসের একটা দিন, ইংল্যান্ড। ইজিপ্টলজিস্ট পার্সি নিউবেরি মিশরে যাবেন এক্সক্যাভেশনের কাজে। তার একজন এমন হেল্পারের দরকার যে খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। এই কথাটা বন্ধু উইলিয়াম আর্মহার্স্টকে বলার সাথে সাথেই সে বলল তার আরেক বন্ধুর এক ছেলে আছে বটে। পড়াশোনা তেমন কিছু হয়নি ছোটবেলা থেকে। তবে খুব ভাল আঁকতে পারে সে। যা দেখবে চটজলদি একেবারে অবিকল এঁকে দেবে। ব্যাস, মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেই ছেলে বাড়ি ছেড়ে পাড়ি দিল ইজিপ্টে। সেই পরের মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে হয়ে উঠল উত্তর ইজিপ্টের ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টিক্যুইটির ম্যানেজার! ওর কথা ছাড়া মাটিতে বেলচা চালানোই যাবে না। এই হল হাওয়ার্ড কার্টার।

- মানে আর্কিওলজিস্ট নিজেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেড?

- তবে আর বলছি কী। কার্টার নিজেই ঠিক করতেন কাকে কোথায় এক্সক্যাভেশনের কাজ দেওয়া হবে। মিশরের রাজনৈতিক মানচিত্রটা তখন অদ্ভুত বুঝলে। দেশ চালানোর দায়িত্ব মিশরের গভর্নমেন্টের থাকলেও আর্কিওলজির দিকটা পুরোপুরি ছিল ব্রিটিশদের দখলে। কায়রো হোটেলের লবিতে তখন প্রতিদিন দেখা যেত ইউরোপীয় ধন কুবেরদের। সবার একটাই লক্ষ্য। একটা ভাল জায়গায় খুঁড়তে দেওয়ার পারমিশন জোগার করা, তার পরে সেখানে একজন ভাল আর্কিওলিজিস্ট লাগিয়ে কাজ করানো। তারপরে সেখান থেকে যা সম্পদ উঠবে তা নিয়ে দেশে ফেরা। কতটুকু মিশরের গভর্নমেন্টের হাতে থাকবে সেটাও ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টিক্যুইটিই ঠিক করে দেবে। এই ভাবেই কতশত ঐশ্বর্য যে ইউরোপের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব মিলিওনিয়ারদের একজন ছিলেন জর্জ হার্বার্ট। যাকে ছাড়া তুতানখামেনের সমাধি খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না।

- ইনি আবার কে? আমরা তো...

- লর্ড কার্নারভনের নাম শুনেছ তো? জর্জ হার্বার্ট ছিলেন ইংল্যান্ডের কার্নারভন শহরের পঞ্চম আর্ল। সেখান থেকেই এমন নাম।

নামে লর্ড হলেও সেই সময় লর্ড কার্নারভনের অবস্থা খুব একটা ভাল কিছু না। বাজারে বিশাল দেনা। যেকোনও দিন নিজের জমি জায়গা বিক্রি করতে হতে পারে। এই দেনা শোধ করতে যে টাকা লাগবে সেটা আনার পথ কী? একমাত্র জুয়ো খেলেই রাতারাতি সেই টাকা জোগাড় করা সম্ভব। লর্ড কার্নারভন নিজের শেষ সম্বল দিয়ে সেই জুয়ো খেললেন মিশরের ওপরে।

কায়রো আসার পরেই কার্নারভনের সাথে দেখা হয় কার্টারের। কার্টার কার্নারভনকে বোঝান যে ভ্যালি অফ কিংসে তিন হাজার বছরের পুরনো এক রাজার ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে। সেটা একবার খুঁজে পেতে পারলে কার্নারভনের দেনা হেসে খেলে শোধ করে দেওয়া যাবে। বলা বাহুল্য কার্টার এখানে তুতানখামেনের সমাধির কথাই বলছিলেন।

- কিন্তু ভবেশদা, এখানে একটা খটকা থেকে গেল। একটু আগে আপনি বললেন যে ভ্যালী অফ কিংসে এত বার খোঁড়াখুঁড়ি হয়ে এত কবর আবিষ্কার হয় যে সবাই ভেবেই নিয়েছিল যে সেখানে আর কিছু নেই। তাহলে হাওয়ার্ড কার্টার এত শিওর হলেন কি করে?

- ঠিক শিওর না বুঝলে, তবে একটা বড়সড় অনুমান উনি করতে পেরেছিলেন। ভ্যালি অফ কিংস থেকেই পাওয়া ছোট ছোট ক্লু ওকে বলে দিয়েছিল যে কাছে পিঠেই কোথাও তুতানখামেনের সমাধি লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। যেমন ধরো একটা ভাঙা কাপে আর একটা ছোট কাঠের বাক্সে ফারাওয়ের নাম পাওয়া গিয়েছিল। আবার ওই ভ্যালিতেই একটা ছোট গর্তে পাওয়া গিয়েছিল তুতানখামেনকে মমি বানানোর জন্য ব্যবহৃত মালমশলা।

তো যেটা বলছিলাম, কার্নারভনকে রাজী করিয়ে হাওয়ার্ড কার্টার নিজেই ভ্যালি অফ দা কিংসের আর্কিওলজির কাজ অথোরাইজ করলেন। নিজের নামই দিলেন চিফ আর্কিওলজিস্ট হিসাবে। তারপরে কাজ হল শুরু।

কার্টার কাজ শুরু করেন ১৯১৪ সালে। কিন্তু গোটা ভ্যালি অফ দা কিংস তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলেও কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু পঞ্চম রামেসিসের একটা সমাধি খুঁজে পাওয়া গেল, সেটাও তেমন কিছু না। অন্যদিকে লর্ড কার্নারভানের ধৈর্য আর অর্থ দুইই ফুরিয়ে আসছিল। ১৯২২ ছিল কার্টারের জন্য শেষ সুযোগের বছর।

২৮শে অক্টোবর, ১৯২২। হাওয়ার্ড কার্টার তখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। অন্যদিকে এত বার খোঁড়াখুঁড়ি চালাবার জন্য বিস্তর ময়লা জমা হয়েছিল গোটা ভ্যালি জুড়ে। একটা বড় ঢিপি তৈরি হয়েছিল সদ্য খুঁজে পাওয়া ষষ্ঠ রামেসিসের কবরের বাইরে। সেইখানটাই আবার ভ্যালিতে ঢোকার রাস্তা। সামনেই শীতকাল আসছে। দলে দলে ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করবে। ওই ময়লার ঢিপি পরিষ্কার না করলে তারা ভ্যালিতে ঢুকবেন কি করে?

লেবাররা যখন ময়লা পরিষ্কারের কাজ করছে তখন হাওয়ার্ড নিজের তাঁবুতে বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সেটা অর্ধেক শেষ হয়েছে এমন সময় একজন শ্রমিক হাঁফাতে হাঁফাতে ওর তাঁবুতে এসে ঢুকল। ময়লা পরিষ্কার করার সময়তে বালির নিচে নাকি একটা মসৃন পাথরের স্ল্যাব দেখা গেছে, দেখে মনে হচ্ছে একটা সিঁড়ির প্রথম ধাপ! নেমে গেছে ষষ্ঠ রামেসিসের সমাধির নিচের দিকে।

দিন সাতেক পরে যখন আরও বালি, নুড়ি, পাথর সরানো সম্ভব হল তখন কার্টার দেখলেন এটা সত্যি একটা সিঁড়ি। দশ ফুট মতো নিচে নেমে গেছে। নভেম্বরের ৫ তারিখে কার্টার সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছলেন। ওর সামনে তখন একটা পাথরের দরজা! দরজার গায়ে লাগানো সিলে একটা কার্তুজ আঁকা। তাতে গোটা গোটা করে হায়রোগ্লিফে লেখা আছে আমেন-তুথ-আঁখ। মানে এইটাই তুতানখামেনের সমাধি!!

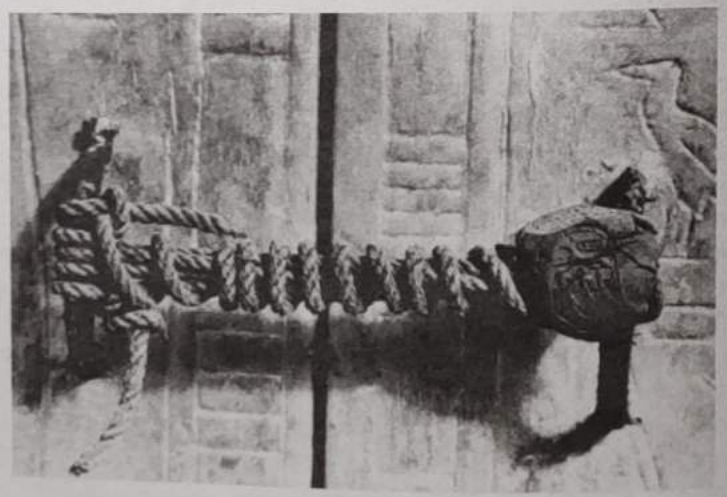

কার্টার দরজাটা খুললেন তখন?! কী পেলেন!

- না ভায়া, দরজা খোলার বদলে কার্টার ওর শ্রমিকদের নির্দেশ দিলেন সিঁড়িটা আবার নুড়ি পাথর দিয়ে বুজিয়ে দিতে।

- অ্যাঁ, এ কিরকম উদ্ভট চিন্তা ভাবনা।

- উদ্ভট চিন্তা নয়। কার্টারের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা এটা। লর্ড কার্নারভানের সাহায্য ছাড়া তো এই সমাধি কার্টার আবিষ্কার করতে পারতেন না। তাই উনি চেয়েছিলেন কার্নারভনই যেন সেই সমাধিতে প্রথম পা রাখেন। রাতারাতি একটা ছোট নৌকায় চড়ে কার্টার চলে এলেন লাক্সরে। সেখানকার টেলিগ্রাম অফিস থেকে কার্নারভনকে একটা মেসেজ পাঠালেন। তার জবাবও এল জলদি।

পরের তিনটে সপ্তাহ কার্টারের কাটল অপেক্ষা করতে করতে। টেনশনে রাতের ঘুম চলে গেছে। যদিও মোটা টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে এই আশ্বাস আদায় করা গেছে যে তারা এই টুম্বের কথা কাউকে বলবে না, তবুও তো যদি কেউ একবার জেনে ফেলে! মরুভূমির মধ্যে ডাকাতদের আক্রমণের সামনে কার্টার কিচ্ছু করতে পারবেন না। অবশেষে নভেম্বরের ২৩ তারিখে কার্নারভন কায়রোতে এসে পৌঁছলেন। সাথে ওর একুশ বছরের মেয়ে লেডি এভিলিন। সেই দিনটা হোটেলে রেস্ট নিয়ে ২৪ তারিখের ভোরবেলায় চলে এলেন ভ্যালি অফ কিংসে। ততক্ষণে কার্টারের দলবল আবার সেই সিঁড়ির মধ্যের বালি সরানো শুরু করে দিয়েছে। আবার একটা গোটা দিন লাগল সেই পাথরের দরজাটা অব্দি পৌঁছতে।

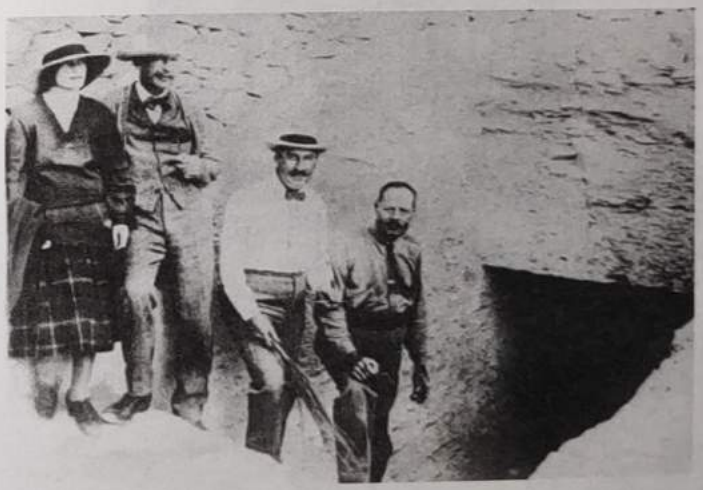

ডানদিক থেকে বাঁদিকে- লর্ড কার্নারভন, হাওয়ার্ড কার্টার, হ্যারি বার্টন, লেডি কার্নারভন

২৫শে নভেম্বর। কার্নারভন দাঁড়িয়ে সেই দরজার সামনে। ওর দিকে তাক করে থাকা ক্যামেরা অপেক্ষা করছে ঐতিহাসিক মুহূর্তটাকে ধরে রাখার জন্য। খোলা হল সেই দরজা আর সাথে সাথেই দেখা গেল..

- তুতানখামেনের ঐশ্বর্য!
- ধুস, দেখা গেল আরেকটা নিচে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে আরেকটা পাথরের দরজাতে। তার গায়েও তুতানখামেনের নাম লেখা শিলমোহর।
২৬শে নভেম্বরের সকাল বেলায় আবার সবাই মিলে আগের দিনের খুঁজে পাওয়া দরজার সামনে উপস্থিত হলেন। এবারে কার্টার লোহার রড দিয়ে সেই দরজার গায়ে একটা গর্ত করলেন। তারপরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ভিতরে উঁকি মারলেন। অনেকদিনের জমে থাকা বাতাসে মোমবাতির শিখা প্রথমে কেঁপে উঠে শান্ত হল। ভিতরের অন্ধকারের সাথে কার্টারের চোখের ধাতস্থ হতে সময় লাগল একটু। এবারে ওর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল! পিছন থেকে লর্ড কার্নাভান ফিসফিস করে জানতে চাইলেন
- কিছু দেখতে পাচ্ছো!?
উত্তরে কার্টার বলল,
- ইয়েস, ওয়ান্ডারফুল থিংস!!

সেই মুহূর্ত !!

কার্টারের চোখের সামনে তখন সোনা চকচক করছে! আর মোমবাতির আলোয় যে ছায়া তৈরি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে একটা অদ্ভুত জন্তুকে!
পাথরের দরজা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলার পরে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা গেল। একটা ছোট ঘর। তাতে ঠেসে বোঝাই করা আসবাব পত্র। গোটা তিনেক খাট, কাঠের তৈরি, সোনায় মোড়ানো। খাটগুলোর পায়ার জায়গায় জন্তুর মুখ বানানো। তার ছায়াই কার্টার দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালে পাওয়া গেল আরেকটা ছোট ঘর। দুটো ঘর মিলিয়ে খাটগুলো ছাড়াও আর যা যা ছিল সেগুলো হল একটা রথ, বাক্স বোঝাই জামা কাপড়, পারফিউমের বোতল। আর পাওয়া গিয়েছিল কিছু শুকিয়ে যাওয়া ফল, রুটি আর মদের পাত্র।

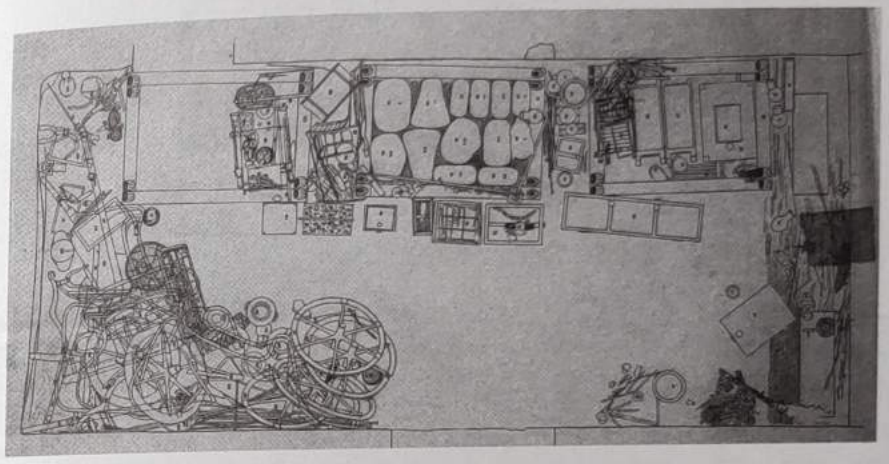

তুতানখামেনের সমাধির নকশা

- মানে মৃত রাজার যাতে পরবর্তী জগতে কোন প্রবলেম না হয় তার সব রকমের ব্যবস্থাই। এটা আগেও বলেছিলেন তো।
- হ্যাঁ, এরকমটা সব সমাধিতেই থাকত।
- কিন্তু সেই আসল জিনিসটা কোথায়?! তুতানখামেনের মমি !
- সবুর করো, বলছি। কার্টার এত বড় একটা ঐশ্বর্য পেয়েও নিজেকে আশ্চর্যজনক শান্ত রেখেছিলেন। এমন কিছু গোটা মিশরের আর্কিওলজির ইতিহাসে আর হয়নি। সেটা উনি খুব ভালভাবেই জানতেন। তাই সমাধির প্রতিটা জিনিসকে যত্ন করে প্রিজার্ভ করার দিকে আগে মন দিলেন। ইউরোপ আর আমেরিকার সেরা এক্সপার্টদের ডেকে আনা হল। তাদের কাজ করার জায়গা হল আশেপাশের সমাধিগুলো। আর্কিওলজিকাল ফোটোগ্রাফার হ্যারি বার্টন সেই সময়ে

খবরের কাগজে তুতানখামেনের কবর আবিষ্কারের খবর

ওখানেই ছিলেন। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের হয়ে কাজ করতে। তাকে দলে নেওয়া হল। হ্যারির কাজ ছিল সমাধির প্রতিটা জিনিসের গায়ে হাত দেওয়ার আগে তার ছবি আগে তুলে রাখা। ছবিগুলো ডেভেলপ করার জন্য কে.ভি ৫৫ বেছে নেওয়া হল। যেটা ছিল তুতানখামেনের ভাইয়ের সমাধি। আরো কয়েকটা টুম্বের মধ্যে তৈরি করা হল ল্যাবরেটরি আর ওয়ার্কশপ। এগুলো করতেই লেগে গেল দু মাস।

বাইরের জগতে ততদিনে তুতানখামেনের সমাধি আর তার গুপ্তধনের কথা ছড়িয়ে গেছে। ভ্যালি অফ দা কিংসে তখন গিজগিজ করছে রিপোর্টার আর ট্যুরিস্টরা। সবাই রোজ ভোর বেলায় টিফিন বক্সে খাবার আর বোতলে জল নিয়ে চলে আসে, এসে জটলা করে সমাধির উল্টোদিকের উঁচু পাঁচিলে। সারাদিন ধরে তারা হাঁ করে টুম্বের দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এই যদি একটা নতুন আবিষ্কার হওয়া জিনিস দেখা যায়! মাঝে মাঝে কার্টারের মনে হত এত লোকের চাপে ওই পাঁচিল না ভেঙে পড়ে। তাহলে আরেকটা নতুন সমাধি তৈরি হয়ে যাবে!

সেই যে ছোট ঘরটার মধ্যে খাটগুলো পাওয়া গিয়েছিল তার উত্তরদিকের দেওয়ালে ছিল আরেকটা দরজা। দরজার দুপাশে দাঁড় করানো ছিল দুটো প্রমাণ সাইজের তুতানখামেনের মূর্তি। যেন ওরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে কিছু। কার্টার বুঝতে পেরেছিলেন ওর পিছনেই আছে তুতানখামেনের সারকোফেগাস। একদিন রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না বলে সেই দেওয়ালের গায়ে গর্ত করে কার্টার, কার্নারভন আর লেডি এভিলিন ঢোকেন। সামনে রাখা বিশাল সোনায় মোড়ানো একটা বাক্স দেখে ফিরে আসেন।

তিনমূর্তির এই রঁদেভুর কথা যদিও আর কাউকে জানানো হয়নি। ১৭ই নভেম্বরে ঘটা করে বেশ কিছু আর্কিওলজিস্ট আর গভর্নমেন্টের অফিশিয়ালদের সামনে উত্তরের দরজাটা খোলেন কার্টার। দরজা খুলতেই দেখা গেল সেই সোনায় মোড়ানো বাক্সটাকে। তার সামনেই ছিল একটা দরজা। সেই দরজা খুলে বেরোলো আরেকটা বাক্স। তার মধ্যে আরেকটা বাক্স।

এত অবধি কাজ এগোবার পরে কার্টারের মনে হল এই ক'মাসে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে একটু বিশ্রাম নেওয়ার দরকার। অন্তত দিন দশেকের জন্য। তারপরে না হয় আবার পুরনো উদ্যমের সাথে কাজ শুরু করা যাবে।

টুম্বের দরজায় লোহার গেট বসিয়ে বাইরে আঁটোসাটো গার্ডের ব্যবস্থা করা হল। কার্টার চলে এলেন লাক্সরের হোটেলে। লর্ড কার্নারভন মেয়ের সাথে বেড়িয়ে পড়লেন আসওয়ানের উদ্দেশ্যে। নীলনদের পথে। নিছকই ট্যুরিস্ট হিসাবে।

নৌকাতেই কার্নারভনের গলায় একদিন একটা মশা কামড়াল। যেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু পরেরদিন শেভিং করার সময় সেই জায়গাটা আবার কেটে ফেললেন কার্নারভন। সাথে সাথে সেখানে আয়োডিন লাগালেও ঘা সারল না। রক্তে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ল। তার সাথে হল নিউমোনিয়া। ওঁকে জলদি কায়রোতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলেও বাঁচানো গেল না। ৫ই এপ্রিল, ১৯২৩ এ রাত ১.৪৫ এ মারা গেলেন জর্জ হার্বার্ট ওরফে লর্ড কার্নারভন। ঠিক সেই সময়তেই নাকি ইংল্যান্ডে কার্নারভনের পোষা কুকুরটিও মারা যায়। এই ঘটনার কদিন আগে কার্টারের পোষা ক্যানারি পাখিরও নাকি একই পরিণতি হয় বিষাক্ত কোবরার ছোবলে।

D, MASS., THURSDAY, APRIL 6, 1923—SIXTEEN PAGES

nce at Holyoke

LORD CARNARVON DIES AT CAIRO OF BLOOD POISONING

Noted Egyptologist Succombs to Pneumonia Attack Following Insect Bite

DISPOSITION OF FINDS BELIEVED ENDANGERED

Action on Materials of Tomb of Tut-ankh-Amen, Discovered By British Peer, Made Uncertain By End

TORNA KILLS TWO

Municipal Limits

Terms Provide School fied Aggregate fo Two Members O

কয়েক সপ্তাহ পরে ইংল্যান্ডের বিকন হিলে যখন কার্নারভনকে কবর দেওয়া হচ্ছে তখন আকাশে খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল মিডিয়ার ভাড়া করা এরোপ্লেন। লক্ষ্য একটাই, লর্ডের শেষ মুহূর্তের ছবি তুলে রাখা।

পরের দিনই সব কটা নিউজ পেপারের প্রথম পাতার খবর ছিল একই। ফারাওয়ের অভিশাপেই নাকি কার্নারভনের মৃত্যু হয়েছে! হাওয়ার্ড কার্টার নিজে বার বার বলার চেষ্টা করলেন, যে তুতানখামেনের কবরে কোনো বিষ, কোনো অভিশাপ ছিল না। তাও কেউ ওর কথার পাত্তাই দেয়নি সেই সময়ে।।

Pharaoh's 3,000-Year-Old Curse Is Seen In Illness of Carnarvons

TOMB SCENES AND FIGURES IN ANCIENT CURSE

MANY FEAR THE OUTCOME

Mate of Excavator, Herself In Grave Condition, Rushing To Husband At Luxor.

মমির অভিশাপের খবর

- কিন্তু ভবেশদা আমি শুনেছিলাম তুতানখামেনের কবরের গায়ে নাকি লেখা ছিল যে এই সমাধির ভিতরে ঢুকবে ফারাওয়ের অভিশাপ তাকেই গ্রাস করবে।
- ধুর, এরকম কিচ্ছু ছিল না আদৌ, গোটাটাই গুজব।
- কিন্তু শুধু তো কার্নারভনই নন, কার্টারের টিমের আরো দুজন নাকি পরপর মারা যান ওই সময়তেই।
- দেখো, সেটাও কোইন্সিডেন্স ছাড়া আর কিছুই নয়। তুতানখামেনের টুম্ব খুঁজে বার করার কাজে জড়িত ছিল সব মিলিয়ে ২৬ জন। তাদের মধ্যে মাত্র ছ'জন পরের দশ বছরে মারা যান। স্বয়ং হাওয়ার্ড কার্টার বহাল তবিয়তে বেঁচেছিলেন আরো ষোল বছর। আর লেডি এভিলিন মারা যান ১৯৮০ তে। তুতানখামেনের অভিশাপ একটা মিথ ছাড়া আর কিচ্ছু না। সেই সময় পপুলার কালচারে অবশ্য এর বেশ ভাল প্রভাব পড়েছিল। মমির অভিশাপ নিয়ে বেশ কিছু সিনেমা তৈরি

হয় সেই সময়। অনেক নিচু মানের থ্রিলার বইও বেরোয় বাজারে।
পিজি এবারে বলল,
- হুম, আমিও ভেবেছিলাম এটা গুজবই। এই স্পন্দনের মতো ভূতে ভয় পাওয়া কয়েকটা লোকজনই নির্ঘাত এটা ছড়িয়েছিল। আপনি কার্টারের গল্পে ফিরে আসুন ভবেশদা। তুতানখামেনের মমির কি হল?
অন্যসময় হলে পিজি আমার হাতে মার খেতো। কিন্তু তখন ভবেশদার ইক্যুইলিব্রিয়ামটা নষ্ট করার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার। তাই চুপ রইলাম। ভবেশদা ঢকঢক করে আধ বোতল জল খেয়ে আবার শুরু করল,
- ১৯২৪ এর ফেব্রুয়ারি মাসে তুতানখামেনের সমাধিতে আবার কাজ শুরু করেন কার্টারবাবু। শেষ বাক্সটা খোলার পরেই দেখা যায় হলুদ কোয়ার্টজাইট পাথরের তৈরি একটা সারকোফেগাস। সেটা খোলার পরেই দেখা গেল কাঠের তৈরি কফিন। ফারাওয়েরই অবয়বে তৈরি। গলায় শুকনো ফুলের মালা। এরকম আরো দুটো কফিনের পরে পাওয়া গেল একদম সোনা দিয়ে তৈরি করা সেই কফিন, যার মধ্যে শোয়ানো আছে তুতানখামেনকে। ফারাওয়ের মুখের ওপরে বসানো সোনার তৈরি মুখোস, যেটা কাঁধ অব্দি নেমে এসেছে। তুতানখামেন বলতেই এখন এই মুখোসটার ছবিই সবাই জানে। ফারাওয়ের কোমরের কাছে রাখা ছিল একটা সোনার তৈরি ছুরি। সারা শরীরে ছিল ১৪৩ পিস অ্যামুলেট। যাতে রাজা ঠিকঠাক অন্য জগতে যেতে পারে।

ফারাওয়ের মমির অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভাল ছিল না, সমাধিস্থ করার সময় পুরোহিতরা মমির গায়ে যে রেসিনের প্রলেপ লাগিয়েছিল সেটা তিনহাজার বছরে অক্সিডাইজড হয়ে কালো চ্যাটচ্যাটে একটা পদার্থে পরিণত হয়। তুতানখামেনের মমিকে সাবধানে কফিন থেকে বার করতেই কাল ঘাম ছুটে গিয়েছিল সবার। এর মাঝে কার্টার নিজেও একটা ভুল করে বসেন। ফারাওয়ের মুখোশটা মমির গায়ে একদম চেপে বসেছিল। ছুরির ডগা গরম করে সেটা দিয়ে মুখোসটাকে আলাদা করেন কার্টার। তাতে তুতানখামেনের মুখের অনেক ক্ষতি হয়। এখন সেই মমি রাখা আছে তুতানখামেনের সেই সমাধিতেই। ভ্যালি অফ কিংসে, কে.ভি ৬২।

- ভবেশদা, ছোটবেলায় আনন্দমেলাতে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, যে তুতানখামেনকে নাকি খুন করা হয়, এটা কি সত্যি?
- সেটা বলা খুব মুশকিল ভায়া, তুতানখামেনের মৃত্যুটা বেশ রহস্যময় বুঝলে। খুন না অ্যাক্সিডেন্ট সেটা কেউ ভাল করে বুঝতে পারেনি এখনও।

- অ্যাক্সিডেন্ট? বুঝল কেমন করে?
- তুতানখামেনের মতো সেলিব্রেটেড ফারাও তো আর দুটো নেই। তাই ওর মমির ওপরেও বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে।
পিজি যথারীতি গুগল খুলে বসে গিয়েছিল, ও এবারে বলল,
- হ্যাঁ, এই তো দেখছি তুতানখামেনের মমির অনেকগুলো এক্সরে, সিটি স্ক্যান হয়েছিল। বেশ কয়েকটা জন্মগত রোগও ছিল দেখছি।
ভবেশদা বলল, এটা তোমাদের ডাক্তারির ব্যাপার, আমি ভাল বুঝব না, কী রোগ ছিল বলত?
পিজি জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, আর ছাড়ে?
- প্রথমত তুতানখামেনের ছিল ক্লিপেল-ফেইল সিনড্রোম। ওর গলার যে শিড়দাঁড়ার হাড়, যাকে আমরা সারভাইকাল ভার্টিব্রা বলি, তার সব কটাই একটা আরেকটার সাথে জোড়া লাগানো ছিল। মানে রাজা ঘাড় ঘোরাতে পারত না। তার সাথে আবার সামান্য স্কোলিওটিক মানে কুঁজও ছিল। পায়ের পাতার হাড়ে আবার ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা গেছে। একে বলে কোহলার সিনড্রোম। মানে ফারাও ভাল ভাবে হাঁটতেও পারত না।

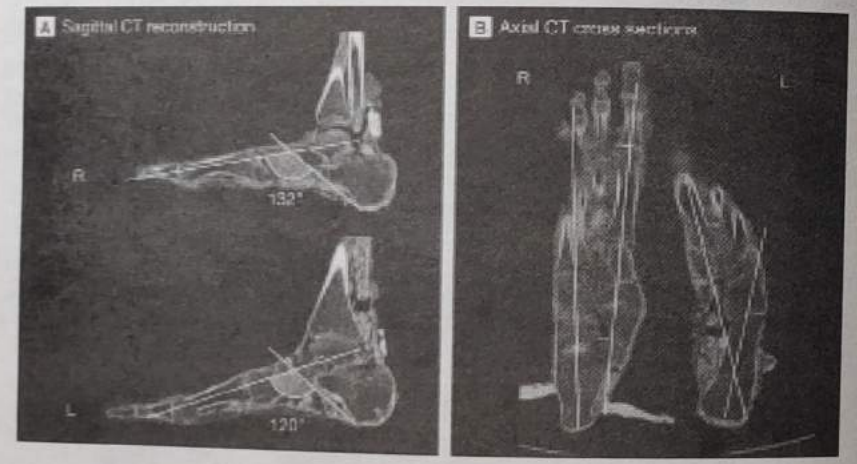

- এটা ঠিক বলেছ পিজি, তুতানখামেনের সমাধিতে বেশ কয়েকটা ওয়াকিং স্টিক পাওয়া যায়।
- হুম, ফারাওয়ের ডি.এন.এ তে নাকি আবার বেশ কয়েকটা ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটের ডি.এন.এ ও পাওয়া যায়। আপনি তো বলেইছিলেন ম্যালেরিয়াতে ভুগতেন তুতানখামেন। এরকমটা হলে তো এমনিতেই যে কারো ইমিউনিটি খুব উইক হয়ে যাবে।
এবারে আমি বললাম, কিন্তু ভবেশদা আপনি যে বললেন অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু?
- হ্যাঁ ভাই, সেটাও হতে পারে বলে অনেকেরই মত। ২০১৩ সালে একটা ব্রিটিশ টিম ফারাওয়ের এক্সরে আর সিটি স্ক্যানগুলো আবার ভাল করে পরীক্ষা করে। তাতে দেখা যায় যে ওর বাঁ পায়ের থাইয়ের হাড় ভাঙা।
- ফিমার?

- হ্যাঁ, তোমরা ওই হাড়টাকে তো তাই বল। এই ভাঙার ধরণ দেখে এক্সপার্টরা প্রেডিক্ট করেছে যে খুব সম্ভবত রথ চালাবার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তাতেই ফারাওয়ের পায়ের হাড় ভাঙে। সেখান থেকেই মৃত্যু। তবে এর এগেইনস্টেও যুক্তি আছে বুঝলে, যে ফারাও ঠিক করে হাঁটতেই পারত না সে কীভাবে রথ চালাবে? সুতরাং সব মিলিয়ে তুতানখামেনের মারা যাওয়ার কারণ এখনও একটা বড় মিস্ট্রি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলি তোমাদের। তুতানখামেনের সমাধিতে আরো দুটো মমি ছিল এটা জানো?
- অ্যাঁ বলেন কী?! এরকম তো আগে কখনো শুনিনি!
- হুম, ওই কে.ভি ৬২ র সমাধিতেই একটা ছোট বাক্স পাওয়া যায়। সেটা খোলার পরে দেখা যায় তাতে রাখা আছে ছোট্ট ছোট্ট দুটো কফিন। তার মধ্যে ছিল ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা দুটো মমি। তুতানখামেনের স্ত্রী দুজন মৃত সন্তান প্রসব করেন বলেছিলাম না। এগুলো তাদেরই। ওরা বাবার কাছেই শুয়েছিল তিন হাজার বছর ধরে।
- আচ্ছা ভবেশদা, তুতানখামেনের স্ত্রী সেই আনখেসেনামেনের কি হল?
- ফারাও মারা যাওয়ার পরেই আনখেসেনামেন একটা বুদ্ধি বার করেন। মিশরের পাশে আনাতোলিয়াতে ছিল হিটাইট প্রজাতির রাজত্ব, তাদের রাজা একটা চিঠি পান। রাজার এক সন্তানকে নাকি রানী আনখেসেনামেন বিয়ে করতে চান। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি! আনখেসেনামেনকে বিয়ে করা মানেই তো মিশরের ফারাও বনে যাওয়া। রাজপুত্র জিনাজা তাই মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু সে মিশরে পৌঁছতে পারেনি। মরুভূমির মধ্যেই কোথাও একটা তাকে খুন করা হয়। খুব সম্ভবত তুতানখামেনের মন্ত্রী আই-ই খুনটা করিয়েছিলেন। আই ফারাও হয়ে বসার পরে আনখেসেনামেনও মিশরের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান। ওর মমি আজও নিখোঁজ।

।।

সেই দিন আড্ডা যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। ভবেশদা আমাদের রুমেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যখন শুতে যাব ঠিক তার আগেই পিজি আমাকে হোস্টেলের করিডরে বার করে নিয়ে এসে একটা অদ্ভুত কথা বলল,
- ভবেশদা আমাদের মিথ্যে কথা বলেছে বুঝলি!
- মিথ্যে?
- হ্যাঁ, ও বলল না যে ও এই পনেরো দিন বাড়িতে ছিল, একদম ডাঁহা মিথ্যে বলেছে।
- তুই জানলি কী করে?
- আমি তোর মতো দুমদাম কাউকে বিশ্বাস করে নি না। আর সবসময় ফাজলামি করি বলে এটা ভাবিস না যে প্রদীপ্ত ঘোষ বোকা।
- না না, সেটা কি আমি বলেছি নাকি? কিন্তু তুই ভাবছিস কী করে যে ভবেশদা মিথ্যে বলেছিল?
- আড্ডার মাঝে মনে আছে তুই একবার উঠে গেলি মেসে এক্সট্রা মিলের অর্ডার দিতে? ভবেশদাও সেই সময় একবার বাথরুমে গিয়েছিল। আমি সেই ফাঁকে ওর ওই নীল রঙের ব্যাগটা খুলে চেক করেছিলাম।
- বলিস কী! এটা কিন্তু ঠিক করিস নি তুই।

- আরে ধুর, ঠিক ভুলের নিকুচি করেছে। ওর ওই পনেরোদিন ধরে বাড়িতে বসে বই পড়াটাকে আমি মেনে নিতে পারিনি। তার ওপরে সাথে ওরকম ঢাউস ব্যাগ নিয়ে কী করছিল? তাই খুলে দেখলাম।
- কি পেলি!
পিজি এবারে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল,
- ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের টিকিট, ভবেশদা এই কদিন ইন্ডিয়াতে ছিল না স্পন্দন!
- তাহলে কোথায় ছিল?
- ইজিপ্ট!

২১

দেইর-এল-বাহরির গুপ্তধন

একটা মানুষকে এই ক'মাস ধরে চিনি, আমরা দুজনেই অনেকটা সময় কাটিয়েছি তার সাথে। শুনেছি দারুণ দারুণ গল্প। ইজিপ্ট নিয়ে আমাদের কৌতুহলটাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ভবেশদা। কিন্তু এত বড় একটা কিছু ও চেপে যাবে? কেন? কী জন্য ওকে যেতে হল মিশরে? প্রশ্ন আমাদের দুজনের মধ্যেই জমা হচ্ছিল। কিন্তু উত্তর কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। উত্তরগুলো ভবেশদাকেই দিতে হত। সেই সুযোগটাও এসে গেল।
ভবেশদা নিজেই ওর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করল। আমি একটু হেসিটেট করছিলাম, কিন্তু পিজি বলল,
- লোকটা তো এখনও অব্দি আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। একটা রিস্ক নিয়েই দেখি না।
ভবেশদার বাড়ি সোনারপুরে। আনন্দপল্লী নামের একটা পাড়ায়। শিয়ালদা থেকে প্রথমে ট্রেন, তারপরে স্টেশনে নেমে রিকশাতে মিনিট পনেরো লাগল। বাড়িটা একটা সরু গলির মধ্যে। খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হত যদি না ভবেশদা গলির মোড়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করত।
একটু দেখে ঢোকো। স্পন্দন আবার যা লম্বা, মাথা না ঠুকে যায় ওর।
ভবেশদার বাড়ির ঢোকার দরজাটা সত্যি একটু বেশিই নিচু। একতলা বাড়ি, দেখলেই বোঝা যায় শেষ তিরিশ বছরে এর গায়ে কেউ হাত দেয়নি। দেওয়ালের নীল রঙটা কালচে হয়ে এসেছে। জানলার গ্রিলগুলোও জং ধরা। বাড়ির ভিতরের অবস্থাও একই রকমের। ভবেশদা অকৃতদার। একা মানুষ থাকে এই বাড়িতে। তাই জিনিসপত্র একটু আগোছালো। একটা ছোট বসার ঘর, একটা ডাইনিং স্পেস, তার গায়ে লাগানো একটা শোওয়ার ঘর আর কিচেন। বাথরুমটা বেডরুমের সাথে অ্যাটাচড। বসার ঘরে পেতে রাখা সোফাটায় আমি আর পিজি বসলাম। বসতে বসতেই একটা জিনিস খেয়াল করে অবাক হলাম একটু। ঘরের মলিন দেওয়াল,অতিসাধারণ আসবাবপত্রের মধ্যে দেওয়ালের সাথে সেট করা শোকেসটা একদম মিসফিট। তার দুটো তাকে থরে থরে বই সাজানো। কি বিষয় নেই সেখানে। মিশর তো আছেই, আরও আছে মিডিয়েভাল সময়ের ইউরোপের ইতিহাস, অর্থনীতি, ফিলোসফি, ফাইন আর্টসের ওপরে লেখা একগাদা বই। তাদের মধ্যে আবার ইউভাল হারারির লেখা স্যাপিয়েনস বইটাও নজরে পড়ল। সত্যি লোকটা একটা বইপোকা বটে।
পিজি এই সময়তেই কনুই দিয়ে আমাকে সামান্য নাড়া দিল। ওর দিকে তাকাতে চোখ দিয়ে ইশারা করল শোকেসের একদম নিচের তাকের দিকে। সেখানে রাখা আছে অনেকগুলো শো

পিস। বেশির ভাগই মিশরীয়। আনুবিস, হোরাস, স্ফিংসের মূর্তি, স্কারাব বিটলের অ্যামুলেট, কাঠের তৈরি আঁখ আরো কত কি। মূর্তিগুলো যেভাবে চকচক করছিল যে ইচ্ছা করছিল হাতে নিয়ে দেখতে। কিন্তু সে লোভ সামলিয়ে চুপ করে বসলাম।

- এই নাও আমপোড়ার সরবত। নিজেই বানালাম, খেয়ে বল দেখি কেমন হয়েছে?

পিজি এবারে গ্লাসটা হাতে নিয়ে সন্দেহের চোখে একঝলক দেখল সবুজ সরবতটার দিকে। তারপরে গ্লাসটা পাশের টেবিলে রেখে ভবেশদাকে বলল,

- হ্যাঁ খাচ্ছি। তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দিন তো দেখি।

আমাদের সোফার উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে ভবেশদা বলল,

- জানি জিজ্ঞাসা করবে এই সময়ে কাঁচা আম কোথা থেকে পেলাম তাই তো? আরে বাজারে এখন পাকা আম চলে এলেও আজকে একটা দোকানদারের কাছে..

- না সেটা নয়।

- তাহলে কী?

আমার হাতে থাকা গ্লাসটার ওপরে চাপটা একটু বাড়ল। পিজি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল,

- আপনি ইজিপ্টে কী করতে গিয়েছিলেন?

কথাটা শুনেই ভবেশদা যেন চমকে গেল একটু। তারপরে সামান্য হেসে বলল,

- বুঝেছি, আগেরদিন আমার ব্যাগটা চেক করেছিলে মনে হয়।

- হুঁ, স্যরি খুব ভুল করেছিলাম, কিন্তু আপনিও তো এতবড় একটা কিছু আমাদের থেকে বেমালুম লুকিয়ে গেছিলেন।

- আমি ইজিপ্টে গিয়েছিলাম এটা যখন জেনেই গেছো তখন আরেকটা কথাও বলি তোমাদেরকে। কয়েক মাস আগে যখন ধর্মতলার এস.বি.আই এর এন.আর.আই ব্রাঞ্চে গেছিলাম তোমাদের সাথে মনে আছে?

- হ্যাঁ আছে তো।

- সেদিন আমার কোনো ভাইয়ের কাজ করতে ওখানে যাইনি। আমার সেরকম কোন ভাইই নেই। গিয়েছিলাম নিজের কাজে। একটা ফরেন ট্রান্সাকশনের দরকার ছিল।

পিজি এবারে টক করে একবার আমার দিকে তাকালো। মুখে কিছু না বললেও চোখদুটো তখন বলছে দেখেছিস তো, সেদিনও আমার সন্দেহটা ঠিক ছিল!

আমরা দুজনেই যখন হতবাক হয়ে বসে আছি তখন ভবেশদা আমাদের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল,

- আমি জানি তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে। উত্তর দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা বলো তার আগে, তোমাদের ওপরে কি আমি আস্থা রাখতে পারি? যা বলব তা প্লিজ নিজেদের কাছেই রেখে দিতে পারবে?

||

ভবেশ সামন্ত কোলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ করে ১৯৮৯তে আর্কিওলজিতে পোস্টগ্র্যাজুয়েশন করেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে। তারপরে বছর তিনেক আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করে পাড়ি জমান ইজিপ্টে। সেখানে ছিলেন টানা পনেরো বছর। ২০০৭ সালে পাকাপাকি ভাবে ফিরে আসেন দেশে।

- কিন্তু দেশে ফিরে কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের গুমটি দিলেন? এটা তো মিলল না।

ভবেশদা এবারে স্বরটা আরো একটু নিচু করে বলল,

- এত কিছু যখন বললামই তখন আরো একটা কথা বলি তোমাদের। মিশরে থাকাকালীন আমি যা রোজগার করেছি তাতে করে আমার এ জীবনে আর অর্থের অভাব হবে না। কিন্তু সেই টাকার প্রতিফলন যদি আমি রোজকার জীবনে দেখাতাম তাহলে আমার প্রাণ সংশয় হত। কোলকাতায় ফিরে এসে নিজেকে একটা লো প্রোফাইলে রাখতেই হত। তাই কলেজস্ট্রীটে বইয়ের দোকানটা নেওয়া। রোজ ঘন্টা ছয়েক ওখানে কাটিয়ে চলে আসি।

- কিন্তু আপনাকে কে মারতে চাইবে?!

- তেমন লোকদের অভাব নেই স্পন্দন ভাই এই দেশে। এই শহরেও এমন অনেকে আছে। যেসব আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে আমার কাজ ছিল তাদের এক একটার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। দেশে ফেরার পরেও সেই কাজ চলছে। তবে ইল্লিগালি আমি কিছু করি না এটুকু তোমাদের বলতে পারি। এ দেশের অনেক প্রাইভেট কালেকটরেরা চেনেন আমাকে। তারাই আসে কোনও আর্টিফ্যাক্ট জেনুইন না ফেক সেটা যাচাই করাবার জন্য। ওই বইয়ের দোকানের আড়ালে এটাই আমার পেশা বলতে পারো। আজকেও এমন একজনের আসার কথা আছে। বিকেলের দিকে আসবে সে।

- তাহলে হঠাৎ করে ইজিপ্ট গেলেন কেন? এমনটা কি প্রায়ই যান নাকি?

- না ভাই, ১১ বছর আগে ফিরে আসার পরে ভাবিনি আবার কখনো যেতে হবে। কিন্তু হল তাও।

- কেন?

- সেটা আমি এখনই তোমাদের বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি আমার থেকে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমার তিনকুলে কেউ জীবিত নেই। বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যাও শূন্য। কিন্তু তোমাদের সাথে মিশতে মিশতে একটা ভাললাগা তৈরি হয়ে গেছে কখন। সেখান থেকেই হয়তো বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। আজকে সেই বিশ্বাসের বশেই এতগুলো কথা বললাম তোমাদের।

এই কথাগুলো বলতে বলতেই ভবেশদা আবেগের বশে আমাদের দুজনের হাত ধরে ফেলেছিল। যে লোকটা জ্ঞানের পাহাড়, পেটুক, হেঁয়ালি করাতে মাস্টার তাকে এরকম ভাবে কখনো দেখব বলে ভাবিনি। ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হয়নি মিথ্যে বলছে বলে। এবং আমি আর পিজি দুজনেই যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক। এই ভবেশদার সিক্রেটটা নিজেদের কাছে রেখে দিতেই পারব। ঘরের বাতাসটা একটু ভারী হয়েছিল। পিজি মনে হয় সেটাকে হালকা করার জন্যই এবারে বলে উঠল,

- উফফ অনেক রাজ কি বাত জানা হল আপনার। করিৎকর্মা লোক মশাই আপনি। তো আজকে বাড়িতে ডেকে এনে শুধু এই আমপোড়ার সরবতই খাওয়াবেন নাকি লাঞ্চে আরো কিছু আছে?

||

মুরগীর মাংসর ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে আমি ভবেশদাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

- আচ্ছা, আপনিও মিশরে অত বছর ছিলেন। চোরাকারবারি নিশ্চয়ই ভালই চলে ওখানে।

- তা আর চলবে না! সরকার যতই নিয়ম কড়া করুক না কেন। তার ফাঁক গলে এখনো প্রতিদিন কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে কোনো না কোনো প্লেন পেটের ভেতর হাজার বছরের পুরনো আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর অন্য দেশে। আবার কখনো কখনো এই চোরাকারবারিদের জন্যেই আর্কিওলজিস্টরা দারুণ দারুণ জিনিস আবিষ্কারও করেছেন।

- সেটা কী রকম?

- দেইর এল বাহরির গুপ্তধনের কথা শোনোনি?
- না তো?
ব্যস, লাঞ্চের টেবিলে উঠে এল এক টুকরো মিশর।

- ১৮৭১ সালের কথা, লাক্সর শহরের পশ্চিম দিকে দেইর এল বাহরি নামের একটা জায়গা। ছোট ছোট চুনাপাথরের পাহাড়ে ভর্তি। সেখানে দুটো ভেঙে পড়া খ্রীষ্টান মনাস্ট্রি ছাড়াও ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন মিশরীয়দের কবর। এর পাশেই ছিল একটা গ্রাম, নাম কুর্না। জনসমক্ষে কুর্নার বাসিন্দাদের পেশা ছিল চাষবাস আর মেষ পালন। কিন্তু তার তলায় তলায় ছিল আরেকটা লুকনো কারবার। সেটা হল ইজিপশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করা। রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে টুকটাক মূর্তি, অ্যামুলেট, পুরনো প্যাপিরাস ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া যেত তাই ওরা বিক্রি করত। ক্রেতা ছিল মূলত ট্যুরিস্টরা, আর কিছু দালাল, যারা আবার সেই গুলোকে বিক্রি করত ইউরোপে আর আমেরিকায়।

আহমেদ মোহামেদ আবদেল রসুল থাকত ওই গ্রামেতেই। একদিন ভোরবেলায় আহমেদ ভেড়া চড়াতে বেড়িয়েছিল। ফেরার সময় খেয়াল করল একটা ভেড়া কম। ব্যাটা নির্ঘাত পাহাড়ের ওপরে উঠে বসে আছে। এরকম মাঝে মধ্যেই হয়। আহমেদ ভেড়াটার ডাক শুনে শুনে একটা ছোট টিলার ওপরে উঠল, আগে কখনো আসেনি এখানে। টিলাতে পৌঁছেই আহমেদ একটা গুহা দেখতে পেল। হারিয়ে যাওয়া ভেড়াটার ডাক আসছে ওখান থেকেই। ব্যাটা ওখানেই ঢুকে বসে আছে।

আহমেদ গুহাতে ঢুকে ভেড়াটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে এমন সময় ওর নজর পড়ল গুহার একটা কোণে। একটা গর্ত মতো দেখা যাচ্ছে না? কাছে গিয়ে বোঝা গেল যে সেটা শুধু একটা গর্তই না। একটা সুড়ঙ্গের মুখ! বুকে ভয় নিয়েই আহমেদ ঢুকে পড়ল সেই সুড়ঙ্গে। কিন্তু একটু এগোতেই পথ শেষ হয়ে গেল।

গুহার মুখে আহমেদ রসুল

- যাহ! ব্লাইন্ড এন্ড?
- সেরকমই ভেবেছিল আহমেদও। কিন্তু সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হল সেখানকার পাথর দেখে আহমেদের সন্দেহ হল। যেন কিছু একটাকে বালি আর ছোট ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে ঢাকা আছে। এর আগে ছোটখাটো কবর খুঁড়ে চোরাকারবারিতে হাত পাকানোই ছিল ওর। তাই এবারেও ওর মনে হল এই বালি পাথরের পিছনে একটা লুকনো সমাধি থাকতে পারে।

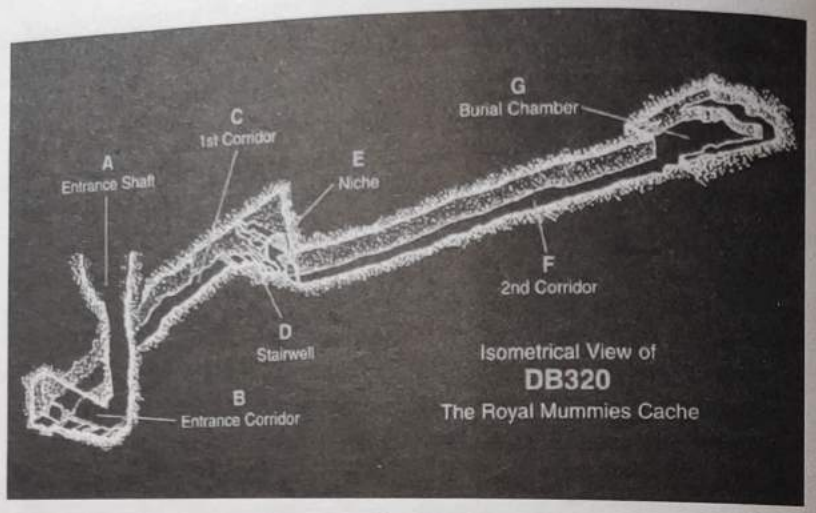

বাড়ি ফিরে আহমেদ ওর দুই ভাইকে এই কথা বলল, সেদিনই রাতের অন্ধকারে তিনজনে মিলে বেলচা হাতে চলল সেই টিলার দিকে। পাথর সরাবার পরে ওরা একটা ছোট ঘর দেখতে পেল। সেই ঘর ফাঁকা হলেও তার উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা দরজা ছিল। সেই দরজা খুলতেই মিলল একটা লম্বা করিডর। করিডরের শেষে আরেকটা ঘর। এবারে এই ঘরে ঢুকেই তিনজনের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে ঠেসে রাখা আছে ৪০ টা মমি!

- একটা কবরে ৪০টা মমি! বলেন কী! এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়।

- হওয়ার কথা নয়ই তো। কিন্তু অনেকটা বাধ্য হয়েই এদের একসাথে রাখা হয়েছিল। কোথা থেকে এল বলত এরা?

- কোথা থেকে?

- ভ্যালি অফ দা কিংস। এই সব কটা মমি কোন না কোন ফারাও বা তাদের আত্মীয়ের ছিল। আগেই বলেছিলাম তো তোমাদের, ভ্যালি অফ দা কিংসে অতগুলো সমাধি থাকলেও সব কটাই পাওয়া যায় ফাঁকা অবস্থায়। শুধু তুতানখামেনের মমিই ওর সমাধিতে মেলে। আর দ্বিতীয় আমেনহোতেপের সমাধিতে পাওয়া যায় গোটা চারেক মমি। বাকি কবরের মমিগুলোর জায়গা ছিল এই দেইর এল বাহরির লুকনো টুম্ব।

- কিন্তু এখানে এদেরকে আনল কে?

- সে আরেক গল্প বুঝলে। ফারাও নবম রামেসিসের মৃত্যুর সাথে সাথেই মিশরের বিশতম ডাইনেস্টি শেষ হয়। গোটা দেশ জুড়ে তখন অরাজকতা চলছে। ডাকাতেরা ততদিনে ভ্যালি অফ দা কিংসের খোঁজ পেয়ে গেছে। লুট চলছে অবাধে। এরই মধ্যে ইজিপ্টের উত্তর আর দক্ষিণে দুজন আলাদা রাজা তৈরি হয়। উত্তরের ফারাওয়ের নাম ছিল নেসবানেবজেদ, দক্ষিণে কার্নাকের মন্দিরে প্রধান পুরোহিতই নিজেকে ফারাও বলে ঘোষণা করে বসেন। তার নাম ছিল পিয়াখ। এর ছেলে পিনেদজেম যখন ফারাও হলেন তখনই তৎপর হলেন ভ্যালি অফ দা কিংসের ফারাওদের মমি গুলোকে বাঁচানোর জন্য। ওর নির্দেশেই সব ফারাওদের ওখান থেকে

তুলে এনে জড়ো করা হয় ইনহেপ নামের এক রানীর সমাধিতে। আর সেই সমাধিটাই খুঁজে পায় এই আহমেদ রসুল।

- তাহলে রসুল তো রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল!

- তা আর বলতে! দেইর এল বাহরির সেই সমাধির ঘরে মমি ছাড়াও ছিল প্রচুর প্যাপিরাস আর পাথরের মূর্তি। তিন ভাই বুঝতেই পেরেছিল যে ওদের হাতে কি লটারি লেগেছে। কিন্তু অতগুলো আর্টিফ্যাক্ট এক সাথে বিক্রি করতে গেলেই লোকের চোখে লাগবে, তাই তাদের মধ্যে কয়েকটাকেই তুলে আনল। সমাধির মুখটা আবার পাথর দিয়ে বুজিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখে একটা গাধাকে মেরে ফেলে রাখল। যাতে গন্ধের চোটে কেউ আর ওই জায়গার ধারে কাছে না ঘেঁসে।

- বাপরে! হেবি চালাক ছিল তো!

- চালাক তো বটেই, তার সাথে সাবধানীও। তিন ভাই মিলে শপথ নেয় যে এই গুপ্তধনের কথা আর কাউকে বলবে না। মিশরের অ্যান্টিক্যুটি ডিপার্টমেন্ট তখন খুব কড়া। দেশ জুড়ে প্রচন্ড ধরপাকড় চলছে, চোরাকারবারি দেখলেই সোজা জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে তাদের। তাই রসুল ভাইরাও খুব ভেবে চিনতে ক্লায়েন্ট সিলেক্ট করত। কাউকে দুম করে আর্টিফ্যাক্ট দেখাতও না। তবে বিক্রি করত বেশ চড়া দামে। সত্যি কথা বলতে কি অত কড়াকড়ির মাঝেও খদ্দেরের তো অভাব ছিল না, তাই বছর দশেকের মধ্যেই রসুল ভায়েরা বড়লোক হয়ে ওঠে। এতবছরে ওরা কিন্তু ওই সমাধি গিয়েছিল মাত্র তিনবার। তাও শেষ রক্ষা হল না।

- ধরা পড়ে গেল?!

- হুম, সেই সময় মিশরে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্টিক্যুইটির হেড গ্যান্সটন ম্যাসপেরো লাক্সরের চারপাশে লুকিয়ে চলা অ্যান্টিকের কেনা বেচার কারবারীদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এতে ওকে সাহায্য করছিল ওর এক আমেরিকান ছাত্র, তার নাম চার্লস উইলবার। চার্লসের মুখের মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল। সেইটাকে কাজে লাগিয়ে চার্লস একজন আমেরিকান ধনকুবেরের ছদ্মবেশে লাক্সর হোটেলে গিয়ে উঠল। ভাল খদ্দের এসেছে, এই খবরটা আব্দুল রসুলের কাছে পৌঁছতে দেরী হয়নি। রসুল নিজে থেকেই চার্লসের সাথে যোগাযোগ করে ওকে নিয়ে এল কুর্ণা গ্রামে নিজের বাড়িতে। হতদরিদ্র গ্রামের মধ্যে রসুল ভাইয়েদের বিশাল বাড়ি দেখেই চার্লসের সন্দেহ হয়েছিল। তাই ওকে রসুল যখন একটা বেশ বড় প্যাপিরাস দেখিয়ে সাড়ে তিনশো পাউন্ড দাম চাইল তখন চার্লস বলল ছোঃ, আমাকে আরো দামী কিছু দেখান। রসুল ভাইয়েরা কিন্তু সাথে সাথে বলে দিল তাদের কাছে এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই।

চার্লসও ছাড়ার পাত্র নয়। এবারে বেশ বড় একটা অ্যামাউন্টের অর্থের লোভ দেখাল ওদের। সেই লোভে পড়েই তখন ওরা বার করে নিয়ে এলো বেশ কয়েকটা স্ক্রোল। চামড়া আর কাপড়ের তৈরি। যেগুলোতে সেই বুক অফ দি ডেডের মন্ত্র লেখা থাকত। স্ক্রোল দেখেই চার্লস বুঝেছিল এটা কোন ফারাওয়ের কবর থেকেই আসছে। সেই স্ক্রোলে একটা কার্তুজও আঁকা ছিল, কিন্তু সেটার পাঠোদ্ধার করতে না পেরে সেটাকে ও পাঠাল কায়রোতে ম্যাসপেরোর কাছে। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এল, কার্তুজে লেখা আছে ফারাও পিনেদজেম এর নাম !! যার নির্দেশে ভ্যালি অফ দা কিংস খালি করে মমিদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাহলে সেই গুপ্তধন এখানেই কোথাও একটা আছে!!

চার্লস এবারে নিজের আসল পরিচয়টা বলতেই রসুল ভায়েরা ভয় পেয়ে গেল। ও ওদের এই বলে ভয় দেখাল যে ফারাওয়ের কবরে ওকে নিয়ে যেতেই হবে নাহলে ও পুলিশে খবর দেবে, চার্লস উইলবারের এই হুমকির চোটে অবশেষে রসুল ভায়েরা রাজী হল ওকে সেই সমাধিতে

নিয়ে যেতে।
পাহাড়ের আড়ালে সমাধির ভিতরে চার্লস ঢুকল রসুল ভায়েদের সাথে। কিন্তু সেখানে ছিল মাত্র একটা মমি।
- কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন চল্লিশটা মমি ছিল!
- চল্লিশটাই ছিল, কিন্তু রসুলরা তো প্রচন্ড চালাক, তাই ওরা রাতের অন্ধকারে সেই সমাধি থেকে একটা মমিকে তুলে এনে অন্য একটা ছোট সমাধিতে রেখে দেয়। তার আশে পাশে কয়েকটা প্যাপিরাস আর মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে চার্লসকে নিয়ে আসে সেই নকল কবরে।
ও কিন্তু বুঝতেই পেরেছিল যে রসুল ভায়েরা ওকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু সেইদিন মুখে কিছু না বলে চুপচাপ সেখান থেকে চলে আসে। খুব জোর বেঁচে গেলাম, এটাই হয়ত তখন মনে মনে ভাবছিল রসুলরা।
কয়েক সপ্তাহ পরে স্বয়ং গ্যাস্টন ম্যাসপেরো লাক্সরে এলেন। এসেই শহরে পুলিশ চিফ কে নির্দেশ দিলেন আহমেদ রসুলকে গ্রেফতার করার। বেশ কয়েকদিন ধরে ম্যাসপেরো জেরা করলেন আবদুল কে। কিন্তু সে নির্বিকার চিত্তে জানিয়ে দিল যে তার কাছে আর গুপ্তধনের সন্ধান নেই। যা ছিল তা চার্লস উইলবারকে দেখানো হয়ে গেছে। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে পুলিশ ওর বাড়িতে সার্চও করতে পারে। তন্ন তন্ন করে গোটা বাড়ি খুঁজেও কিচ্ছু পাওয়া গেল না। আব্দুল রসুল হাসতে হাসতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওর গ্রামে ফিরে গেল।
সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠছে না তখন এবারে আঙুল বেঁকাতেই হল ম্যাসপেরোকে। তিন রসুল ভাইকেই আবার অ্যারেস্ট করা হল। এবারে নিয়ে যাওয়া হল 'কেনা' নামের একটা শহরের জেলখানাতে।
- বেলজোনির প্রথম সেতির টুম্ব আবিষ্কারের সময়ে এই শহরের নাম বলেছিলেন না?
- হ্যাঁ ঠিক বলেছ। এই কেনা শহরের জেলখানাতে ওদের আনার একমাত্র কারণ ছিল পুলিশের চিফ দাউদ পাশা। আসামীদের জেরা করে খবর বার করতে ওর কোন জুড়ি ছিল না।
দু'মাস ধরে তিন ভায়ের ওপরে প্রচন্ড অত্যাচার চালাল দাউদ পাশা। আহমেদের পায়ের নখ একে একে উপড়ে ফেলা হল। আরেক ভাইয়ের পা ভেঙে দেওয়া হল। তাতেও তিনজনের কেউ মুখ খুলল না। দাউদ এবারে একটা চালাকি করলেন। হঠাৎ করে একদিন তিনজনকেই ছেড়ে দিলেন। আহমেদরা বাড়ি ফিরে দেখল ওদের গোটা বাড়ি তছনচ করে দিয়েছে দাউদের পুলিশরা। বাড়ির বউ মেয়েরা ভয়ে কাঁপছে। নিজের প্রাণের মায়া না থাকলেও পরিবারের জন্য তো সবাইকেই চিন্তা করতে হয়। তিন ভাইয়ে মিলে সেইদিন রাতে অনেক আলোচনা করল। ওদের আর বুঝতে বাকি ছিল না যে এইভাবে আর পুলিশদের সাথে লড়াই করা যাবে না।
পরেরদিনই আবার কেনা শহরের পুলিশ ষ্টেশনে দেখা গেল আহমেদকে। নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করতে এসেছে সে। তবে তার শর্ত আছে কয়েকটা, ওর পরিবারের ওপরে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। তিন ভাইয়ের ছেলেদের সরকারী চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। খবর গেল ম্যাসপেরোর কাছে। আহমেদের শর্ত মানতে কোন অসুবিধাই ছিল না ওর।
গ্যাসটন ম্যাসপেরো এবারে নিজে না এলেও পাঠালেন ওর আর এক অ্যাসিস্টেন্টকে। নাম এমিল ব্রুজ। ১৮৮১ সালের ৪ঠা জুলাই ব্রুজ রসুল ভাইয়েদের সাথে ঢুকলেন দেইর এল বাহরির সেই সমাধিতে। সাথে জনা কয়েক পুলিশ। টুম্বের বাইরে তখন ভীড় করে আছে গ্রামের লোকেরা। এত বড় একটা ঐশ্বর্যকে রাতারাতি সরাতে না পারলে ব্রুজের নিজেরই বিপদ। গ্রামের লোকেরা জেনে গেছে এর ঠিকানা। এবারে একবার যদি আক্রমণ করে বসে তাহলে ওই

হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশ দিয়ে ওদের ঠেকানো যাবে না।
সেইদিনই কায়রোতে টেলিগ্রাম করলেন এমিল। বিশাল বড় একটা জাহাজ পাঠানো হল লাক্সর বন্দরে। অন্যদিকে মোটা টাকা দিয়ে ভাড়া করা হল গ্রামেরই তিনশো লোককে। তাদেরকে দিয়ে শুরু হল কবর খালি করার কাজ। মরুভূমির বালির ওপরে সাপের মতো লাইন দিয়ে চলল ওরা। কাঁধে চল্লিশটা কফিন বন্দী মমি, প্রচুর প্যাপিরাস, অগুন্তি মূর্তি আর আসবাবপত্র। ১৪ই জুলাই সেই গুপ্তধন বোঝাই জাহাজ ছাড়ল লাক্সর থেকে। জাহাজ যখন নীল নদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে তখন অদ্ভুত একটা দৃশ্য দুপাশের তীরেতে। সাধারণ মানুষের ভীড় জাহাজ দেখার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাগ করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। কেউ হতাশায় কাঁদছে। বিদেশিদের হাতে দেশের সম্পদ চলে যাওয়ার কষ্টে।

গুহা থেকে মমিদের বার করে নিয়ে আসা হচ্ছে

- এই একই হাল তো আমাদের দেশেও হয়েছিল। ইংরেজরা কত কিছু তুলে নিয়ে চলে গেছে বলুন তো।
- সেটা ঠিক কথা, কিন্তু ম্যাসপেরোকে দোষও দেওয়া যায় না। ও না থাকলে রসুল ভাইয়েরা একে একে ওই সমাধির সব ঐশ্বর্যই বিক্রি করে দিত। মমিগুলোর তো কোনও দামই ছিল না ওদের কাছে। হয়ত নষ্টই করে দিত ওদের। তাহলে মিশরের ইতিহাসের একটা কত বড় অংশ অজানা থেকে যেত ভাবতে পারছ? ওহো, একটা মজার কথা বলা হয়নি, সেই জাহাজ যখন কায়রোর পোর্টে এসে পৌঁছল তখন পোর্টের ক্লার্করা একটা ধন্দে পড়ল। ট্যাক্স তো নিতে হবে জাহাজে থাকা মালের বাবদ। কিন্তু মমির জন্য কত টাকা ট্যাক্স হয় সেটা তো কারোর জানা নেই। শেষে ওরা কীসের নামে ট্যাক্স নিল জানো?
- কীসের?
- শুঁটকি মাছ! শুকনো মমির নিয়ারেস্ট এটাকেই পেয়েছিল।

বলেই ভবেশ দা ঘর কাঁপিয়ে নিজেই হাসতে লাগল। সাথে আমরাও।
হাসি থামতে আমি এবারে বললাম,
আচ্ছা ভবেশদা। তাহলে কার কার মমি পাওয়া গেল ওখানে?
- অনেক ফেমাস ফারাওদের মমি মিলেছিল ভায়া, প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় রামেসিস আর তুতমোসিস, প্রথম সেতি আর আমুনহোতেপ, রানী নেফারতারি তাদের মধ্যে কয়েকজন। এদেরকে এখন রাখা আছে কায়রোর মিউজিয়ামে। তবে একজন রাজপুত্রর মমিও রাখা আছে সেখানে। যাকে দেখতে সবচেয়ে বেশি ভীড় হয়।
এবারে আমাদের কোঁচকানো ভ্রুর দিকে তাকিয়ে ভবেশদা বলল,
এক কাজ করো, গুগল ইমেজে সার্চ করো- 'আন নোন ম্যান ই'
ভবেশদার ঘরে দেখলাম মোবাইলের নেটওয়ার্ক খুব ভাল নয়। ছবিটা ডাউনলোড হতে তাই কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় লাগল। কিন্তু গোটা ছবিটা মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে ওঠার সাথে সাথেই আমি শিউরে উঠলাম। পিজির হাতে মোবাইলটাও কেঁপে উঠল।
এ কেমন মমি ! ঘাড়টা অস্বাভাবিক ভাবে পিছনের দিকে হেলানো। মুখটা বিশ্রি ভাবে হাঁ হয়ে আছে। যেন প্রচন্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছিল এর!
- দেখে ভয় পেয়ে গেলে তো, এমিল ব্রুজও ভয় পেয়ে গেছিলেন।
- মানে দেইর এল বাহরির সেই সমাধিতেই একেও পাওয়া যায়!?
- হ্যাঁ, তবে অন্যদের থেকে একদম আলাদা অবস্থায়। সাধারণ সিডার কাঠের তৈরি কফিনে। অন্যান্য মমির মতো এর গায়ে কোন কাপড়ের ব্যান্ডেজ জড়ানো ছিল না। শরীরটা মোড়ানো ছিল ভেড়ার চামড়া দিয়ে, যেটা কিনা ইজিপ্সিয়ানদের কাছে খুব অপবিত্র একটা জিনিস। মমির শরীর থেকে নাড়িভুঁড়ি বা মাথার ঘিলুও বার করে নেওয়া হয়নি। গায়ে লাগানো হয়নি রেজিনের প্রলেপ, কফিনের শুকনো পরিবেশেই মৃতদেহ শুকিয়ে গিয়ে এমন বীভৎস রূপ নেয়। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে একে মমি বানানো হয়। আর ইচ্ছা করেই এর গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় ভেড়ার চামড়া, ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ একটা কফিনে, যার গায়ে বুক অফ দি ডেডের কোন মন্ত্রই লেখা ছিল না।
- এরকমটা কেন করা হল?

নেফারতারির মমি

প্রথম সেতির মমি

আননোন ম্যান ই-র মমি

- কারণটা খুবই স্পষ্ট, যে বা যারা ওকে কবর দেয় তারা চায়নি ও মৃত্যুর পরে অন্য জীবনে যাক। যে পাপ ও করেছিল তার শাস্তি তো ওকে পেতেই হত।
- কী পাপ?
- মিশরের টুয়েনটিয়েথ ডাইনেস্টির ফারাও ছিলেন তৃতীয় রামেসিস। ওর উপপত্নী 'টিয়ে' ওকে খুন করার প্ল্যান করে। টিয়ের লক্ষ্য ছিল রামেসিসকে মেরে নিজের সন্তান পেন্টাওয়েরকে ফারাও বানানো। তা না হলে রামেসিসের পাটরানী ইসেতের সন্তানই ফারাও হত। এই চক্রান্তে নেতৃত্ব দেয় রাজকুমার পেন্টাওয়ের স্বয়ং। নিজের কয়েকজন চ্যালাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজার ওপরে। পরে রাজপুত্র আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গদের ধরে ফেলা হয়। রাজদ্রোহের একটাই শাস্তি তখন, মৃত্যু। পেন্টাওয়েরের সাথে যারা ছিল তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেও পেন্টাওয়েরের সাথে সেটা করা যায়নি। ফারাওয়ের সন্তান তো, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে সে পর জন্মে যেতে পারবে কী করে? তাই ওকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু ওর মমিকে এমন ভাবে বানানো হল যে ওর প্রাণ তো ফিরে আসবে। কিন্তু গায়ে সেই অপবিত্র ভেড়ার চামড়ার জন্য অন্য জীবনে ও প্রবেশ করতে পারবে না। এই পৃথিবী আর মৃত্যুর পরের জগতের মাঝখানে আটকা থেকে যাবে ও।
- তাহলে এই পেন্টাওয়েরই..
- হ্যাঁ, পেন্টাওয়েরই যে এই 'আননোন ম্যান ই' সেটা প্রমাণ হয় কয়েক বছর আগে। তৃতীয় রামেসিসের ডি.এন.এর সাথে এর ডি.এন.এর অনেক মিল পাওয়া যায়।
- আচ্ছা ভবেশদা, যার জন্য পেন্টাওয়েরকে এই ভয়ানক শাস্তি পেতে হল সেই তৃতীয় রামেসিসের কী হল?
- রামেসিসের মমি সেই দেইর এল বাহরির সমাধিতেই পাওয়া যায়। ২০১২ সালে সেই মমির সিটি স্ক্যান হয় কায়রো ইউনিভার্সিটির রেডিওলজি ডিপার্টমেন্টে। তাতে দেখা যায় রামেসিসের গলায় গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত এতটাই গভীর যে গলার সারভাইকাল স্পাইন অব্দি পৌঁছেছিল। রামেসিসকে খুনই করা হয়। রাজপুত্র পেন্টাওয়েরই সেই খুনি!

তৃতীয় রামেসিসের সেই মমি, গলায় অত্যধিক ব্যান্ডেজ জড়ানো

২২

আখেনাতেন

লাঞ্চ করার পরে আড্ডা মেরে অনেকটা টাইম কেটে গেল। আমাদের বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরোবার প্ল্যান ছিল। কিন্তু ভবেশদা বলল একটু ওয়েট করে যাও। একজন কালেকটার আজকে একটা জিনিস দেখাবার জন্য নিয়ে আসছেন বললাম না, কে জানে হয়ত একটা দারুণ আর্টিফ্যাক্ট দেখতে পেয়ে যাবে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটা ফোন এল ভবেশদার কাছে।

- হ্যাঁ, কত দূরে আছেন? আচ্ছা... না না, গাড়ি নিয়ে আমার বাড়ি অব্দি আসতে যাবেন না। স্টেশনের কাছে বড় পার্কিং লট আছে। ওখানে গাড়ি রেখে একটা রিকশা নিয়ে আসুন। ঠিকানা তো আছেই আপনার কাছে।

ফোনটা রেখে ভবেশদা বলল,

- মক্কেল এসে গেছে প্রায়।

ভবেশদার বাড়িতে যে লোকটা ঢুকল তাকে দেখে কেন জানি না অনেকটা অমরেশ পুরীর মতো লাগল। ওই কাঁচা পাকা গোঁফ আর লম্বা জুলপির জন্যই মনে হয়। বয়স মনে হল পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশ লম্বা। পরণে একটা পোলোর টিশার্ট আর কর্ড্যুরির প্যান্ট। চোখে মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে।

- নমস্কার,আমিই শোভন জাটলা।

- আসুন, আমি ভবেশ সামন্ত।

জাটলার চোখ এবারে আমাদের দিকে পড়েই কুঁচকে গেল। ভবেশদা সেটা খেয়াল করে বলল,

- ওরা আমার ভাইয়ের মতো, প্রদীপ্ত আর স্পন্দন।

- হুম, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমাদের মিটিংটার প্রাইভেসি থাকবে। আসলে এটা ইতনা সেনসিটিভ আর ট্রিকি ইস্যু যে কারোর ওপরে ভরোসা না করে আমি নিজেই এলাম..

- আপনি চিন্তা করবেন না মিস্টার জাটলা। ওরা আমার নিজেরই লোক বলতে পারেন। আপনার সিক্রেটটা এই বাড়ির বাইরে কখনও বেরোবে না।

- ওহ, ওকে।

মুখে ওকে বললেও মনে হল না শোভন বাবুর খুব একটা পছন্দ হল না আমাদের উপস্থিতিটা। তবে কথা আর না বাড়িয়ে ড্রয়িং রুমের সোফাতে বসলেন।

- কী খাবেন বলুন, চা না কফি?

- কুছ নেহি, একটু জল দিন তাহলেই হবে।
এক ঢোকে গ্লাসের অর্ধেক জল শেষ করে শোভন জাটলা সেটা সামনের টেবিলে রাখলেন। ভবেশদা এবারে বলল,
- আপনার সারনেমটা দেখে মনে হয় না আপনি বাঙালি বলে, অথচ দিব্বি ভাল বাংলা বলছেন কিন্তু।
- হা হা, আমাদের আদি বাড়ি রাজস্থানের সিয়ান জেলায় বুঝলেন। কিন্তু দাদু চলে এসেছিলেন কোলকাতায়। আমি তো নব নালন্দায় পড়েছি। তাই জাতে মাড়োয়াড়ি হলেও এখন আদ্যপান্ত বাঙালীই বলতে পারেন। তবে কথার মাঝে একটু অবাঙালি টান মিলতেও পারে।
- বাহ! বেশ, বেশ। তা আপনার যেটা দেখাবার ছিল ওইটা..
- ও, হ্যাঁ।
শোভন জাটলা এবারে ওর সাথে আনা ব্রিফকেসটা খুলল। ভিতর থেকে বার করে আনল একটা রেকট্যাঙ্গুলার চ্যাপ্টা মতো কিছু। বাবল র‍্যাপ দিয়ে মোড়ানো। এবারে ওটা ভবেশদার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল,
- একটু সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন, খুব ফ্র্যাজাইল আছে কি না।
- গত কুড়ি বছর ধরে আমি এমন জিনিস নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করছি মিস্টার জাটলা। আপনার কোনও চিন্তা নেই।
ভবেশদা উঠে গিয়ে অন্য ঘর থেকে একজোড়া গ্লাভস নিয়ে এল। সেটা হাতে পরে নিয়ে বাবল র্যা পটা খুলল। এবারে দেখলাম তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা কালচে মতো স্ল্যাব। দেখে মনে হচ্ছিল পোড়া মাটির তৈরি। তার ওপরে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কিছু লেখা। আমরা দুজনে ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখলাম। কিন্তু মাথা মুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না।
ভবেশদা বেশ খানিকক্ষণ লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে জাটলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,
- এটা আমার্নার লেটার নয় শোভন বাবু।
- মানে!
- এটা ফেক।
- কি বলছেন কি? আমি অলরেডি এটার জন্য ছ'লাখ অ্যাডভান্স করেছি!
- যাকে করেছেন তাকে বলুন টাকাটা ফেরত দিতে। আর বলুন খুব কাঁচা একটা কাজ করেছে সে। মিনিমাম একটা পড়াশোনা না থাকলে ফেক জিনিস প্রডিউস করা যায় না।
- আপনি কি করে শিওর হচ্ছেন যে এটা আসলি নয়?
- এটাই তো আমার কাজ, এই জন্যই আপনি এসেছেন আমার কাছে, তাই নয় কি? এর গায়ে খোদাই করা লিপি গুলো দেখছেন?
- হ্যাঁ দেখেছি তো।
- এটা লেখা আছে ডেমোটিক ভাষায়। যেটা মিশরের সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল।
- হুম, তো?
- আসল আমার্নার চিঠি গুলো লেখা ছিল কিউনিফর্ম হরফে, আক্কাডিয়ান ভাষায়। যেটা এর থেকে অনেক অনেক আলাদা। যে এই কাজটা করেছে সে এটা জানতো না যে এই চিঠির লেখক মিশরীয় না। একজন ব্যবিলনীয়ান।
শোভন জাটলা এবারে উত্তেজনার চোটে টেবিলে একটা ঘুষি মারল। জলের গ্লাসটা আরেকটু

হলেই উল্টে পড়ছিল।
- মাই গড। ভাগ্যিস আপনার খোঁজ পেয়েছিলাম মিস্টার সামন্ত। খুব বাঁচালেন আমাকে এ যাত্রায়!
- ইটস ওকে, এই জন্যই তো আপনার আসা আমার কাছে।
- তা বটে, তা বটে। আচ্ছা আপনার কাছে কিছু..
এই কথা যখন বলছে জাটলা তখন ওর চোখ দেরাজের নিচের দিকের তাকটায়।
- না মিস্টার জাটলা, আমি কোন আর্টিফ্যাক্টের কেনা বেচা করিনা। আর এইগুলো সব শো পিস। পিতলের তৈরি।
-ওহ, আচ্ছা।
জাটলাকে দেখে মনে হল সামান্য মনঃক্ষুণ্ণ হল।
- এনিওয়ে আপনার ফিজটা..
- ক্যাশে দেওয়ার দরকার নেই। ব্যাঙ্ক ডিটেল দিয়ে দেব। ট্রান্সফার করে দেবেন।

||

শোভন জাটলা চলে যাওয়ার পরে আমি ভবেশদাকে বললাম,
- আপনার সত্যি এলেম আছে কিন্তু! কিরকম ঝট করে দেখে বলে দিলেন ওটা ফেক।
- তোমাদের মনে হচ্ছে ঝট করে বলে দিলাম ভাই। কিন্তু এটার জন্য আমাকে কত বছর পড়াশোনা করতে হয়েছে একবার ভাবো তো।
- তা ঠিক, কিন্তু ওই মাটির স্ল্যাবটা আসলে একটা চিঠি? বললেন ব্যাবিলন থেকে এসেছিল। কাকে লিখেছিল?
- যাকে লেখা হয়েছিল সে ছিল মিশরের এমন একজন ফারাও যাকে প্রায় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। আবার সেই লোকটারই ফ্যান ছিল অ্যাডলফ হিটলার। সিগমুন্ড ফ্রয়েড ওকে নিয়েই একবার একটা উত্তপ্ত বাগ বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার ওকে নিয়ে কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডে অপেরাও হয়ে গেল।
- বাপরে! সেলিব্রিটি লোক তো! কে সে?
- তুতানখামেনের বাবা।

||

এইটিন্থ ডাইনেস্টির ফারাও তৃতীয় আমেনহোতেপের মৃত্যুর পরে মিশরের সিংহাসনে আসেন চতুর্থ আমেনহোতেপ। কিন্তু নিজের রাজত্বের পাঁচ বছরের মাথায় এমন একটা কিছু উনি করে বসলেন যাতে করে গোটা দেশটাই কেঁপে উঠল।
ততদিন অবধি দেশ জুড়ে ছিল অজস্র দেবদেবী। আইসিস,হোরাস,মাত, ওসাইরিস,আনুবিস..। আর তাঁদের সবার ওপরে ছিলেন আমুন। থেবসে আমুনের মন্দিরে স্বয়ং ফারাও পুজো দিতে যেতেন। কিন্তু চতুর্থ আমেনহোতেপ ঠিক করলেন যে এত গুলো দেবদেবীর আর দরকার নেই। একজনকে পুজো করলেই হবে।
- একেশ্বরবাদ?
- একদম ঠিক ধরেছ স্পন্দন ভাই। একেশ্বরবাদই বটে। যেমন মুসলিম বা খ্রীষ্টান ধর্ম। যেমন

ছিল আমাদের ব্রাহ্মধর্ম।
আমেনহোতেপ পুজো করতে শুরু করলেন দেবতা আতেন এর। ইনি সূর্যের দেবতা। অন্যান্য দেবতার মতো এর কোন মানুষ বা পশুর রূপ নেই। শুধুমাত্র একটা গোল চাকতিই বোঝায় আতেনকে। রাজা রাতারাতি নিজের নামও বদলে ফেলে রাখলেন - 'আখেনাতেন', যার মানে আতেনের জীবন্ত আত্মা। রাজা আখেনাতেন আর রানী নেফারতিতিই নাকি এই পৃথিবীর দুই নরনারী যারা আতেনের সাথে কথা বলতে পারেন।

শুধুমাত্র তো নিজের নাম বদলালে হবে না। দেশের মানুষের মনেও সেই ধর্মীয় বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাই আখেনাতেনের নির্দেশে দেশের মিশরের বড় বড় মন্দির গুলোতে আমুন, হোরাস, মাত এদের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হল। কার্নাকে আর লাক্সরে তৈরি করা হল আতেনের নতুন মূর্তি।
- তারপর!
- তারপরে রাজার খেয়াল হল যে নিজের একটা নতুন রাজধানীরও দরকার। সেই মতো জায়গা খোঁজা শুরু হল। ফারাওয়ের মনে ধরল নীল নদের পূর্ব পাড়ে নদী থেকে কয়েকশো মাইল দূরে একটা তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা মরুভূমি। নাম আমার্না।
- এটাই সেই আমার্না লেটারের আমার্না?
- হ্যাঁ।
- কিন্তু নদী থেকে এত দূরে রাজধানী! ফারাওয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি?
- না ভাই, এর মতো বুদ্ধিমান ফারাও মিশরের ইতিহাসে আর দুটো নেই। আখেনাতেন বুঝতে পেরেছিলেন যে পুরনো মন্দির ভেঙে নতুন মন্দির করলেও মানুষের মনের কোণে সেই দেবদেবীরা রয়েই যাবে। তাই এমন একটা জায়গা চাই যেখানে আগে কখনো কোন মন্দিরের অস্তিত্বই ছিল না। সেখানে তৈরি হবে দেশের সবচেয়ে বড় আতেনের মন্দির। সেই মন্দিরকে ঘিরে তৈরি হবে ফারাওয়ের নতুন রাজধানী।
যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। প্রস্তাবিত রাজধানীর সীমানায় বসিয়ে দেওয়া হল অনেক গুলো পাথরের

স্টেলা। তার প্রতিটায় একটাই জিনিস খোদাই করা। দেবতা আতেন তার গোল চাকতি নিয়ে। সেই চাকতি থেকে যে রশ্মি গুলো বেরিয়ে আসছে তাদের প্রান্ত গুলো হাতের চেটোর মতো। তারা আশির্বাদ করছে ফারাও আখেনাতেন আর ওর স্ত্রী নেফারতিতিকে। দেশের সেরা আর্কিটেক্টদের কাজে লাগানো হল। শ্রমিকদের দিন রাত একটানা খাটিয়ে মাত্র পাঁচবছরের মধ্যে বানিয়ে ফেলা হল নতুন রাজধানী। ফারাও এর নাম দিলেন আখেতাতেন। যার মানে দিগন্তের সূর্য।

আখেতাতেন একটা দারুণ প্ল্যানড শহর ছিল বুঝলে। সেখানে ছিল বিশাল বড় রাজপ্রাসাদ, রাজার খাস লোকেদের জন্য বিলাসবহুল বাড়ি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজকর্মের জন্য অফিস, সাধারণ মানুষদের জন্য বানানো একতলা ঘর। শহরের মাঝ বরাবর ছিল বড় রাজপথ। নদী অনেক দূরে থাকার জন্য আখেতাতেন আর নীলনদের মধ্যে বানানো হয়েছিল আরেকটা চওড়া রাস্তা। পশুদের পিঠে করে প্রতিদিন সেই পথে আসত শহরের প্রয়োজনীয় জল। ৩০,০০০ জন মানুষ বাস করত সেই শহরে।
- আর আতেনের মন্দির?
- এটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আতেনের মন্দিরের প্ল্যানটাও ছিল বেশ অদ্ভুত রকমের বুঝলে। কয়েক মাইল জুড়ে একটা আয়তকার জায়গার মধ্যে ছিল এটা। মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথে ছিল পাথরের তৈরি বিশাল গেট। কিন্তু ভিতরে কোনো বাড়ি ছিল না। আতেনের গোল চাকতি রাখা ছিল খোলা আকাশের নিচে। সেখানেই পুজো হত দেবতার। দেবতার সামনে ছিল সাতশো একানব্বইটা পাথরের তৈরি বেদী। রোজ সেই বেদী ভরে উঠত নৈবেদ্যতে।
- অদ্ভুত লোক ছিলেন বটে আখেনাতেন! এত র‍্যাডিকাল একটা কিছু করার কথা ভাবলেন কী করে!
- এ তো কিছুই নয় ভাই। আখেনাতেনের ইচ্ছাতে মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত ছবি খোদাই করা হল,

শুধু তা দেখেই দেশের মানুষ চমকে উঠেছিল। সাধারণত সেখানে থাকত ফারাওদের বিজয়গাথা। এবারে সেখানে জায়গা পেল খুব সাধারণ মানুষের জীবন। প্রকৃতির ছবি। ফারাওয়ের নিজের ছবিও খোদাই করা হল একদম অন্যভাবে। অন্যদের মতো দেবতার উপাসনা করার মতো নয়,

আখেতাতেনের ধ্বংসাবশেষ এখন

বা রথে দাঁড়িয়েও নয়। মিশরের মানুষ দেখল ফারাও আখেনাতেনের অন্দরমহলের একটা ছবি। সেখানে রাজা বসে আছেন ওর রানী নেফারতিতির সাথে। ওদের কোলে ওদের তিন কন্যা। তাদের আদর করে চুমু খাচ্ছেন রাজা রানী।

আখেনাতেনের মূর্তিও ছিল বাকি ফারাওদের থেকে একদম আলাদা বুঝলে। গুগলে আখেনাতেন বলে সার্চ করে একটা ছবি দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে।

সত্যি দেখলাম ফারাওয়ের মূর্তিটা অদ্ভুতুড়ে রকমের।

- একী, এরকম উদ্ভট কেন?

- উদ্ভট নয় ভাই। খুব সম্ভবত এটাই কোন ফারাওয়ের সবচেয়ে ঠিকঠাক রিফ্লেকশন। বাকিরা নিজেদের দেবতা বানানোর জন্য এতই ব্যস্ত ছিল যে তাদের সবার মূর্তি হত একই রকমের। গোল মুখ, চোখ, চওড়া কাঁধ, মেদ বর্জিত শরীর। অথচ ওদের কারোর মমির সাথে এই আদল কখনো মেলেনি। কিন্তু আখেনাতেন চেয়েছিলেন দেশের মানুষ তার আসল রূপটাকেই মনে রাখুক। তাই ওর মূর্তিতে লম্বাটে নাক, মুখ, সামনের দিকে এগিয়ে আসা থুতনি, মোটা ঠোঁট। আমার্না শহরের বাউন্ডারিতে ফারাও আর নেফারতিতির ছবি আঁকা যে স্টেলা ছিল সেটা লক্ষ্য করলে আরো দেখতে পাবে যে ফারাওয়ের চওড়া কোমর, নেয়াপাতি ভুঁড়ির আভাস। আখেনাতেনের মমি পাওয়া গিয়েছিল ভ্যালি অফ আ কিংসের ৫৫ নম্বর টুম্বে। ২০০৭ সালে সেই মমির যখন সিটি স্ক্যান করা হয় তখন দেখা যায় যে এই সব ছবি, মূর্তির সাথে আসল মানুষটার হুবহু মিল!

পিজি এবারে খুব কাজের একটা কথা বলল,

- কিন্তু একটা কথা বলুন ভবেশদা। আখেনাতেনের পরেও তো অনেক ফারাওরা এসেছে। রামেসিস যেমন। তাদের গল্প বলার সময় তো কখনো আতেনের কথা বলেননি। আখেনাতেনের শহরের কথাও শুনিনি।

- হ্যাঁ, শোনোনি, তার কারণ হল আখেনাতেন মারা যাওয়ার পরে ওর লেগাসি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়।

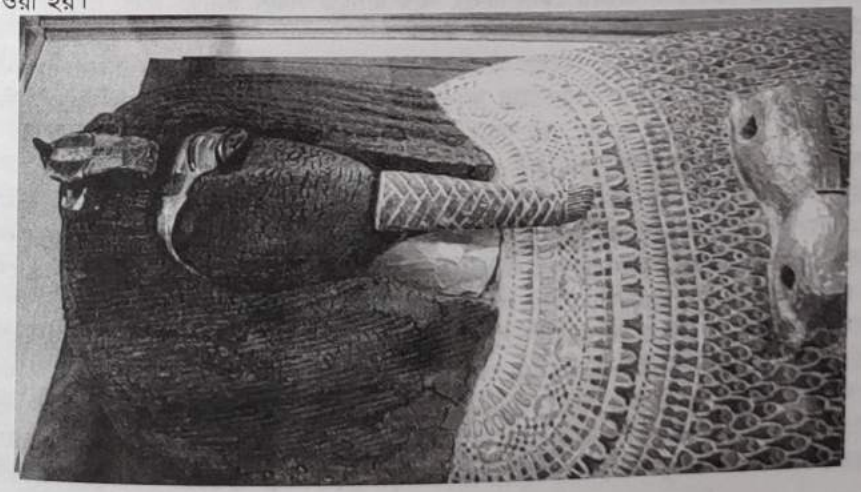

আতেন দেশের এক মাত্র আরাধ্য দেবতা হওয়ায় ক্ষতি হয়েছিল বাদবাকী মন্দিরের পুরোহিতদের। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমুনের মন্দিরের পুরোহিতরা। ওদের প্রতিপত্তি কমে গিয়েছিল। মন্দিরের রেভিনিউ বলেও কিছু ছিল না আর। ১৭ বছর রাজত্ব করার পরে ১৩৩৬ বি.সি তে আখেনাতেন মারা যান। তারপরে মাত্র তিনবছরের জন্য ফারাও হয়েছিলেন ওর ভাই স্মেনখেরে। সেও মারা গেলে পরে ফারাও বানিয়ে দেওয়া হয় ১০ বছরের তুতানখাতেনকে। এই সময় আমুনের মন্দিরের পুরোহিতরা আবার হাল ধরেন। তুতানখাতেনের নাম বদলে রাখা হয় তুতানখামুন। আতেনের সব মন্দির ভেঙে ফেলা হয়। তুতানখামেনের পরের ফারাও হোরেমহেব আর তারও পরে দ্বিতীয় রামেসিস সিস্টেমেটিকালি ফারাও আখেনাতেনের সব মূর্তি ভেঙে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কোন রকম ডক্যুমেন্টে ওর নাম রাখা হয়নি। ওদের কাছে আখেনাতেন ছিলেন শয়তান। ওর সময়টা ছিল অভিশপ্ত। তাই তাদের কোন চিহ্নই আর রাখতে চাননি ওরা।

- আর আখেতাতেন শহরের কি হল?

- তুতানখামেন রাজা হওয়ার চার বছরের মধ্যে আখেতাতেনের শহর খালি করে রাজধানী আবার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় থেবসে।পরিত্যক্ত শহরকে গ্রাস করে মরুভূমি। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট ফ্লিন্ডার্স পেট্রি আবার এই শহর খুঁজে বার করেন।

- আর আমার্নার চিঠিগুলোর কথা বললেন না?

- ও হ্যাঁ, সে এক মজার গল্প বুঝলে। ১৮৮৭ সালের একটা শীতের সকাল। আমার্নার বালির নিচে এক মহিলা জ্বালানী খুঁজছিলেন। আখেনাতেন শহর তৈরির সময় যে কাদামাটির ইঁট ব্যবহার করা হত বহুবছর মাটির নিচে থেকে থেকে সেটাই ভাল জ্বালানীর কাজ করত। না জেনে বুঝেই সেই ইঁটই গ্রামের মানুষ বালি খুঁড়ে তুলে নিয়ে যেত উনুন ধরানোর জন্য।
তো সেই ইঁট খুঁজতে খুঁজতে মহিলাটির হাতে এসে পড়ে একটা ভাঙাচোরা কাঠের বাক্স। সেই বাক্সতে ছিল প্রায় ৪০০ খানা পোড়ামাটির তৈরি ট্যাবলেট। এর মূল্য সেই মহিলা বুঝতে পারেননি। তাই গ্রামেরই একজনের কাছে মাত্র ২০ ইজিপ্সিয়ান মুদ্রার বিনিময়ে গোটা বাক্সটাই বিক্রি করে দেন। সেই লোকটি আবার বাক্সটা নিয়ে হাজির হন লাক্সরের এক অ্যান্টিক ডিলারের কাছে। সেই ডিলার এবারে এক একটা ট্যাবলেট চড়া দামে বিক্রি করতে থাকে চোরাবাজারে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ইজিপশিয়ান ডিপার্টমেন্টের কিউরেটর ওয়ালিস বাজ সে সময় লাক্সরেই ছিলেন। তার হাতে এসে পৌঁছয় কয়েকটা ট্যাবলেট।
ওয়ালিস বাজ কিউনিফর্ম লিপি পড়তে পারতেন। তাই ট্যাবলেট গুলো পড়ে বুঝতে পেরে যান এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব। প্রতিটা পোড়ামাটির স্ল্যাবই এক একটা চিঠি। যে গুলো মিশরের আশেপাশের ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশের রাজারা লিখেছিলেন আখেনাতেনকে। সেখান থেকে ফারাওয়ের ফরেন পলিসির সম্পর্কে একটা দারুণ ধারণা পাওয়া যায়। পরে মোট ৮৮ খানা আমার্না লেটার ওয়ালিস বাজ উদ্ধার করে পাঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। আর কিছু চিঠি আছে কায়রো,বার্লিন আর ল্যুভর মিউজিয়ামে। যেগুলোর চোরাচালান আগেই হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর কোন পাত্তা এখন আর পাওয়া যায় না। শোভন জাটলা ভেবেছিলেন যে তেমনই একটা ট্যাবলেট হয়ত ওর হাতে এসে গেছে।

- আচ্ছা এবারে কেসটা ভাল ভাবে বুঝলাম।

- হুম, সবশেষে আরেকটা ইন্টারেস্টিং গল্প তোমাদের বলে রাখি, এটা না বললে আখেনাতেনের কথা শেষ হবে না। সেটা হল ওর স্ত্রী নেফারতিতির কথা।

পিজি সাথে সাথে বলল,

- হ্যাঁ, শুনেছি উনি নাকি দারুণ সুন্দরী ছিলেন!

- নেফারতিতি থেকে লিজ টেলর। যে কোন সুন্দরী মহিলাকেই দেখছি তুমি চেনো পিজি ভাই। আখেনাতেনের রানী সত্যিই ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। নেফারতিতি শব্দের মানেই হল 'দ্য বিউটিফুল ওয়ান হ্যাজ কাম'। ফারাও তাঁর স্ত্রীকে প্রচন্ড সম্মান দিতেন। ফারাওয়ের অধিকাংশ ছবিই থাকত স্ত্রীয়ের সাথে। নিজের সাথে সাথে স্ত্রীকেও দেবতা আতেনের দূত হিসাবে পরিচয় দিতেন আখেনাতেন। এমনকি নেফারতিতির নামের দুটো কার্তুজও পাওয়া যায়। যে কার্তুজে শুধুমাত্র ফারাওদের নাম লেখারই চল ছিল।

- মানে ভদ্রমহিলা খুব ইনফ্লুয়েনশিয়ালও ছিলেন!

- তা আর বলতে ! তো আসলে যে গল্পটা বলব বলছিলাম। ১৯১২ সালে জার্মান আর্কিওলজিস্ট লাডউইগ বর্কার্ড আখেতাতেন শহরের রুইনের মধ্যে একটা ভেঙে পড়া বাড়ি খুঁজে পান। সেটা ছিল রয়াল স্কাল্পটার তুতমোসের। সেই বাড়িতে বিশাল বেডরুম, বাথরুম, স্টোরেজ প্লেস ছাড়াও ছিল একটা ওয়ার্কশপ। আর এই ওয়ার্কশপেই বর্কার্ড খুঁজে পান স্বয়ং রানী নেফারতিতির একটা দারুণ আবক্ষ মূর্তি! চুনাপাথরের তৈরি, তার ওপরে জিপসামের প্লাস্টার করা। রানী যে কি দারুণ সুন্দরী ছিলেন সেটা এই মূর্তি দেখেই বোঝা যায়। ১৯৩৩ সালে ইজিপ্ট গভর্নমেন্ট জার্মানীর কাছ থেকে এই মূর্তি ফেরত চান। কিন্তু হিটলার বেঁকে বসেন। ওর ইচ্ছা ছিল শুধু মাত্র ইজিপশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে একটা বিশাল মিউজিয়াম বানানোর। আর সেই মিউজিয়ামের ঠিক মাঝখানে একটা ঘরে থাকবে নেফারতিতির সেই মূর্তি। তবে এই মূর্তির একটা অদ্ভুত রহস্য আছে জানো।

যেটার কিনারা করার জন্য আজও আর্কিওলজিস্টরা ইতিহাস হাতড়ে বেরাচ্ছেন।
- এখানেও রহস্য! কী সেটা?

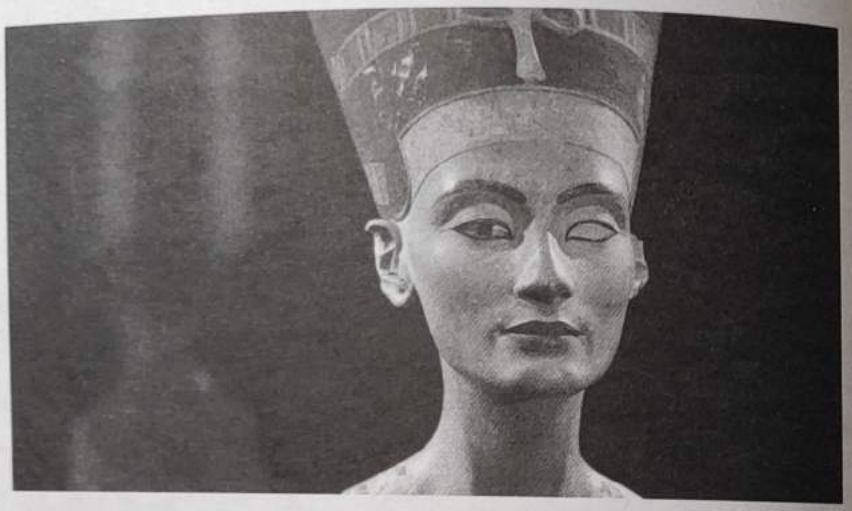

নেফারতিতির মূর্তির গোটাটা রঙ করা হলেও ডানচোখটা ছিল আলাদা ভাবে পাথরের তৈরি। তার ওপরে আঁকা কালো পিউপিল।
- আর বাঁ চোখটা?
- ওখানেই তো রহস্য। সেখানে শুধু চোখের কোঠরটাই আছে। নেফারতিতির মূর্তির বাঁ চোখটা কোথায় সেটা কেউ জানে না!

২৩

হাতসেপসুত

গেল বুধবারে বিকেলের দিকে আমরা ভবেশদার দোকানে গিয়েছিলাম। তবে এবারে দুজনে না, তিনজনে। আমি, পিজি আর সেতু। সেতু পিজির গার্লফ্রেন্ড, যার সাথে রোজ রাত দুটো অবধি পিজি হেডফোনে গুজুর গুজুর করে। মেয়েটা বেশ মিশুকে। সাউথ কোলকাতায় বাড়ি। একবারের আলাপেই আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। পিজির কাছে সেতু ভবেশদার বলা অনেক গল্প শুনেছিল। নিজে ইতিহাসের ছাত্রী, তাই পিজি যেদিন আমাকে বলল সেতু ভবেশদার সাথে আলাপ করতে চায় সেদিন আমি অবাক হইনি একদমই।
দোকানে গিয়ে দেখলাম ভবেশদা যথারীতি বই মুখে নিয়ে বসে আছে। আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালো। তারপরে সেতুকে দেখে কপালে জিজ্ঞাসার ভাঁজ পড়ল। পিজি একগাল হেসে বলল,
- হেঁ হেঁ ভবেশদা, এ হল গিয়ে আমার বিশেষ বান্ধবী।
- হুঁ, সে তোমার দেঁতো হাসি দেখেই বুঝলাম।
তারপরে সেতুর দিকে ফিরে বলল,
- কি নাম তোমার কন্যা?
- অদ্বিতীয়া, অদ্বিতীয়া চ্যাটার্জী। আমি এই প্রেসিডেন্সিতেই পড়ি। হিস্ট্রি অনার্স। প্রদীপ্তর মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি। বিগ ফ্যান হিয়ার! এবার থেকে মাঝে মাঝেই কিন্তু আমি ওদের সাথে চলে আসব আপনাকে জ্বালাতে, যদি না আপনার আপত্তি থাকে।
- আরে আপত্তি কিসের, এ সব গল্প বলতে তো আমারও ভালই লাগে। তোমার নামটা দারুণ সুন্দর। কিন্তু এত বড় নাম ধরে ডাকতে অসুবিধা হবে তো।
- আপনি আমাকে সেতু বলে ডাকতে পারেন, ডাকনাম আমার।
- বাহ, তবে তাই হবে, তবে সেতু, তোমার ভালোনামের সাথে কিন্তু ইজিপ্টের এক বিখ্যাত ফারাওয়ের নামের বেশ মিল আছে।
আমার একটু খটকা লাগল এবারে, বললাম,
- ফারাওয়ের নামের সাথে মিল? কিন্তু ফারাওরা তো সবাই পুরুষই হত।
- না, হাতে গোনা কয়েকজন নারীও ফারাও হয়ে রাজত্ব করে গেছেন। ক্লিওপেট্রা নিজেই তো ফারাও ছিলেন। তবে এখন যার কথা বলছি সে ক্লিওপেট্রার অনেক আগের। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সেলিব্রিটি মহিলা বলতে পারো।
সেতু এটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠল,
- আরিব্বাস! আমার নামে ফারাওয়ের নাম! এই গল্পটা আপনাকে আজকেই বলতে হবে ভবেশদা।

ভবেশদা এবারে মুচকি হেসে বলল,
- তুমি আজ আমাদের গেস্ট, তোমার আবদার ফেলি কী করে? চলো তাহলে বেনুর দোকানেই যাওয়া যাক।
হাতসেপসুত, যে নামের মানে প্রথমা, অদ্বিতীয়া। প্রায় ১৫০০ বি.সি র কথা বুঝলে। এইটিন্থ ডাইনেস্টির রাজা প্রথম তুতমোসিস আর তার রানী আহমোসের কন্যা সন্তান ছিলেন এই হাতসেপসুত।
- এই প্রথম তুতমোসিসের নির্দেশেই ভ্যালি অফ দা কিংসে রাজাদের কবর তৈরি করা শুরু হয় বলেছিলেন না?
- ঠিক ধরেছ, এই সে। প্রথম তুতমোসিস একজন দুর্ধর্ষ রাজা ছিলেন। ইনি ইউফ্রেটিস নদী পেরিয়ে রাজত্ব ছড়িয়ে দেন উত্তর সিরিয়া আর পূর্ব ইরাকে। তুতমোসিস ১৫ বছর রাজত্ব করার পরে যখন মারা গেলেন তখন ওঁর জায়গাতে ফারাও হয়ে এলেন ওঁর আরেক সন্তান দ্বিতীয় তুতমোসিস। তোমাদের তো বলেইছি, মিশরের অনেক রাজ পরিবারেই ভাই আর বোনের মধ্যে বিয়ে হত। এতে মনে করা হত রাজরক্ত অটুট থাকবে। যে তুতানখামেনও ওর বোনকে বিয়ে করেন। তো সেরকমই হাতসেপসুতও বিয়ে করেন দ্বিতীয় তুতমোসিসকে। ওদের একটা মেয়ে হয়, নাম ছিল নেফেরুরে। দ্বিতীয় তুতমোসিসের অন্য আরেক স্ত্রীয়ের গর্ভে এক রাজপুত্রের জন্ম হয়, তৃতীয় তুতমোসিস।
কিন্তু একদিন যখন হঠাৎ করে দ্বিতীয় তুতমোসিস মারা গেলেন তখন রাজকুমারের বয়স মাত্র চার। সে ফারাও যদিও বা হল কিন্তু তার পক্ষে তো আর রাজত্ব শাসন করা সম্ভব নয়। তাই সেই কাজে এগিয়ে এলেন ওর সৎ মা হাতসেপসুত। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল রানী নিজেকেই ফারাও বলে ঘোষণা করে দিলেন।

হাতসেপসুত

পিজি এবারে বলল,
- এরকমটা করলেই হল নাকি? দেশের লোকেরা ছেড়ে দেবে থোড়াই। চাইলাম আর ফারাও হয়ে গেলাম? তাও আবার মেয়ে হয়ে?
সেতু এবারে পিজির দিকে কটমট করে তাকাতে পিজি ব্যাকফুটে চলে এল,
- না মানে দেখ, আমি ফেমিনিজমের এগেইনস্টে গিয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু এতদিন ধরে ভবেশদার গল্প শুনে যা বুঝেছি তাতে ইজিপাশিয়ান রয়াল ফ্যামিলিতে তো প্যাট্রিয়ার্কিটা খুব বেশি ছিল, তাই..
ভবেশদা এবারে পিজিকে মাঝপথে থামিয়ে বলল,
- পিজি ভাই কিন্তু খুব ভুল কিছু বলেনি সেতু। এরকম চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে রানী হাতসেপসুত ছিলেন মারাত্মক রকমের বুদ্ধিমতী বুঝলে। দু'ভাবে নিজেকে ফারাও বানিয়েছিলেন তিনি।
প্রথমত রানী এটা বুঝেছিলেন যে স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে গেলে দেশের সাধারণ মানুষের সাপোর্ট খুব

দরকার। তাই প্রথম থেকেই দারুণ জনদরদী রূপ নিয়েছিলেন হাতসেপসুত। যেখানে ফারাওরা দেশের মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল সেখানে এই নতুন ফারাও কিন্তু দেশের মানুষের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। ওর রাজত্বকালেই প্রথমবার রাজসভার উঁচু উঁচু পদ গুলো দেওয়া হয় সমাজের একদম গ্রাসরুট লেভেলের মানুষদের, যাদের হয়ত কোনও রয়াল লিনিয়েজ নেই কিন্তু যোগ্যতা আছে। হাতসেপসুতের মন্ত্রী সেনেনমুতও ছিল এমনই একজন।
আর দ্বিতীয়ত হাতসেপসুত আরেকটা এমন পন্থা নিয়েছিলেন যাতে ওর অধস্তনেরা ওকে ফারাও বলে মানতে বাধ্য হয়। সেটা হল নিজের নামে মিথ তৈরি করা। তিনি নাকি স্বয়ং সূর্যদেব আমুনে-রে'র সন্তান।
- মানে নিজেই নিজের জন্য মাইথোলজির গল্প বানিয়েছিলেন?
- একদমই তাই। এই প্রোপাগান্ডাকে সফল করার জন্য হাতসেপসুত নিজের নামে একটা বিশাল বড় মরচুয়ারি টেম্পল বানান, সেখানে দেবি হাথোর আর আনুবিসের মন্দিরও ছিল। এই টেম্পল ছিল ভ্যালি অফ দা কিংসের কাছেই। হাতসেপসুতের সেই মন্দিরের গায়ে ওর ওই বানানো গল্প খোদাই করা আছে।

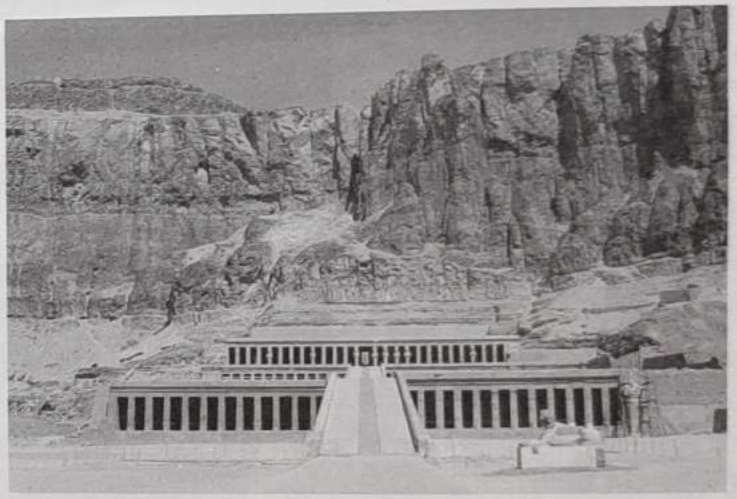

হাতসেপসুতের মন্দির

স্বর্গে নাকি একদিন আমুন-রে ঠিক করেন যে তার একটা কন্যা হবে। যে মিশরে রাজত্ব করবে। জ্ঞানের দেবতা থথ ঠিক করেন যে সেই মেয়েকে ধারণ করবেন রানী
আহমোসে। সেই মতো আমুন নাকি আহমোসের সামনে এসে ওকে আশীর্বাদ করেন।
পিজি এবারে ফিক করে হেসে বলল,
- ব্যস আশীর্বাদ করল আর ওমনি... এ তো একদম আমাদের কুন্তীর মতো গল্প দেখছি।
- হ্যাঁ সেরকমই বলতে পারো। তো আমুনের এই আশীর্বাদের পরেই দেবতা খুম কুমোরের চাকা থেকে নিঁখুত ভাবে তৈরি করেন হাতসেপসুতের আত্মাকে। ন'মাস পরে আহমোসে প্রসব করেন

হাতসেপসুতকে। ব্যস এভাবেই হাতসেপসুত হয়ে গেলেন আমুনের সন্তান। ওঁর জন্মের আগেই নাকি ঠিক ছিল যে উনি ফারাও হবেন। গুগলে হাতসেপসুত টেম্পল ওয়াল গ্রাফিতি বলে সার্চ করলেই দেখ ছবিগুলো পেয়ে যাবে।

ভবেশদা বলার সাথে সাথেই সেতু সেই ছবি বার করে ফেলল, তিনজনে মিলে দেখলাম সেই ছবি। তখনই সেতু ভবেশদাকে বলল,

- কিন্তু দাদা, এখানে তো হাতসেপসুতকে একদমই মেয়েদের মতো লাগছে না, আই মিন..

- আমি বুঝতে পেরেছি কি বলতে চাইছ, নারী শরীরের কোন চিহ্নই নেই এর মধ্যে তাই তো?

- হ্যাঁ।

- হাতসেপসুতের প্রথম দিককার কয়েকটা মূর্তি আছে বুঝলে, সেগুলো দেখলে কিন্তু বোঝা যেত এটা একজন মেয়েরই। তবে ওর রাজত্বের সপ্তম বছর থেকেই হাতসেপসুত একটা অদ্ভুত কান্ড করে বসেন। নিজেকে পুরোপুরি ফারাও প্রমাণ করার জন্য নিজের ছবি, মূর্তি সবেতেই নিজেকে পুরুষ হিসাবে দেখাতে থাকেন। পরনের জামা কাপড়ও হয়ে যায় একদম পুরুষেরই মতো। এমনকি নকল দাড়িও লাগাতে থাকেন হাতসেপসুত। প্রচ্ছন্নে বলতে পারো ফারাওদের প্যাট্রিয়ার্কির জয় হয়েছিল সেখানে। এমন দারুণ একজন মহিলাকেও নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে প্রতিপন্ন করতে হয়

সেতু এবারে বলল,

- কিন্তু একটা জায়গাতে আমার একটু অদ্ভুত লাগছে ভবেশদা। তৃতীয় তুতমোসিস তো একদিন নিশ্চয় সাবালক হয়েই ছিল। সে এটা মেনে নিল কী করে যে তার সৎ মা দেশের ফারাও, যেখানে থ্রোনেতে ওর অধিকারটাই বেশি?

- এটা একটা খুব ভাল প্রশ্ন করলে বুঝলে। তুতমোসিস কোনদিনই এটাকে মানতে পারেননি। কিন্তু হাতসেপসুতের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ওঁকে সরিয়ে নিজেকে ফারাও বানাতে গেলে দেশের মানুষের রাগের কারণ হতে হত। তাই তুতমোসিসকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সাড়ে বাইশ বছর রাজত্ব করার পরে হাতসেপসুত মারা যান। এরপরে তুতমোসিস রাজা হয়েই সৎ-মায়ের ওপরে বদলা নিতে থাকেন।

- সেটা কীভাবে?

কীভাবে আবার, ইতিহাস থেকে এই নারী ফারাওয়ের নাম মুছে দিতে চেয়েছিলেন ফারাও তুতমোসিস। তাই হাতসেপসুতের মন্দিরে থাকা ওর মূর্তি গুলো ভেঙে একটা গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। কার্নাকের মন্দিরের গায়ে হাতসেপসুতের খোদাই করা ছবিও ছেনি দিয়ে তুলে দেওয়া হয়। ঠিক যেমনটা হয়েছিল তুতানখামেনের সাথেও। অথচ দেখ দুজনেই আজকে কত বিখ্যাত।

- আচ্ছা ভবেশদা, হাতসেপসুতের মমিটা কোথায় আছে?

- হাতসেপসুতের মমি মাত্র ১২ বছর আগে আইডেন্টিফাই করা গেছে স্পন্দন ভাই। সে আরেক ইন্টারেসটিং গল্প বুঝলে,

হাতসেপসুতের নকল দাড়ি

১৯০৩ সালে হাওয়ার্ড কার্টার ভ্যালি অফ দা কিংসে হাতসেপসুতের সমাধি খুঁজে পান। সেই সমাধির নম্বর ছিল কে.ভি ২০। কিন্তু অন্য বাকি বেশিরভাগ টুম্বের মতোই কে.ভি ২০ তেও কোন মমি পাওয়া যায়নি। শুধু পাওয়া গিয়েছিল হাতসেপসুতের নাম লেখা একটা বিশাল সারকোফেগাস। আবার সেই সালেই কাছাকাছির মধ্যেই আরেকটা খুব ছোট্ট কবর খুঁজে পান কার্টার। তার নাম ছিল কে.ভি ৬০এ। এখানে একজন নারীর মমি খুঁজে পাওয়া যায় বুঝলে। তার শরীরে ফারাওদের কোন অ্যামুলেট ছিল না। ওটা ছিল হাতসেপসুতের ধাইমার মমি।

আবার অন্যদিকে ১৮৮১ সালে দেইর এল বাহরিতে অতগুলো মমি খুঁজে পাওয়া গেলেও হাতসেপসুতের মমি পাওয়া যায় নি। তবে খুব অদ্ভুত ভাবে পাওয়া গিয়েছিল একটা বাক্স, তার গায়ে এই ফারাওয়ের নাম লেখা। বাক্সের ভিতরে ছিল একটা মামিফায়েড লিভার আর একটা দাঁত। মাড়ির পিছনের দিকের, তোমরা কি একটা বল না এটাকে?

- মোলার?

- হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁদিকের ওপরের পাটির মোলার দাঁত।

- সারকোফেগাস পাওয়া গেল, শরীরের ভিতরের অংশ পাওয়া গেল, এদিকে রানীর মমিটাই হাওয়া!

- হাওয়া নয় মোটেই ভায়া। হাওয়ার্ড কার্টারেরই দোষ বলতে পারো। যে মানুষটা দুর্দান্ত দক্ষতার সাথে তুতানখামেনের সমাধি খুঁজে বার করেছিল সেই কে.ভি ৬০র ভিতরে ভাল করে দেখেননি। পরের দেড়শো বছরে বালির নিচে ঢাকা পরে যায় এই কবরের মুখ। ১৯৮৯তে আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট ডোনাল্ড রায়ান সেই ভ্যালি অফ দা কিংসেই কাজ করছিলেন। অন্য একটা কবরে ঢোকার আগে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য যখন মাটিতে ঝাঁট দিচ্ছেন তখনই একটা বড় পাথরের টুকরোতে ফাটল দেখতে পান। সেই পাথর সরাতেই আবার কে.ভি ৬০ এর মুখটা খুলে যায়।

অন্ধকার ছোট্ট কবরটা ছিল খুবই সাধারণ, কবরের দেওয়ালে তেমন কিছু দারুণ ছবিও আঁকা ছিল না। তবে কবরের এককোণে মেঝের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে যান ডোনাল্ড। সেখানে পড়ে আছে এক মহিলার মমি! বাঁ হাতটা বুকের কাছে যেভাবে জড়ো করা ছিল তাতেই ডোনাল্ড বুঝতে পারেন যে এই মমি রাজ পরিবারের কারোরই। তিনি তখন লাক্সরের একটা দোকান থেকে কাঠের কফিন বানিয়ে তাতে সেই মমিকে পুরে সেই সমাধির মধ্যেই রেখে দিয়ে আসেন।

এর পরে কেটে গিয়েছিল আরো ১৭ বছর। ২০০৬ সালে ইজিপ্টের আর্কিওলজিস্ট জাহি হাওয়াস আবার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। ততদিনে বাকি সব মহিলার মমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হলেও কোনটাকেই হাতসেপসুতের মমি বলে আইডেন্টিফাই করা যায়নি। বাকি রয়ে গিয়েছিল ওই একটি মমিই। তাই ওটাকে ভ্যালি ইফ দা কিংসের সেই কবর থেকে তুলে আনা হয় কায়রো ইউনিভার্সিটিতে। সেখানেই মমির সিটি স্ক্যান করা হয়। সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট তৈরি করার সাথে সাথেই রেডিওলজিস্ট আসরাফ সেলিম দেখা করেন জাহি হাওয়াসের সাথে। মমিতে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে ওপরের চোয়ালের একটা দাঁত মিসিং, হয়ত বয়সের কারণেই পড়ে গিয়েছিল।

এটা শুনেই জাহির মনে পড়ে যায় ১২০ বছর আগে দেইর এল বাহরি থেকে পাওয়া সেই কাঠের বাক্সটার কথা, তাতে একটা দাঁত পাওয়া গিয়েছিল না! সেই বাক্স রাখা ছিল কায়রো মিউজিয়ামেই। তাই সেই দাঁত খুঁজে পেতেও সমস্যা হল না। দেখা গেল দাঁতটা একদম মমির চোয়ালের সেই ফাঁকা যায়গাটায় বসে যাচ্ছে, একেবারে খাপে খাপ! ফারাও হাতসেপসুতের মমি এভাবেই খুঁজে পাওয়া গেল।

দাঁত না থাকলে তবেই যে সেই দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায়, হাতসেপসুত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২৪

আলেকজান্দ্রিয়া

- দাদা, এখানে একটু আস্তে আস্তে কথা বলুন, আর এত ভীড় দাঁড়িয়ে গেলে বাকিরা ঢুকবে কী করে?
- আরে ভাই, আপনি একটু চুপ করুন না। দেখছেন না কী দারুণ সব গল্প বলছেন ইনি? এসব থোড়াই লেখা আছে আপনাদের ডিসপ্লে বোর্ডে?
- বেশ ভাল, তাহলে আপনারা ওঁকে নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে গল্প শুনুন।

গতকাল আমরা তিনজনে মিলে ভবেশদাকে নিয়ে কলকাতা মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। একপ্রকার সেতুর গোঁয়ার্তুমিতেই যাওয়া। কিন্তু গিয়ে বুঝলাম খুব একটা ভুল কিছু করিনি। সেই ছোট্টবেলায় বাবা মায়ের হাত ধরে একবার এসেছিলাম, আর এইবারে এলাম। এই বাড়িটা আমাদের শহরের একটা গর্ব, এটা সত্যি। আমি আগে দিল্লীর মিউজিয়ামও দেখে এসেছি, কিন্তু সেটা এর ধারে কাছেও আসে না। সম্রাট আশোকের পিলার, প্যালিওক্সডনের দাঁত, তিমির স্কেলিটন, আর্মাডিলোর খোলস, সিয়ামিজ টুইন, পাথরের ওপরে খোদাই করা বুদ্ধের বিশাল পায়ের ছাপ দেখে ঢুকলাম মমির ঘরে। এই মমির গল্প ভবেশদা আমাদেরকে আগেই বলেছিল। কিন্তু সেতুর সেই গল্প জানা না থাকায় ভবেশদা আবার শুরু করল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই দেখলাম ওর চারপাশে একটা বেশ ভীড় জমে গেছে। সবাই চোখ বড় বড় করে মমি বানানোর প্রক্রিয়ার কথা শুনছে। এমন সময়তেই বাধ সাধল সেই ঘরের গার্ড। বাইরে নাকি লম্বা লাইন পড়ে গেছে। কেউ আর ঘরে ঢুকতে পারছে না। অগত্যা জনা তিরিশ মানুষের ভীড়টাকে নিয়ে ভবেশদাকে মমি রুমের বাইরে বেরতেই হল।

মমি রুমের বাইরের করিডরটাতেই ভবেশদা স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে গল্প বলে যেতে লাগল। ভীড় আরও গেল বেড়ে। শেষে "চলুন ভবেশদা, আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে" এই বলে পিজি ওঁর হাত ধরে টেনে বার করে নিয়ে এল।

- কীসের লেট বলো তো? আর কোথাও যাবে নাকি আজকে?
- না আর কোথায় আবার যাব? কিন্তু আমি না ডাকলে তো আজকে মিউজিয়াম বন্ধ না হওয়া অব্দি তো আপনি বকবক করেই যেতেন ওদের সাথে। এদিকে আমার খুব খিদেও পেয়ে গেছে।
- চলো তাহলে বেরিয়ে পড়ি। সবই তো দেখা হয়ে গেল।

পিজি এবারে বিজ্ঞের মতো গম্ভীর ভাবে বলল,

- না সব তো হয়নি, হ্যান্ডিক্রাফটের ঘরটা আমার একটু ভাল করে দেখার ইচ্ছা আছে।

আমি বললাম, তুই কী বুঝিস হ্যান্ডিক্রাফটের?

- অনেক কিছু বুঝি, জানিস স্কুলে আমি অরিগামিতে ফার্স্ট হয়েছিলাম।
- হ্যাঁ বুঝলাম, কাগজের নৌকো, ফুল বানাতে পারলেই হ্যান্ডিক্রাফটে দিগ্‌গজ হওয়া যায়। এত বুদ্ধি রাখিস কোথায় তুই বলতো?

পিজি এবারে রেগে মেগে আমাকে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেতু থামালো ওকে,

- তোরা থামবি এবারে? কথায় কথায় বাচ্চাদের মতো লড়িস দুজনে। গ্রো আপ গাইজ ! পিজি তুই অন্য আরেকদিন এসে ওইসব জিনিস দেখে যাস। চলুন ভবেশদা লাঞ্চটা করে নি। আমি বাড়ি থেকে চিকেন স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছি। মা এটা হেব্বি বানায়!

||

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের ময়দানে একটা গাছের নিচে বসলাম চারজনে।সবাইকে স্যান্ডউইচ দিয়ে নিজেরটা এক কামড় বসিয়ে সেতু এবারে বলল,

- ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কারা তৈরি করেছিল বলো তো?
- জানি তো, এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৮১৪তে। মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে একটা পাথরের স্ল্যাবে লেখা আছে দেখলি না?
- দেখেছি, কিন্তু এটা তৈরি হওয়ার পিছনে কিন্তু ইংরেজদের হাত ছিল না। ছিল একজন ড্যানিশ লোক।
- ড্যানিশ?
- হ্যাঁ, নাথানিয়েল ওয়ালিচ ছিলেন একজন ড্যানিশ বোটানিস্ট। তিনিই তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে একটা সংগ্রহশালা করার কথা বলেন এসিয়াটিক সোসাইটিকে। সেটাই আজকে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

ভবেশদা চুপ করে শুনছিল সব, এবারে বলল,

- আচ্ছা মিউজিয়াম নামটা কোথা থেকে এল কেউ বলতে পারবে?

এটা তো কারওই জানা ছিল না, তিনজনেই চুপ করে আছি দেখে ভবেশদা এবারে নিজেই বলল,

- ইজিপ্ট দেশটা না থাকলে আজকে আমরা যেখানে বসে আছি তার নাম মিউজিয়াম না হয়ে অন্য কিছু হতে পারত কিন্তু।
- এখানেও ইজিপ্ট?
- হ্যাঁ ভাই, আরও ভালো করে বলতে গেলে দেশের উত্তরে সাগরের পাড়ের একটা শহর। যেখানে ছিল প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা, আর একটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী।

সেতু এবারে হাত তুলে বলল,

- আমি জানি, আমি জানি! আলেকজান্দ্রিয়ার কথা বলছেন! সেই আশ্চর্যটা ছিল একটা লাইটহাউস। আর আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির কথাও শুনেছি তো। আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।
- একদম ঠিক বলেছ। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিকে কী নামে ডাকা হত জানো?
- সেটা তো জানি না।

ভবেশদা এবারে সেই ট্রেডমার্ক হাসিটা হেসে বলল,

- মিউজিয়াম!
- লাইব্রেরির নাম মিউজিয়াম?

- হ্যাঁ, তাই। চলো তাহলে আলেকজান্দ্রিয়ার গল্পটা গোড়া থেকেই বলা যাক। তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।
৩৩২ বি.সিতে পার্সিয়ানদের হারিয়ে তার বিশাল বড় গ্রীক সেনাবাহিনী নিয়ে মিশরে ঢুকে পড়ল এক ২৪ বছরের যুবক। দেশের সাধারণ মানুষ পার্সিয়ানদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করল সেই যুবকের কাছে। মেমফিস শহরে আমুনের মন্দিরের পুরোহিত তাকে ঘোষনা করল ভগবানের সন্তান হিসাবে। ঠিক যেমন ভাবে তিনহাজার বছর ধরে বাকি ফারাওদের মানুষ চিনে এসেছে। লাক্সর আর কার্নাকের মন্দিরে খোদাই করা হল তার নাম, তার ছবি। আলেকজান্ডার হয়ে গেলেন মিশরের নতুন রাজা।

কিন্তু মেমফিসে বসে থাকলেন না আলেকজান্ডার। বেরিয়ে পড়লেন উত্তরের দিকে। হোমারের লেখা 'ওডিসি'তে পড়েছিলেন এমন একটা গ্রামের কথা যা নীল সমুদ্রের তীরে। যার কাছেই জলের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা দ্বীপ। নাম ফারোস। সেই গ্রাম আর সেই দ্বীপ সত্যি খুঁজে পেলেন আলেকজান্ডার। এখান থেকে বাকি উপনিবেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে, এই ভেবে তিনি ঠিক করলেন এখানেই একটা নতুন শহর গড়ে তোলা হোক। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, এক বছরের মধ্যে আর্কিটেক্ট ডেইনোক্রাটিস বানিয়ে ফেলল সেই শহর, তার নাম দেওয়া হল আলেকজান্দ্রিয়া।
আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার একবছরের মধ্যেই ৩৩১ বি.সি তে আলেকজান্ডার ইজিপ্ট ত্যাগ করে এগিয়ে যান মেসোপটেমিয়া জয় করতে। আট বছর পরে সম্রাট আবার ফিরে আসেন নিজের বানানো শহরে। তবে সেবারে কফিন বন্দী হয়ে।
- কিন্তু লাইব্রেরির কথাটা..
- হ্যাঁ এবারে আসছি সেই কথায়, আলেকজান্ডারের মারা যাওয়ার পরে বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায় ওর জেনারেলদের মধ্যে। তাদের মধ্যেই একজন ছিলেন প্রথম টলেমি সোতার। যার হাত ধরেই মিশরে শুরু হয় টলেমিদের যুগ। এই প্রথম টলেমির রাজসভাতে ছিলেন একজন দার্শনিক, নাম ছিল ডেমেট্রিয়াস। ডেমেট্রিয়াসই ফারাওকে বলেন আলেকজান্দ্রিয়াতে একটা লাইব্রেরি বানাবার কথা, যেখানে পৃথিবীর সব বইয়ের অন্তত একটা করে কপি থাকবে। সোতার সাথে সাথে রাজীও হয়ে যান।
তারপরে যে বিশাল লাইব্রেরি তৈরি হল ডেমেট্রিয়াস তার নাম রাখলেন ' টেম্পল অফ মিউসেস'।

এরই গ্রীক নাম মিউসিয়াম।
- মিউসেস? এরা কারা?

ফারাওয়ের বেশে আলেকজান্ডার, ডানদিকে

নয় মিউসের সাথে দেবতা অ্যাপোলো

- দেবতা জিউস আর নিমোসাইনের নয় কন্যা। ক্যালিওপে, সিলো, এরাটো, ইউটার্পে, মেলপোমেনে, পলিহিমনিয়া, তার্পসিশোরে, থালিয়া আর ইউরানিয়া। এঁরা ছিলেন সাহিত্য, কলা আর বিজ্ঞানের দেবী। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ডেমেট্রিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীকে এদের নামে উৎসর্গ করেন।

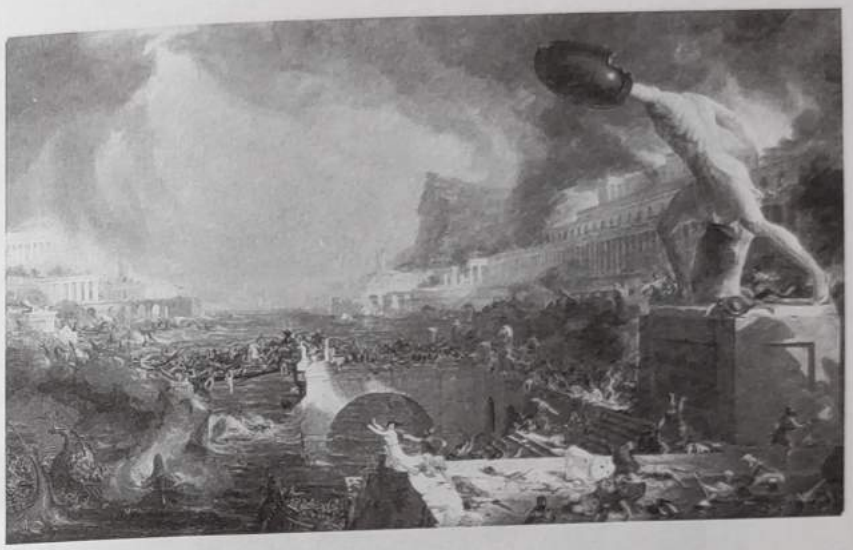

সোতারের ছেলে ফারাও ফিলাদেলফিয়াসের সময় এই লাইব্রেরীর আকার আরও বাড়ে। একশো জন স্কলার কাজ করত সেই লাইব্রেরীতে। তাদের কাজ ছিল পৃথিবীর চারিদিকের পান্ডুলিপি জোগাড় করা, তারপরে সেগুলোকে গ্রীক ভাষায় কপি করে জমানো। ইজিপশিয়ান তো বটেই, হিব্রু, আসিরিয়ান,পার্সিয়ান এমনকি প্রচুর বুদ্ধিস্ট ম্যানাসক্রিপ্টও ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে। সব মিলিয়ে নাকি প্রায় পাঁচ লাখ পান্ডুলিপি ছিল এখানে!

- কিন্তু এত বড় একটা লাইব্রেরীতে আগুন লাগল কী করে?

- আগুনই কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীকে শেষ করেনি সেতু। তার সাথে ছিল ধর্মান্ধতা। ৪৮ বি.সি র কথা, রোমে তখন সিভিল ওয়ার চলছে জুলিয়াস সিজার আর পম্পেই নামের এক মিলিটারি লিডারের মধ্যে। ফারসালাসের যুদ্ধে সিজারের কাছে হেরে পম্পেই আশ্রয় নেন ইজিপ্টে। সিজার তখন মিশর আক্রমণ করে বসেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্র তীরে দাঁড় করিয়ে রাখা ইজিপশিয়ান জাহাজ গুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয় সিজারের সৈন্যরা। কিন্তু সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে শহরের মধ্যেও। সেই আগুনেই আংশিক ভাবে পুড়ে যায় আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি।

- আর বাকি টা?

- এই ঘটনার প্রায় ৭০০ বছর পরে ৬৪০ সালে আরবের হাতে চলে আসে মিশর। সেই সময়তে ওদের এক ধর্মীয় শাসক ছিল ক্যালিফ ওমর। ওমর এই লাইব্রেরীর খবর পায়। তার মনে হয় এই লাইব্রেরীতে যা জ্ঞান আছে তার সব হয় কোরানের বিপক্ষে, নয়ত অবাস্তব। ওর নির্দেশেই লাইব্রেরী খালি করে সব পান্ডুলিপি গুলোকে নিয়ে এসে পাঠানো হয় শহরের ৪,০০০ স্নানাগারে।

- অ্যাঁ, সেখানে ম্যানাসক্রিপ্ট গুলো কি করবে?

- শুনলে খুব খারাপ লাগবে, পান্ডুলিপি গুলো পুড়িয়ে সেই সব বাথ হাউসের জল গরম করা হয়, ছ'মাস ধরে পুড়তে থাকে প্রাচীন পৃথিবীর এই ঐশ্বর্য।

পিজি এবারে বলল,
- ধর্ম যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় তার এর চেয়ে ভাল উদাহরণ মনে হয় আর হয় না। আমাদের দেশেরও কত প্রাচীন পুঁথি এই ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ভবেশদা আপনি তো সেই লাইটহাউসটার ব্যাপারে কিছু বললেন না।
- আজকেই শুনবে? আমাকে যে উঠতে হবে এবারে। একজন দেখা করতে আসবে বাড়িতে।
পিজি চট করে নিজের কবজির দিকে তাকিয়ে বলল,
- সবে তো চারটে বাজে। আপনি বলুন লাইটহাউসের গল্পটা। আপনার আজকে লেট হওয়ার খেসারত হিসাবে আমি সবাইকে অনাদির মোগলাই খাইয়ে দেব না হয়।
- বাবা, একেবারে মোগলাই! তাহলে তো একঘন্টা কেন, ঘন্টা পাঁচেক লেট হলেও কিছু এসে যাবে না।
এই বলে ভবেশদা উঠে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে খুব নিচু স্বরে ফোনে কারোর সাথে কথা বলে এল। আমাদের সামনে বললে কী হত কে জানে। কথা শেষ হওয়ার পরে আবার ময়দানের ঘাসের ওপরে বসতে বসতে বলল,
- অল সেট, এবারে লাইটহাউসের কথা। প্রাচীন পৃথিবীর আরেকটা আশ্চর্য! যার আলো নাকি ১০০ মাইল দূর থেকেও দেখা যেত। একটু আগে ফারোজের দ্বীপের কথা বললাম না...
- হ্যাঁ, যার কথা ওডিসিতে লেখা ছিল।
- হ্যাঁ সেই দ্বীপেই ছিল এই লাইট হাউস। লাইব্রেরি যাঁর সময় বানানো সেই প্রথম টলেমি সোতারই এটা বানানো শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ হয় ওঁর ছেলে ফিলাডেলফিয়াসের সময়। আলেকজান্দ্রিয়ার মুল ভুখন্ড থেকে ফারোর দ্বীপ অব্দি সমুদ্রের বুকে তৈরি করা হয়েছিল গ্রানাইটের

তৈরি একটা লম্বা সেতু। তার ওপর দিয়ে পৌঁছনো যেত এখানে।

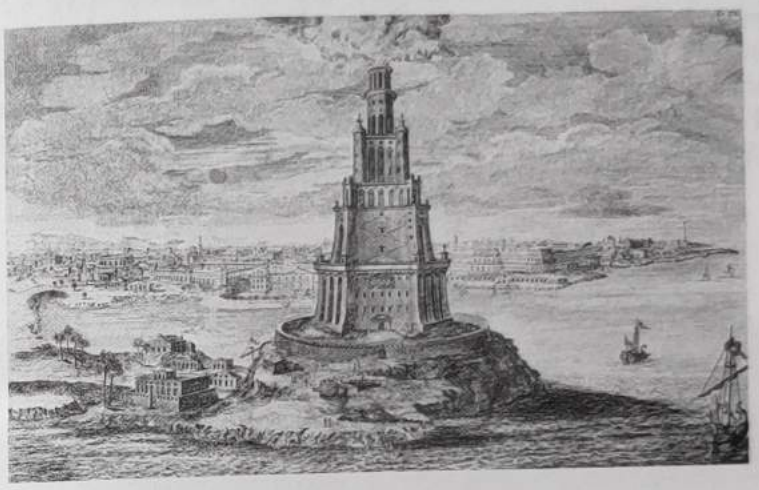

এটা বানানো নিয়ে একটা মজার গল্প আছে জানো, সোসট্রাটোস নামের এক গ্রীক আর্কিটেক্টকে দেওয়া হয় লাইট হাউস বানানোর কাজ। ততদিনে সে গ্রীসে ডেলফি আর ডেলোসের দ্বীপে অ্যাপোলোর মন্দির বানিয়ে বেশ নামডাক করেছে। সেই লোক এমন একটা দারুণ কিছু বানিয়ে তাতে নিজের নাম লিখে রাখবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু টলেমির ইগোতে লেগেছিল এটা। সম্রাটের রাজত্বে সবেতেই সম্রাটের নামই থাকবে। এই ভেবে সোসট্রাটোসের খোদাই করা পাথরের ওপরে প্লাস্টার করে তার ওপরে দ্বিতীয় টলেমির নাম লেখা হল। কিন্তু বছর পঞ্চাশের মধ্যেই সেই প্লাস্টার খসে গেল। ততদিনে টলেমিও অক্কা পেয়েছেন। পরের ফারাওরা আর এইটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তাই টলেমি না, সোসট্রাটোসের নাম বুকে নিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার লাইটহাউস।
পিজি এবারে লাফিয়ে উঠল,
- আরে! এবারে মনে পড়েছে, অ্যাসাসিনস ক্রিড অরিজিন গেমটাতে এই লাইটহাউসটা ছিল...
চট করে একটা চিমটি কেটে সেতু পিজিকে থামালো। পিজির অসময়ে বাজে বকার অভ্যেসের কথা যে ও জানে সেটা বুঝলাম। ভবেশদা বলে চলল,
- প্রায় ১১৭ মিটার লম্বা ছিল এই বাতিঘর। মানে চল্লিশতলা একটা বাড়ির সমান! তিনটে তলা ছিল। একতলাটা চারকোণা। দোতলা অক্টাগোনাল আর একদম ওপরের তলাটা গম্বুজের মতো। সমুদ্রের নাবিকদের আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর চেনানোর জন্য বানানো হলেও একসময় একটা নাম করা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হয়ে যায় এটা বুঝলে। হাজার হাজার মানুষ আসত এটা দেখতে, একতলাতে আবার একটা রেস্তোরাঁও ছিল ট্যুরিস্টদের খাওয়ানোর জন্য। একটা প্যাঁচালো সিঁড়ি বেয়ে লাইট হাউসের একদম চূড়ায় উঠতে পারত তারা। মানে এখনকার আইফেল টাওয়ারের মতো ব্যবস্থা বলতে পারো।

- কিন্তু তাহলে আলোটা আসত কোথা থেকে?
- কেন, সেটার সোর্স ওই চূড়াতেই। কাঠের জ্বালানীর আগুন থেকেই আসত আলো। সেখানে দেবতা জিউস আর সমুদ্রের দেবতা পোসাইডনের মূর্তিও নাকি ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইটহাউসের আলো নিয়ে অনেক মিথ আছে জানো। অনেকে ভাবত ওখানে নাকি একটা বিশাল কাঁচের লেন্স বসানো ছিল! যেটা দিয়ে নাকি সমুদের জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যেত! আবার কেউ ভাবত লেন্সের জায়গাতে একটা চকচকে ধাতব আয়না বসানো আছে। যার গায়ে আগুনের আলো রিফ্লেক্ট করে, তাই অত দূর থেকে দেখা যায় লাইট হাউসের আলো। তবে এর কোনটাই প্রমাণিত নয়। গোটা সৌধটাই এখন সমুদ্রের তলায়।

সেইসময়ের কয়েনে লাইটহাউস

- যাহ, এখন তার মানে ওর কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না?
- না, ওই যে বললাম গোটাটাই এখন জলের নিচে। ১৯৬২ সালে জলের তলা থেকে পোসাইডনের মূর্তিটা উদ্ধার করা গিয়েছিল। আর কিছু পাথরের টুকরো। সেগুলোকে এখন আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে রাখা আছে।
- এত বড় একটা লাইটহাউস জলের তলায় তলিয়ে গেল?! কি করে?
- একদিনে তো যায় নি স্পন্দন ভাই। ১৬০০ বছর ধরে নাবিকদের আলো দেখিয়েছে এই লাইটহাউস। তারপরে একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্য দায়ী প্রকৃতি আর মানুষের বোকামি।

৭৯৬ সালে একটা ভূমিকম্পে আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরের চূড়াটা ভেঙে পড়ে। পরে ৮৫০ সাল নাগাদ সুলতান ইবন তুলুন লাইটহাউসের চুড়ায় একটা মসজিদ বানান। অন্যদিকে কন্সট্যানটিনোপলের রাজার এটা নিয়ে একটা গাত্রদাহ ছিল। তাই একটা ফন্দি আঁটে এটাকে নষ্ট করার। মিশরে একটা গুজব ছড়িয়ে যায় যে এর নিচে নাকি প্রচুর ঐশ্বর্য পোঁতা আছে। ব্যস লোভে পড়ে সুলতান আরম্ভ করে দিলেন বাতিঘর ভাঙতে। যতক্ষণে বুঝতে পারলেন

বোকা বনেছেন ততক্ষণে আর প্রায় কিছুই বাকি নেই। একতলাটা শুধু অবশিষ্ট ছিল। পরে সেটুকুও গুঁড়িয়ে যায় ১৩০৩ সালের আরেক ভূমিকম্পে। এখন সেই জায়গায় সুলতান সালাদিনের কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে।

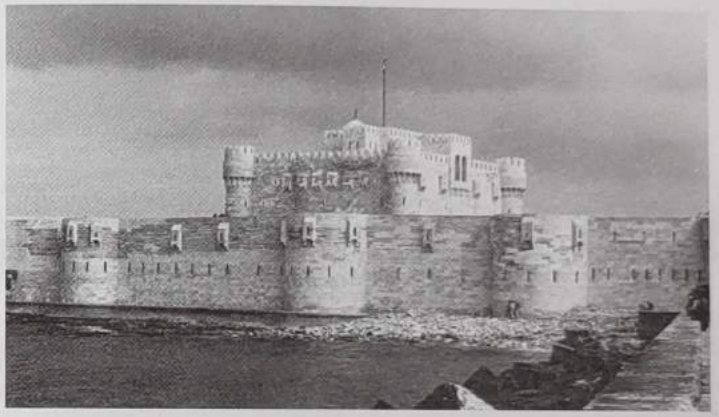

সেতু এবারে বাচ্চাদের মতো হাততালি দিয়ে বলল,
- বাহ! একদিনে দুটো গল্প শুনে ফেললাম! সত্যি ভবেশদা আপনার জবাব নেই!
- কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার আসল মানুষটার গল্প তো বলা বাকি রয়ে গেল। সেটা না হয় অন্য কোনদিন হবে। এখন চল অনাদিতে।
পিজি বলল,
- আরে মোগলাই তো আমি খাওয়াবই। ওঠার আগে এটা তো বলে দিন কার কথা বলছেন?
- বলে দেব? চিনতে পারবে তো? যদি বলি রানী তলাপাত্র?
নাহ্, ভবেশদার হেঁয়ালি করার অভ্যেসটা আর গেল না।

২৫

শেষ গল্প

আগেরদিন মিউজিয়াম থেকে ধর্মতলার মোড় অব্দি হেঁটে আসতে আসতেই মনে হচ্ছিল রানী তলাপাত্র নামটা কোথায় যেন শুনেছি। অনাদির মোগলাইতে কামড় দিয়েই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল! তলাপাত্র... ব্লু নাইল বার... বসির খান!!

- জুলফিকার! গট ইট!

উত্তেজনার চোটে এত জোরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম যে টেবিলে রাখা সসের বোতলটাই উলটে গেল। পিজি, সেতু, ভবেশদা তিনজনেই হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

- কীরে স্পন্দন! পাগলা হলি নাকি!

- ইয়ে..মানে স্যরি.. একটু এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম।

ভবেশদা আবার মাথা নিচু করে খাওয়ার দিকে মন দিয়েছিল। কাঁটা চামচে গাঁথা মোগলাইয়ের টুকরোতে কামড় দিয়ে বলেছিল,

- স্পন্দন ভাই কিন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে।

- কী ধরে ফেলেছে? পিজির মুখে চোখে প্রশ্ন তখনও।

- রানী তলাপাত্র! ধরে ফেলেছি!

- কে সে? বুঝতে পারলি?

- সৃজিত মুখার্জীর জুলফিকার, মনে করে দেখ, তুই আর সেতু একসাথে প্রিয়াতে দেখতে গিয়েছিলি মনে আছে? আমাকে ডজ করে। আমি তখন বর্ধমানে ছিলাম। তারপরে আমাকে সেকেন্ড ইয়ারের অনীকের সাথে..।

- হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে, এত কিছু না বললেও চলবে, তোর গার্লফ্রেন্ড নেই তো আমি কী করব? জুলফিকারে রানী তলাপাত্র ছিল? কোনটা বলত? ও ও! মনে পড়েছে! নুসরত জাহান করেছিল না ক্যারেকটারটা?

- হ্যাঁ, এবারে ভাব সৃজিত জুলফিকারটা কোন প্লে দুটোর আদলে বানিয়েছিল।

- ওই তো, জুলিয়াস সিজার আর অ্যান্তনি ও..

-ক্লিওপেট্রা! রানী তলাপাত্রর রোলটা তো ক্লিওপেট্রার আদলেই ছিল না!

সেতু পিজির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল।

- স্পট অন! কি ভবেশদা ঠিক বলিনি?

- একদম ঠিক ধরেছ। এবারে মন দিয়ে খাও। এসব জিনিস ঠান্ডা হলে খেতে ভাল লাগে না ওত।

- তাহলে ক্লিওপেট্রার গল্পটা কবে বলছেন!!

সেদিনই ঠিক হল ভবেশদার বাড়িতেই সেই গল্প হবে। সেই মতো আগের রবিবার আমরা দুজনে সোনারপুরে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। লাঞ্চের নেমন্তন্নও ছিল। সেতুরও যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওর মাসতুতো দাদার বিয়ে থাকায় যেতে পারেনি।

ভবেশদার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতেই দুপুর আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। খিদের চোটে পেটে ছুঁচোর রিলে রেস চলছিল, তাই গিয়েই বসে পড়লাম লাঞ্চের টেবিলে। ভবেশদাও আমাদের সাথেই বসল।

- ভাতের সাথে মুগের ডাল, মাছের ডিমের বড়া, পাঁঠার মাংস আর চাটনি, ব্যাস। এই আজকের মেনু। চলবে তো?

- চলবে মানে! দৌড়বে!

ভবেশদা যে রান্নাটা ফাটাফাটি করে সেটা জানতামই। নিমেষের মধ্যে ডাল, ডিমের বড়া উড়িয়ে দিয়ে এসে পড়লাম মাংসের সমুদ্রে। খেতে খেতেই মনে পড়ল ক্লিওপেট্রার গল্পটা তো শোনা হচ্ছে না!

- ও হ্যাঁ, ওইটা আজকে বলব বলেছিলাম না? এটা বললেই আমার স্টক মোটামুটি শেষ বুঝলে।

- যা! মানে আর গল্প বলবেন না?

- অনেক তো শুনলে কয়েক মাস ধরে। এবারে না হয় নিজেরাও একটু পড়বে। যাই হোক, ক্লিওপেট্রার গল্পটা তাহলে শুরু করা যাক নাকি? আগে বলো দেখি কতজন ক্লিওপেট্রা ছিলেন?

- কতজন মানে? আমি তো একজনকেই চিনি। সেই অ্যান্তনি আর ক্লিওপেট্রার গল্প। উফফ্ আবার মনে পড়ে গেল..লিজ টেলর..

পিজি এর বেশি এগোবার আগেই আমি টেবিলের নিচে ওর পাটা মাড়িয়ে দিলাম। ব্যাটা বুঝতে পেরে থামল। আমি এবারে ভবেশদাকে বললাম,

- একই নামের অনেক মানুষ ছিলেন নাকি?

- হ্যাঁ ভাই। মিশরের ইতিহাসে তো এরকম অনেক উদাহরণ আছে। যেমন রামেসিস প্রথম, দ্বিতীয়, আমেনহোতেপ প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুর্থ। তেমনই আমাদের এই ক্লিওপেট্রাও আসলে সপ্তম। মানে তার আগে ওই নামের আরও ছ'জন ছিলেন। গ্রীক ভাষায় ক্লিওস মানে গর্ব,আর পাট্রোস মানে পিতা। ক্লিওপেট্রা মানে হল পিতার গর্ব। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের বোনের নাম ছিল ক্লিওপেট্রা। তাই অনেক টলেমি রাজাই নিজের কন্যার নাম ওই নামে রাখতেন। যদিও সপ্তম ক্লিওপেট্রার নিজেরও একটা নাম ছিল, ফিলোপাটোর।

- আচ্ছা ক্লিওপেট্রাই মিশরের শেষ ফারাও ছিলেন না?
- হ্যাঁ, টলেমিদের সাথেই সাথেই মিশরে ফারাওদের রাজত্ব শেষ হয়। ক্লিওপেট্রার বাবা ছিলেন টুয়েলভথ টলেমি, তিনি যখন মারা যান তখন মিশরের সিংহাসনে একসাথে রাজত্ব করতে শুরু করেন ১৮ বছর বয়সের ক্লিওপেট্রা আর ওর ভাই থার্টিংস্থ টলেমি। তবে একসময় দিদিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে সিংহাসনে টলেমি একা বসে পড়েন। ক্লিওপেট্রা তখন সিরিয়াতে পালিয়ে যান, সেখানে গোপনে নিজের সেনাদল তৈরি করতে থাকেন।
আগেরদিন তোমাদের পম্পেইয়ের কথা বলেছিলাম মনে আছে? যে মিশরে আশ্রয় নেওয়ার পরে সিজার আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন ৪৮ বি.সি তে।
- হ্যাঁ বলেছিলেন তো। তখনই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর একটা বড় অংশ পুড়ে যায়।
- ঠিক বলেছ। কিন্তু সিজার তারপরে কী করেন সেটা তো বলিনি। টলেমি প্রথমে পম্পেইকে আশ্রয় দিলেও সিজারের আক্রমণে ভয় পেয়ে ওঁকে হত্যা করেন। কিন্তু এতে জুলিয়াসের রাগ কমেনি। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেই সিজার শমন পাঠান। লক্ষ্য ছিল দুই ভাই বোনকেই দমন করে মিশরের দখল নেওয়া। ফারাও টলেমি আর ওদের আরো এক বোন আরসিনোই আর ফর্টিস্থ টলেমিকে বন্দি করা হল। বাকী রইল ক্লিওপেট্রা।
একদিন জাহাজে করে সিরিয়া থেকে সিজারের জন্য একটা উপহার এল। একটা দারুণ সুন্দর কার্পেট। সেই কার্পেটকে সিজারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সিজারের বন্ধ ঘরে সেই গোটানো কার্পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লিওপেট্রা। রাতারাতি ক্লিওপেট্রা হয়ে গেলেন সিজারের প্রেমিকা। তখন ওর বয়স ২১, আর সিজারের বয়স ৫২। সিজার তখন বিবাহিত।

সিজারের ওপরে কেমন জাদু করে ফেলেছিলেন না ক্লিওপেট্রা! শুনেছিলাম নাকি ফাটাফাটি রকমের সুন্দরী ছিলেন!
পিজি এবারে আমার কথার রেশ টেনে বলল,
- হ্যাঁ অ্যাসটেরিক্স ও ক্লিওপেট্রা কমিক্সটা পড়েছিলি তো। ওতে তো এটাসেটামিক্স বার বার বলছে ক্লিওপেট্রা দারুণ সুন্দরী। আর ওর নাকটা নাকি সবচেয়ে সুন্দর।

- তবে সত্যি বলতে কি, চেহারায় কিন্তু রানী ক্লিওপেট্রা মোটেই মারকাটারি সুন্দরী ছিলেন না।
- তাই নাকি?
- হ্যাঁ ভাই, সৌন্দর্য তো আর শুধু শরীরে হয় না। ব্যক্তিত্বেও হয়। রানীর ব্যক্তিত্বই নাকি তাকে মোহময়ী করে তুলেছিল। প্লুটার্ক নামের এক হিস্টোরিয়ানের লেখাতে ক্লিওপেটার সম্পর্কে অনেকটা জানা যায় । তার মতে রানীর মধ্যে নাকি একটা অদ্ভুত চার্ম ছিল। ও কথা বললে নাকি

মনে হত বাদ্যযন্ত্রের অনেকগুলো তার পরপর কেঁপে উঠছে। এমনই মিষ্টি ছিল সেই গলার স্বর। তার সাথে সাথে ক্লিওপেট্রা ছিলেন দারুণ বিদুষীও। ম্যাথ, ফিলোসফি, অ্যাস্ট্রোলজিতে নাকি ছিল গভীর জ্ঞান। তা ছাড়া সাতটা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ক্লিওপেট্রাই টলেমিদের মধ্যে প্রথম যিনি মিশরীয়দের ভাষায় লিখতে পড়তে পারতেন। এবারে তোমরাই বলো, এ হেন মহিলার আকর্ষণ উপেক্ষা করা কি সম্ভব কারোর পক্ষে?

- বাপরে! সিজারকে দোষ দেওয়া যাবে না তাহলে দেখছি।

- না একদমই দেওয়া যাবে না। ক্লিওপেট্রা কৌশলে নিজের শত্রুকে বানিয়ে নিয়েছিলেন নিজের প্রেমিক। থার্টিন্থ টলেমি সিজারের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই যুদ্ধে সিজার সহজেই জিতে যান আর পালাবার সময় ভূমধ্যসাগরে ডুবে যান টলেমি। মিশরের সিংহাসনে সিজার বসান ক্লিওপেট্রাকে।

ফারাও হওয়ার সাথে সাথেই ক্লিওপেট্রা নিজের কৌশলে দেশের মানুষের মন জয় করে নেন। নিজেকে ঘোষণা করেন দেবী আইসিসের অবতার হিসাবে। নিজের পোষাকও পরতে থাকেন আইসিসের মতোই। মিশরের মানুষ ওঁকে পুজো করতে থাকে। সিজার আর ক্লিওপেট্রার এক সন্তানও হয়। তার নাম রাখা হয় টলেমি সিজার। দেশের মানুষ আদর করে তার নাম রাখে সিজারিওন, মানে লিটল সিজার।

৪৬ বিসিতে নিজের ছেলেকে নিয়ে ক্লিওপেট্রা এলেন রোমে সিজারের কাছে। সিজার সেই সময়তে ওর প্রেমে এতটাই পাগল যে রোমে ভেনাসের মন্দিরে আইসিস রূপী ক্লিওপেট্রার মূর্তি বসান। সেই মূর্তি ছিল সোনার তৈরি। পবিত্র মন্দিরে ভিন দেশের দেবীর মূর্তি, তাও রাজার উপপত্নীর আদলে। রোমে সেই সময় ঝড় উঠলেও সিজার পাত্তা দেননি।

তবে রানীর সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বুঝলে। আইডিস অফ মার্চের নাম শুনেছ?

- হ্যাঁ, এটা শুনব না! এই দিনেই জুলিয়াস সিজারকে খুন করা হয় তো।

- হ্যাঁ, ১৫ই মার্চ, ৪৪ বিসি। রোমান সেনেটের মধ্যে সিজারকে খুন করল ষাট জন মিলে। তাদের নেতৃত্ব দিল ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস। ক্লিওপেট্রা সেই সময় রোমেই ছিলেন। সিজার মারা যাওয়ার পরেই আবার চলে এলেন মিশরে। তার কিছুদিন পরে ক্লিওপেট্রার আরেক ছোট ভাই ফর্টিন্থ টলেমি মারা গেল অস্বাভাবিক ভাবে। অনেকে মনে করেন রানী নিজেই ওকে খুন করিয়েছিলেন।

আমরা খাওয়া শেষ করে বসবার ঘরের সোফায় এসে বসলাম, ভবেশদা মুখে মৌরী নিয়ে চিবোতে চিবোতে আবার বলা শুরু করল,

- সিজার মারা যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই সিজারের বন্ধু অ্যান্তনি আর সিজারের উত্তরাধিকারী অক্টাভিয়ান ওর হত্যাকারীদের খোঁজা শুরু করল। ওরা ক্লিওপেট্রার কাছে সাহায্য চাইল। রানীও নিজের যুদ্ধজাহাজ গুলো নিয়ে রওনা দিলেন, কিন্তু পথে ঘূর্ণি ঝড়ের কবলে পড়ে অনেক জাহাজ নষ্ট হল। ক্লিওপেট্রাকে মিশরে ফিরে আসতে হল। অন্যদিকে ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস আত্মহত্যা করল। রোমান সাম্রাজ্যর অধিপতি হয়ে বসলেন অক্টাভিয়ান আর অ্যান্তনি।

অ্যান্তনির রাগ এবারে গিয়ে পড়ল ক্লিওপেট্রার ওপরে। যুদ্ধের সময় সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায়নি। এর শাস্তি মিশরের ফারাওকে পেতেই হবে। অ্যান্তনি ডেকে পাঠালেন ক্লিওপেট্রাকে। এবারে রানীকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য কিছু একটা করতেই হত।

- ক্লিওপেট্রা এবারে অ্যান্তনিকে বশ করে ফেললেন তাই তো।

- একদম তাই। এই অংশটা আর এর পরিণতি নিয়েই শেক্সপিয়ারের প্লে আছে। ১৯৬৩ সালে রিলিজ হওয়া সেই বিখ্যাত সিনেমাটা আছে। ক্লিওপেট্রা অ্যান্তনির সাথে দেখা করার জন্য যে

জাহাজে করে গেলেন তা ছিল সোনায় মোড়ানো। তার দাঁড় গুলো ছিল রুপোর। পাল ছিল গোলাপী। স্বয়ং রানী অ্যান্তনির সামনে এলেন দেবী আইসিসের বেশে। ব্যাস, এবারে অ্যান্তনির মুগ্ধ হওয়ার পালা। এবং সেটাই হল। ক্লিওপেট্রা রাজী হলেন অ্যান্তনিকে প্রয়োজনে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। তার বদলে ওর বোন আরসিনোইকে খুন করতে হবে।

- ক্লিওপেট্রা নিজের বোনকেও ছাড়েননি!

- না, কেন ছাড়বে? সিংহাসনের দাবীদারদের সরিয়ে দিতে হবে না! অ্যান্তনির নির্দেশে রোমে মন্দিরের সিঁড়িতে খুন করা হল আরসিনোইকে। অ্যান্তনি ক্লিওপেট্রার সাথেই বেশ কয়েক বছর কাটালেন ইজিপ্টে। অ্যান্তনির খুব শখ ছিল নিজেকে রোমান দেবতা বাক্কাসের মতো দেখার। ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ক্লিওপেট্রা এবারে বাক্কাসের স্ত্রী দেবী অ্যাফ্রোদিতির মতো সাজতে লাগলেন। দুজনে মিলে সমাজের উঁচু অংশের মানুষদের নিয়ে একটা দল খুললেন, সেই দলের কাজই ছিল মদ খাওয়া, ফুর্তি করা আর জুয়ো খেলা। সেই সময় ওদের দুটি সন্তানও হয়, তাদের নাম ছিল আলেকজান্ডার হেলিওস আর ক্লিওপেট্রা সিলিন। গ্রীক হেলিওস নামে সূর্য আর সিলিন মানে চাঁদ। এর দুবছর বাদে ওদের আরেকজন পুত্রসন্তান জন্মায়। দ্বিতীয় টলেমির নামে ক্লিওপেট্রা তার নাম রাখেন ফিলাডেলফাস।

এমন সময়ই হঠাৎ অ্যান্তনির ভাই লুসিয়াস অক্টাভিয়ানের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। সেই যুদ্ধে লুসিয়াস হেরে গেলেও অ্যান্তনির সাথে অক্টাভিয়ানের সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে।

৩২ বিসিতে অক্টাভিয়ান অ্যান্তনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিখ্যাত ব্যাটেল অফ অ্যাক্টিয়াম নামে। ক্লিওপেট্রা আর অ্যান্তনির সামরিক শক্তি ছিল অক্টাভিয়ানের দ্বিগুণ। কিন্তু তার পরেও ওরা হেরে বসে অক্টাভিয়ানের কাছে।

- কেন?

- কারণ ভাল নেতৃত্বের অভাব। প্রচুর সৈন্য থাকলেও ভাল সেনাপতি ছিল না ওদের। অন্যদিকে অক্টাভিয়ানের সেনাপতি ছিল আগ্রিপ্পা। ওর ওয়ার স্ট্রাটেজির কাছে বিশ্রীভাবে হেরে যায় অ্যান্তনি আর ক্লিওপেট্রা। তারপরেই দুজনে পালিয়ে আসে ইজিপ্টে। পিছনে ধাওয়া করতে করতে আসেন অক্টাভিয়ান।

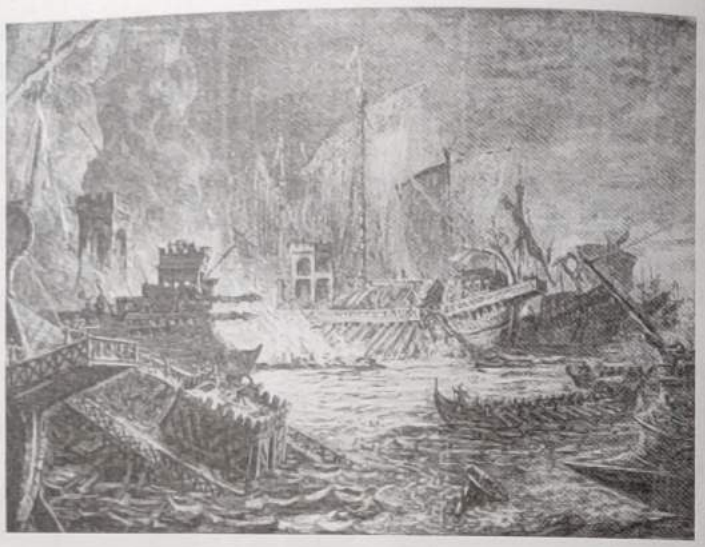

অক্টাভিয়ান মিশরে পৌঁছনোর পরে অ্যান্তনি আরো একবার চেষ্টা করেন যুদ্ধে জেতবার। এবারেও ফল হয় এক। অ্যান্তনি এবারে আত্মহত্যা করার জন্য নিজের পেটে তলোয়ার বসিয়ে দেন। রক্তাক্ত অ্যান্তনিকে আনা হয় ক্লিওপেট্রার কাছে। ওঁর কোলেই অ্যান্তনি মারা যান। কিন্তু ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করার আগেই সেখানে অক্টাভিয়ানের সৈন্যরা চলে আসে। বন্দী করা হয় ওঁকে।
ক্লিওপেট্রাকে বাঁচিয়ে রাখার পিছনে অক্টাভিয়ানের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভেবেছিলেন রোমের রাস্তা দিয়ে বন্দিনী ফারাওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সেই খবর কোনও ভাবে ক্লিওপেট্রার কাছে পৌঁছে যায়। তার পরেই ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করেন।
আমি এবারে বললাম,
-ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যাটাও একটা মিথ না! শুনেছিলাম সাপের বিষে উনি মারা যান।

- বিষের ব্যাপারে রানীর অনেক জ্ঞান ছিল বুঝলে ভায়া। যত রকমের বিষ হয় তার সবরকমের প্রয়োগ তিনি করতেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামীদের ওপরে। তারপরে দেখতেন কোন বিষ কত জলদি কাজ করে, কোনটায় ব্যথা হয়, কোনটায় ব্যথা হয় না। জেলখানার প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে রানীর জন্য একঝুড়ি ভর্তি মিষ্টি ডুমুর ফল আনা হয়। তার ভিতরে লোকানো ছিল বিষাক্ত অ্যাস্প সাপ। এটা একরকমের ইজিপশিয়ান কোবরা বুঝলে। এই সাপেরই ছোবল নিজের বুকে নেন রানী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর শরীর ঘামতে থাকে, স্নায়ু দূর্বল হয়ে যায়। ঘুম এসে যায়। ক্লিওপেট্রার গোটা শরীরের নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

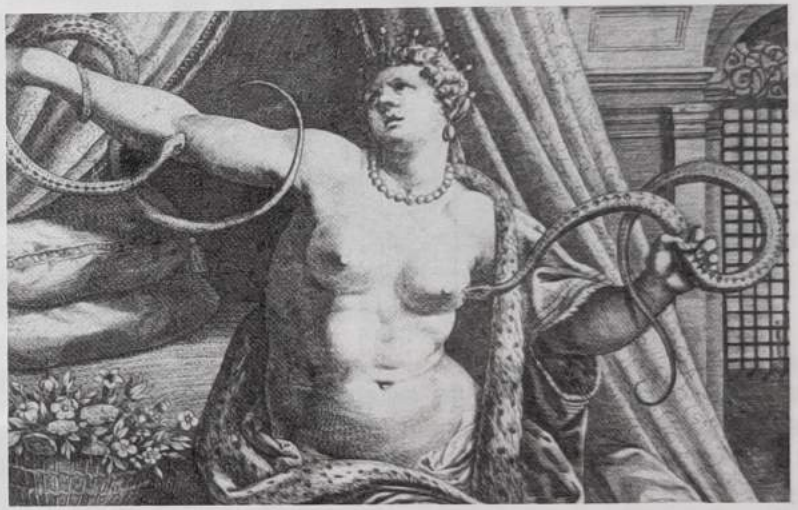

- হুমম, কোবরার বিষ তো নিউরোটক্সিন, ফরেন্সিক মেডিসিনে পড়েছিলাম, একটা ছোবলে প্রায় আড়াইশো মিলিগ্রাম বিষ থাকে। আর মাত্র ১৫ মিলিগ্রামই একটা মানুষকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট।
জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ পেলে পিজি ছাড়ে না।
ভবেশদা পিজির দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে এবারে বলল,
- আত্মহত্যার খবর পেয়ে অক্টাভিয়ান যখন ক্লিওপেট্রার কাছে পৌঁছলেন তখনও ওঁর দেহে ক্ষীন হলেও প্রাণ আছে। রাজা নাকি তখন বিষ বার করার জন্য ওঝাদের ডেকে পাঠান কিন্তু তারা এসে পৌঁছনোর আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মিশরের শেষ ফারাও মারা যান ১২ই অগাষ্ট, ৩০ বিসি। এর পরেই মিশরে শুরু হয় রোমানদের রাজত্ব। এই অগাষ্ট মাসের নামকরণের সাথেও ক্লিওপেট্রা জড়িয়ে আছেন জানো।
- সেটা কীরকম?
- অক্টাভিয়ান যুদ্ধ জিতে দেশে ফিরে রোমান সাম্রাজ্যের রাজা হয়ে বসেন নতুন উপাধি নিয়ে, অগাস্টাস। এই সময় সম্রাটকে নিজের পছন্দ মতো একটা মাসের নামকরণ করতে দেওয়া

হয়। অগাস্টাস নবম মাসে জন্মালেও কিন্তু নিজের জন্মমাসকে বেছে নেননি। নিয়েছিলেন অষ্টম মাসকে। কারণ সেই মাসেই ক্লিওপেট্রা মারা যান। যেটা সম্রাটের কাছে বেশি গর্বের বিষয় ছিল।

অগাস্টাস

- আচ্ছা একটা কথা বললেন না, ক্লিওপেট্রার সন্তানদের কি হল?
- ক্লিওপেট্রা মারা যাওয়ার ১৭ দিনের মাথায় সিজারিয়নকে খুন করেন অক্টাভিয়ান। কারণ ওর শরীরে ছিল সিজারের রক্ত। তাই বড় হয়ে রোমের মসনদের দাবী করতেই পারত। ক্লিওপেট্রার বাকি দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রোমে নিয়ে আসেন অক্টাভিয়ান।
- আর ক্লিওপেট্রার সমাধি ?
- ওইটা এখনো পর্যন্ত একটা রহস্যই রয়ে গেছে বুঝলে। অ্যান্তনি আর ক্লিওপেট্রাকে একসাথে কবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটার খোঁজ আজ অব্দি কেউ পায়নি।

||

সেদিন যখন ভবেশদার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসছি তখন ও হঠাৎ বলল,
- আরে এক মিনিট ওয়েট করে যাও, একটা জিনিস ভুলেই গেছি।
এই বলে আমাদের বাড়ির চৌকাঠেই দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরের ঘরে গেল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করিয়ে রাখার পরে বেরিয়ে এল হাতে একটা বাক্স মতো নিয়ে। লাল চকচকে কাগজ দিয়ে মোড়ানো। গিফট র‍্যাপের মতো। সেইটা পিজির হাতে দিয়ে বলল,
- এইটা তোমাদের জন্য।
- কী এটা?
- একটা বই, জয়েস টিলডেসলির লেখা। ইজিপশিয়ান আর্কিওলজির নাম করা প্রফেসর। এই

বইটা এখন দুষ্প্রাপ্য, আউট অফ প্রিন্ট। কিন্তু তোমাদের ইজিপ্ট নিয়ে যা আগ্রহ দেখলাম তাতে মনে হল এটা তোমাদের পড়া উচিৎ।
- কিন্তু এত দামী একটা বই গিফ্‌ট করে দেওয়ার কী দরকার ছিল? আমরা না হয় পড়ে আপনাকে ফেরত দিয়ে দিতাম।
- আরে না না, বইটা আমার পড়া, আর দাদা কি ভাইদের কিছু দিতে পারে না নাকি? এখন মুখ বুজে এটা নিয়ে বাড়ি যাও দেখি।
হোস্টেলের ঘরে ঢুকেই দুজনে মিলে বসে গেলাম গিফ্‌টটা নিয়ে। লাল র‍্যাপটা সরাতেই বেরিয়ে এল ভিতরের বইটা। বেশ মোটা, কালো রঙের মলাট। মলাটের ওপরে দ্বিতীয় রামেসিসের ছবি। বইটার নাম 'ফারাওস'।
বইটাতে ফারাওয়ের সময়ের প্রথম দিন থেকে ডাইনেস্টি অনুযায়ী তাদের কথা লেখা আছে দেখলাম। তার সাথে দারুণ দারুণ হাই ডেফিনিশন ছবি! এক ঝলকের জন্য পিজি পাতা উলটে উলটে দেখছিল, আম ওর পাশে বসে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা কিছু দেখতে পেলাম যেটার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না!
বইটাকে বাইরে থেকে দেখে বুঝতেই পারিনি যে ওর প্রথম পঞ্চাশটা পাতার পরের পাতাগুলোর মধ্যে একটা চৌকো গর্ত করা! দেখে মনে হচ্ছিল কেউ খুব যত্ন নিয়ে পাতার মাঝখান গুলো কেটে গর্তটা বানিয়েছে। গর্তের ভিতরে রাখা একটা ভাঁজ করা কাগজ আর একটা ছোট্ট লাল ভেল্ভেটের বাক্স। মেয়েদের আঙটি বা কানের দুলের যেমন বাক্স হয়।
আমরা হতভম্বের মতো মুখ নিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকালাম। কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা নিয়ে পিজি পড়তে শুরু করল,
"আর হয়ত কোনদিনও তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে না। আমি নিজে আর কতদিন বেঁচে থাকব সেটাই জানি না। যে কোনওদিন খুন হয়ে যেতে পারি..."
এতটা পড়েই সাথে সাথে পিজি ফোনটা নিয়ে ভবেশদাকে কল করল, বারকয়েক চেষ্টা করার পরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,
- স্যুইচড অফ বলছে! এক্ষুনি ওর বাড়ি যেতে হবে, ক্যুইক!
- পাবি না ওকে বাড়িতে গেলে, দেখ কী লেখা আছে।
চিঠির বাকিটা ছিল এরকম,
"...তোমরা যখন এই চিঠিটা পড়ছ ততক্ষণে আমি কলকাতা এয়ারপোর্টে, আমাকে খোঁজার চেষ্টা করো না প্লিজ। তোমাদের দায়িত্ব আজ থেকে অনেক বেড়ে গেল। আমার একটা সম্পদ তোমাদের দিয়ে গেলাম। আর কারোর ওপরে ভরসা করতে পারলাম না। খুব সাবধানে রেখো নিজের কাছে। কাউকে বিশ্বাস কোরো না, কাউকে না। যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমি নিজেই যোগাযোগ করব তোমাদের সাথে।"
চিঠিটার কিচ্ছু মাথামুন্ডু বুঝতে পারছিলাম না। কীসের দায়িত্ব? কে খুন করতে চাইবে ভবেশদাকে? কোন সম্পদের কথা বলছে ও?
তখনই খেয়াল হল লাল বাক্সটার কথা,
কাঁপা কাঁপা হাতে ছোট্ট বাক্সটা খুলে দেখলাম ভিতরে ফোমের আস্তরণ । সেটা সরাতেই বেরিয়ে এল একটা সাদা পাথরের টুকরো । কিন্তু কালচে হয়ে এসেছে। বোঝা যায় এর বয়স অনেক। টুকরোটা চকচকে, মসৃণ। মাকুর মতো আকার। তার মাঝখানে কালো গোল দাগ, সেই দাগের

চারিদিকে একটা গাঢ় বাদামী রিং। ওটাকে চেনার জন্য ডাক্তারীর ছাত্রের দরকার নেই।
আমার হাতের তালুতে যেটা ছিল সেটা একটা পাথরের চোখ!

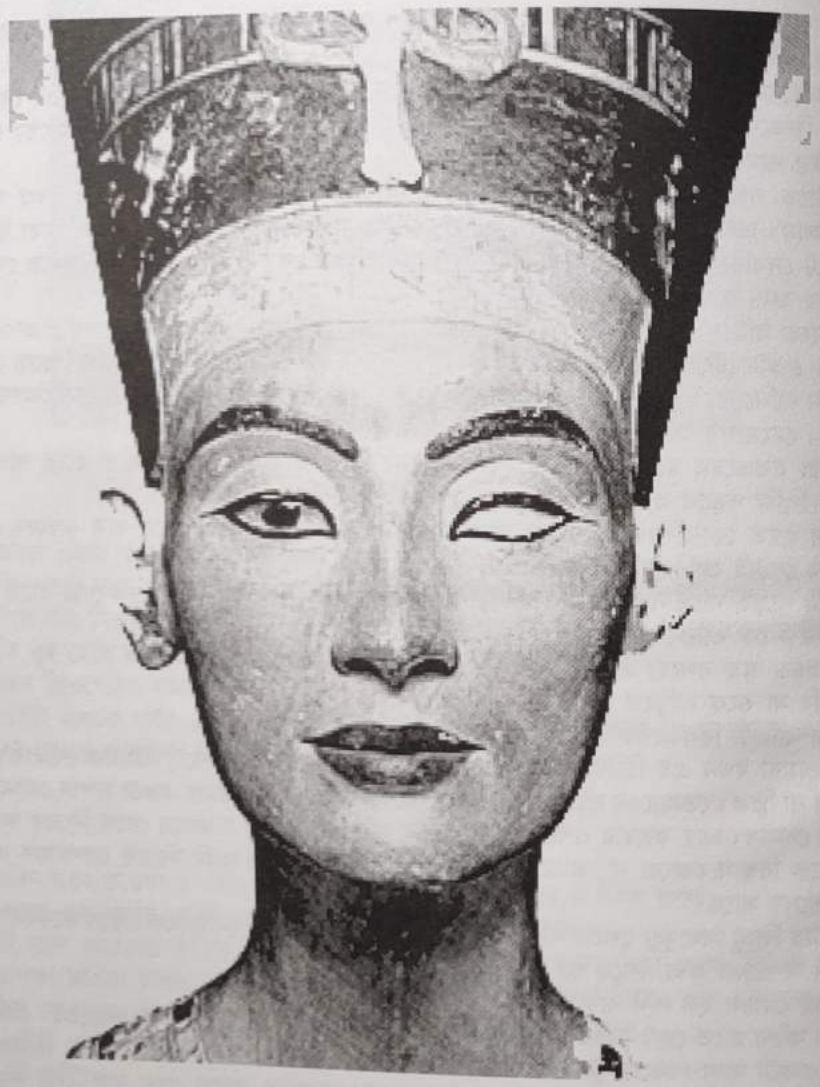

রানী নেফারতিতির চোখ ভবেশদার কাছে কী করে এল?
কোথায় গেল ভবেশ দা?
পিজি আর স্পন্দন কি পেয়েছিল ভবেশদাকে খুঁজে বার করতে?
আসছে এমন এক অ্যাডভেঞ্চার যাতে জুড়ে আছে
আমাদের শহর কলকাতা,
টেমস আর স্প্রি নদীর পাড়ের দুটো শহর,
আর
হায়রোগ্লিফের দেশটা।

অপেক্ষার এবার শুরু!!

অপেক্ষার এবার শুরু!!

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

1. Joyce Tyldesley.
Egypt, How a Lost Civilization was Rediscovered,
BBC Books, 2005.

2.TGH James.
An Introduction to Ancient Egypt.
British Museum Publications Limited, 1979

3. Bill Manley.
Egyptian Hieroglyphs for Complete Beginners.
Thames and Hudson, 2012.

4. Mark Collier, Bill Manley
How to Read Egyptian Hieroglyphs
British Museum Press, 1998.

5. Ahmed M. Abul Ella
By Way of Accident.
Self published, Printed in Great Britain by Amazon, 2014.

6. Joyce Tyldesley.
The Penguin Book of Myths and Legends of Ancient Egypt.
Penguin books, 2011.

7. Editor- Dale M. Brown.
Egypt: Land of The Pharaohs.
Time-Life Books, 1992.

8. Joyce Tyldesley.
The Pharaohs.
Quercus books, 2009.

9. National Geographic History Magazines.
Jan-Feb 2016
July-Aug 2017
Nov-Dec 2017

ছবির উৎস

1. Wikimedia Commons.
2. stocksnap.io.
3. New York Public Library.
4. New Old Stock.
5. Creative Commons.
6. A few photos are owned by the writer himself.

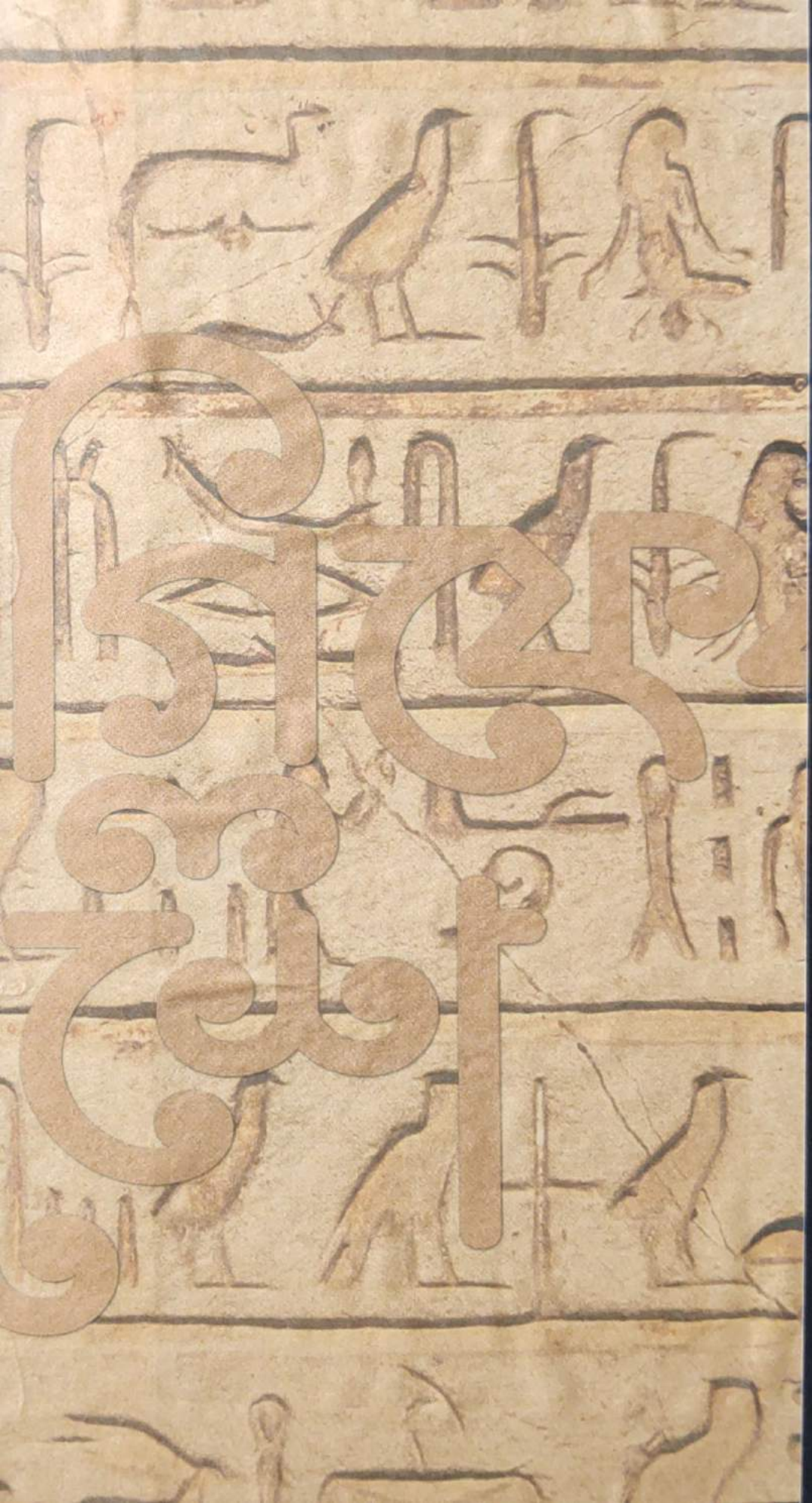

কর্মসূত্রে লন্ডননিবাসী অনির্বাণ ঘোষ পেশায় সার্জেন হলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সেই ছোট বয়স থেকেই। ২০১৫ সালে বন্ধু অরিজিত গাঙ্গুলীর সাথে তৈরি করেন নিজেদের ব্লগ anariminds.com। সেখানেই লেখালিখির সূত্রপাত। এরপর বেশ কিছু ছোটগল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী আর প্রবন্ধ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠকের মন জয় করে নিতে শুরু করে। ২০১৮ সালের বইমেলায় দুটি পৃথক গল্প সংকলনে অনির্বাণের দুটি ছোটগল্প প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। একই বছরে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ছোটগল্প "আবর্ত"।অনির্বাণের জন্ম ১৯৮৫ সালে হাওড়ার শিবপুরে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের গণ্ডি অতিক্রম করেই ছোটবেলার এক স্বপ্ন সফল করার নেশায় মেতে ওঠে অনির্বাণ। ফলস্বরূপ ২০০৮ সালে এম.বিবি.এস, ২০১০ সালে এম.এস, এবং ২০১৩ সালে এম.আর.সি.এস ডিগ্রি লাভের পর শল্যচিকিৎসার আধুনিক পীঠস্থান ইংল্যান্ডে পাড়ি দেয় স্ত্রী ও কন্যার সাথে। কলকাতাকে ছেড়ে গেলেও বাঙালির আদবকায়দা ও সাহিত্যপ্রীতিকে ভুলতে পারেননি অনির্বাণ। তাই শখের ইওরোপ ভ্রমণের পাশাপাশিঅনির্বাণের কলমের যাদুতে একের পর আসতে থাকে "স্যালপেল", "আদতে আনাড়ি", " হিস্ট্রির মিস্ট্রি"-র মতো একাধিক জনপ্রিয় সিরিজ। মূলত নিজের ডাক্তারি অভিজ্ঞতা আর ইতিহাসভিত্তিক রিসার্চধর্মী এইসব লেখা পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়, এবং অপেক্ষা বাড়তে থাকে অনির্বাণের প্রথম বইয়ের। "খারোগ্রিফের দেশে" আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ঘরানার থেকে অনেকটাই আলাদা। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস ও পৌরাণিক আখ্যান এমন সুকৌশলে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ মনে হয় বাংলায় এই প্রথম। গল্পের ছলে মিশরের রোমহর্ষক সব আখ্যান জীবন্ত হয়ে ওঠার মধ্যেই তৈরি হতে থাকে আর একটি থ্রিলারধর্মী গল্প। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে অনির্বাণের হাত ধরে এমন আরও গবেষণামূলক লেখা পেতে চলেছে বাংলা পাঠকসমাজ।

খোয়াবনামা

প্রান্তজনের কথা

2nd EDITION

৪০০ /-

ISBN 978-93-83280-91-7

9 789383 200917 >

খোয়াবনামা, ঢেউ সহ যে কোন প্রকাশকের বই পেতে আসুন খোয়াবনামা বইঘরে
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলেজস্ট্রিট, ৪ নম্বর স্টল
কলকাতা কর্পোরেশন অফিসের কাছেই, ৯৮৭৫৪৫৫৭১৮
ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে বাড়ি বসে বই পেতে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
উপরক্ত নাম্বারে